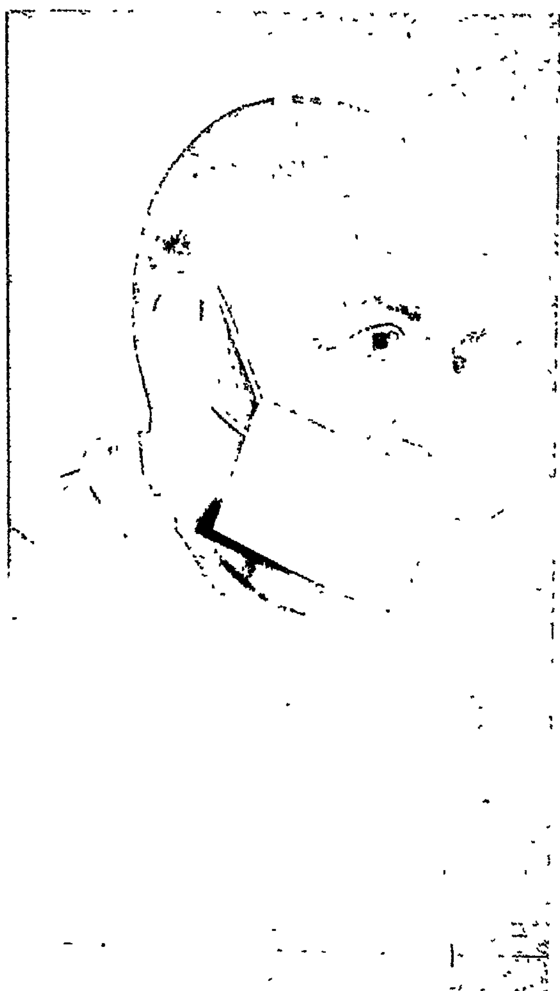

আচার্য শ্রীতুলসী, বর্ত্তমান আচার্য

জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থ সংঘ

জ্ঞান তাপস যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

মূল পুস্তকের লেখক

মনের জয়ই জয়

তুলসী অধ্যাত্ম নীডম প্রকাশন

তুলসী অধ্যাত্ম নীডম প্রকাশন

যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

মনের জয়ই জয়

মূল হিন্দি থেকে অনুবাদ : চম্পালাল অঞ্চালিয়া

প্রাপ্তিস্থান :

প্রভা প্রকাশন

৪ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চম্পালাল অঞ্চালিয়া ॥ ২ রাজা উডমান্ট স্ট্রীট ॥ কলকাতা-৭০০০০১ ॥

এবং কলকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে

MANER JOY-YI JOI by Yuvacharya Mahaprajna
Translated in Bengali from Hindi original
by Champalal Anchalia

Price Rs 25 00 only

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

স্বর্গীয় জেঠমলজী অঞ্চালিয়ার পরিবারের সদস্যবৃন্দের
আর্থিক আনুকূল্যে এই সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে।

মূল্য : ২৫ টাকা

প্রচ্ছদ : চিত্ত দাস

তুলসী অধ্যাত্ম নীডম্, জৈন বিশ্ব ভারতী, লাডনু (রাজস্থান)-এর পক্ষে শ্রীচম্পালাল অঞ্চালিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রিন্টিং অ্যাণ্ড অ্যালায়েড সার্ভিস, ৮৬।৩৮ বি, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কলকাতা-৭০০০১৩ থেকে রণেন গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ধর্ম-দর্শনে যিনি ছিলেন সমধিক অনুপ্রাণিত
আমাব সেই পবমাবাধ্য প্রযাত পিতৃদেবকে—
জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে যিনি
আমার প্রথম পথপ্রদর্শক।

ভূমিকা

মনের প্রশ্ন রীতিমত জট পাকিয়ে আছে। এই সমস্যা বহু হাজার বছর ধরে রয়েছে, ভবিষ্যতে আরও কত বছর পর্যন্ত তা থাকবে বলা মুসকিল। মনকে যাঁরা বুঝেছেন এবং মনকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের ভ্রম শেষ হয়েছে। মনকে যাঁরা বুঝতে পারেন নি, মনকে দেখতে পান নি, তাঁরা মনকে জয় করার প্রশ্নেই সমস্যাগ্রস্ত রয়েছেন। জয়ের ভাষা হল লড়াইয়ের ভাষা। লড়াইয়ে হার বা জিৎ—দুয়েরই সম্ভাবনা থাকে। মনের সঙ্গে যিনি লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি যেমন জিততে পারেন, ঠিক তেমনি হারতেও পারেন। একেবারে নিশ্চিত-ভাবে কেউ কখনই বলতে পারেন না, যিনি মনের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন, তিনি জয়লাভ করবেনই। মনকে যিনি উপেক্ষা করেন, যিনি তাকে দেখেন, তিনি তটস্থ হন, মধ্যস্থ হন। উপেক্ষার কথা কত বড় হয়, কেউ তাকে সইতে পারে না। মনকেও তিনি সইতে পারেন না এবং কোন লড়াই ছাড়াই তিনি নিজে নিজেই পরাজিত হন।

অধ্যাত্মক্ষেত্রে যুদ্ধের একটা নিজস্ব ভাষা আছে, যোদ্ধারও তেমনি নিজস্ব একটি ভাষা আছে। যুদ্ধ কেবল সমর-প্রাঙ্গণেই হয় না, কেবল অস্ত্র দ্বারাই সে লড়াই হয় না, লড়াই নিজের ভেতরে হতে পারে, এবং অস্ত্র ছাড়াই যুদ্ধ করা যায়। মহাবীর এজন্যই বলেছেন—'নিজে নিজের সাথে লড়াই কর। অন্যের সঙ্গে লড়ে কি হবে? 'জুদ্ধারিহং খলু দুল্লহং'—যুদ্ধের অবসর দুর্লভ, তাকে খুঁজো না।'

অধ্যাত্মের ঘোষণা হল—

ওহে বীর !
এই বিজাতীয় তত্ত্বগুলির সঙ্গে লড়,
নকল লড়াই করে কি হবে ?
যুদ্ধের যে সামগ্রী পাওয়া গেছে,
তা কবে বার বার পাওয়া যাবে ?
এটাই হল সর্বাত্মক যুদ্ধের মওকা।
সামনেই ঘর রয়েছে,
যিনি সর্বস্ব-ত্যাগী, তিনি এই ঘরেই থাকেন
ওটাই হল সাম্য।
আমি এই অট্টালিকার শিখর থেকে
বিজাতীয় তত্ত্বগুলিকে অন্য দিকে ছুঁড়ে দিয়েছি
দ্বিতীয় শিখর তো এমন নেই,
যেখান থেকে ওগুলোকে এপারে ছুঁড়ে দিতে পারি।
শ্রান্ত হয়ো না।
থেমো না।
থামিয়ে দিও না।
নত হয়ো না।
সামনের দিকে এগিয়ে যাও।
দ্বিগুণ শক্তির সঙ্গে
সামনের দিকে এগিয়ে যাও।

বিজয়ের এই মন্ত্রকে যিনি বুঝতে পারেন নি, তাঁর কাছে মন চিরকাল অজেয়ই থাকে, অজেয়ই থেকে যায়। মনের বিজয়-রহস্য যিনি বুঝতে পারেন না তিনি মানসিক সমস্যারও সমাধান করতে পারবেন না। একটি দড়িরই দু প্রান্তে ধরে দুটি মানুষ টানাটানি করে, ফলে যখন দড়ি ছিঁড়ে যায়, তখন দুজনেই পড়ে যায়। একজন টানে, আর দ্বিতীয়জন তা ছেড়ে দেয়। যে টানে সে

পড়ে যায়, কিন্তু অপবজন দাঁড়িয়েই থাকে। প্রেক্ষাকে যিনি জানেন, দড়িকে যিনি ছেড়ে দিতে বা ঢিলে করতে জানেন, তিনিই বিজয়ী হন। এই সোজা কথাটিকে বুঝবাব জন্যই বইটি পড়ুন, নিজে দেখুন এবং অনুভব করুন। যদি কথাগুলিকে বোঝা যায়, তাহলে জট-পাকানো প্রশ্নটিব সহজেই সমাধান হবে।

আচার্যশ্রী তুলসী হলেন আমাব প্রেবণা-স্রোত এবং জ্যোতিস্তম্ভ। তাঁব আশীর্বাদ এবং সান্নিধ্য, দুই-ই আমি পেয়েছি। তাঁবই উৎসাহ এবং প্রেবণায় সাধনা-শিবিবেব ব্যবস্থাদি চলুক।

যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

আশীর্বচন

দেশনোক গ্রামের স্বর্গীয় জেঠমলজী অঞ্চালিযার পরিবার বরাবরই জৈনধর্ম এবং তেরাপন্থ দর্শন-সংস্কারে অনুপ্রাণিত পরিবার ছিল। ব্যবসায়িক কারণে বাংলায় প্রবাসী হওয়ায় ধর্মসঙ্ঘের সঙ্গে ঐ পরিবারের সম্পর্ক অনেকটা চিড় ধরে আসছিল। লাডনু-নিবাসী প্রযাত মোহনলালজী খটেড় (আমার সংসার-পক্ষীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ঐ সময়ে সিরাজগঞ্জে (অধুনা বাংলাদেশ) থাকতেন। ওখানেই জেঠমলজীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ঐ সম্পর্কই ওঁদের আবার আমার কাছে আসার প্রেরণা যোগায়। ওঁরা এলেন, আর এমন ভাবেই এলেন যে আগের চেয়ে বেশি অধ্যাত্মধর্মী হলেন। ওঁর গোটা পরিবারের মধ্যেই ঐ কারণে সংস্কার পল্লবিত হল এবং ধর্মবিষয়ে একটা শ্রদ্ধা ওঁদের মধ্যে পুষ্ট হতে লাগল।

জেঠমলজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র চম্পালালজী একাধারে শিক্ষিত, কর্মঠ এবং মিতভাষী। বাংলাদেশেই ওঁর শিক্ষা-দীক্ষা হওয়ায় একদিকে যেমন উনি বাঙালীই হয়ে গেছেন, তেমনি বাংলা ভাষার ওপরেও ওঁর বেশ অধিকার জন্মেছে। ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ বিশেষ হয় নি, তাই উনি আমাদের কাছে অপরিচিতই রয়ে গিয়েছিলেন এতদিন।

আমাদের রাণাবাস চাতুর্মাসের সময় কলকাতায় এক বিশেষ সংবাদ পেয়ে চম্পালালজী রাণাবাসে এসে পৌঁছলেন। এখানে আসার পরেই ওঁর শ্রদ্ধা, রুচি এবং নিষ্ঠা বদলে গেল। আমি ওঁকে দেখলাম, ওঁর যোগ্যতা লক্ষ্য করলাম এবং আমাদের কাজে ওঁকে নেব বলে ঠিক করলাম।

ওঁর সাহিত্যধর্মী রুচি এবং বাংলাভাষায় দক্ষতা দেখে আমিই ওঁকে আমাদের সাহিত্যগুলি বাংলায় অনুবাদ করার নির্দেশ দিলাম। এই

নির্দেশ উনি প্রসন্নভাবে মেনে নিয়ে বললেন, 'আমি নিজে তো অনুবাদ করবই, অন্যকেও এ কাজে লাগাব।'

সর্বপ্রথম দুটি বই উনি নিলেন—'মন কে জিতে জিত' এবং 'আভামণ্ডল'। উভয় পুস্তকই যুবাচার্যজীর রচনা। এগুলি যোগ-সম্পর্কিত, প্রেক্ষাধ্যান-বিষয়ক এবং বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি-আকর্ষণকারী। পুরো মনোযোগ এবং নিষ্ঠা নিয়ে উনি কাজ শুরু করলেন এবং কাজটিকে একেবারে শেষ করে তবেই বিশ্রাম নিলেন। অনুবাদটি কেমন হয়েছে, তার বিচার পণ্ডিতরা করবেন। তবে, আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে অনুবাদ খুবই ভালো লেগেছে।

বাংলার মানুষরা যোগ-রসিক, সুরুচিপূর্ণ সাহিত্যের সমঝদার এবং অধ্যয়নপ্রিয়। ওঁদের কাছে এই লেখা পৌঁছক, জীবনের প্রতি সঠিক এবং নতুন দৃষ্টি দিতে সক্ষম হোন ওঁরা।

শ্রীঅগ্রওয়ালিয়া নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। এ পথে উত্তরোত্তর ওঁর কুশলতার বিকাশ হোক, এই কামনাই করি।

৬ জুন, ১৯৮৪

জৈন বিশ্ব ভারতী

লাডনূ

আচার্য তুলসী

আশীর্বাণী

মনেব সমস্যাব সমাধানের জন্য এক গভীব প্রচেষ্টা প্রযোজন। সমাধানেব উপায় বাঙালী জনসাধাবণেব কাছে পৌঁছে দেবাব প্রচেষ্টাও খুব জরুবী। শ্রীচম্পালাল অঞ্চালিয়া এবং তাঁব-সহযোগীবা নিষ্ঠাব সঙ্গে কাজ কবেছেন। বাংলা-ভাষাভাষী পাঠকেব সামনে ওঁবা মানসিক সমস্যাব সমাধানেব সূত্র তুলে ধবেছেন। এটা খুবই মহত্ত্বেব কাজ। এই বই থেকে আধ্যাত্মিক চেতনাব জাগবণ, সর্বোপবি মনেব সমস্যাব সমাধানেব সূত্র মিলবে। কল্যাণকারী এই প্রচেষ্টাব জন্য মঙ্গলভাবনা বইল।

২ জুন, ১৯৮৪ — যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

জৈন বিশ্ব ভাবতী

লাড়নু

অনুবাদকের ভূমিকা

আজ থেকে প্রায় বছর পঁচিশ আগে আচার্যশ্রী তুলসী এবং যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ কলকাতায় এসেছিলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল এবং এই ভাব-বিনিময়-পর্বেই তাঁরা স্থির করে ফেলেছিলেন, তাঁদের স্বলিখিত জৈন দর্শন ও ধ্যানবিষয়ক কিছু বই বাংলায় ভাষান্তরিত করাবেন, যাতে তাঁদের ভাবধারা বাংলাদেশেও প্রচারের সুযোগ পায় এবং বাংলার জ্ঞানীগুণী ও বিদ্বজ্জন উভয়েই উপকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের কাজটিও সম্পূর্ণ হয়। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাঁদের সেই বাসনা অপূর্ণ ছিল। গত বছর নিতান্তই আকস্মিকভাবে তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে এবং আচার্যশ্রী তুলসী আমাকে গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদের কাজে অগ্রণী হতে বলেন।

আচার্যশ্রী তুলসীর নির্দেশ মাথা পেতে নিয়ে যেদিন তাঁর কাছে 'মন কে জিতে জিত' বইটি বাংলায় ভাষান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি দিলাম এবং আমার জন্মদাত্রী জননীও যখন প্রসন্নচিত্তে সেই প্রতিশ্রুতিকে অবিলম্বে কার্যকর করার আদেশ দিলেন, তখন ভাবতেই পারি নি, কি বিরাট বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। নিতান্তই সহজ এবং সাধারণ মনে করে যা শুরু করেছিলাম, কাজে নেমে দেখি, তা রূপান্তরিত করার পথে এত বাধা যে হিমালয়ের উচ্চতা অতিক্রমের বাধাও যেন তার কাছে তুচ্ছ। প্রসঙ্গত বলি, হিন্দি ভাষার সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পরিচিতি থাকলেও আমি বাংলার ছেলে—আচারে-আচরণে, কথাবার্তায় ষোল আনা বাঙালী এবং তার চেয়েও বড় কথা, আমার সম্পূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষাও পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলায়। তাই ঠিক বাঙালীর মতই হিন্দি

ভাষা আমাব কাছে গ্রীক ভাবাব সমতুল হযে দাঁডাল। এই অবস্থায পডে স্পষ্টই অনুভব করলাম, মা এবং আচার্যজীকে কথা দিযে কি সাংঘাতিক বিপদেই না পডেছি। আমি প্রকৃত অর্থেই আদাব ব্যাপাবী, আমাব সব কাজকাববাব লোহা এবং ইনজিনিযাবিং নিযে, অনুবাদ-রূপ জাহাজেব খবব নিতে যাওযাব কোন প্রযোজনই যে ছিল না, তখন তা মর্মে মর্মে অনুভব কবতে পাবলাম। কিন্তু, জিদ চাপল, নেপোলিযনেব আপ্ত বাক্যকে মনে পডল—'অসম্ভব কথাটি কেবল মূর্খদেব অভিধানেই পাওযা যায'—এবং দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিযে পডলাম অনুবাদ শেয কবাব কাজে।

'মনেব জযই জয' অনুবাদ কবতে আমাব সময লেগেছে প্রায পনেবো মাস। অসঙ্কোচে বলি, বাব বাব ছ'বাব আমি আদ্যন্ত এটি লিখেছি, কেননা প্রতিবাবই অনুবাদ কবাব পব অনুবাদেব ত্রুটি আমাব কানকে পীডা দিযেছে। অবশেষে মুদ্রিত হবকে অনুবাদেব চেহাবা কেমন হল, তা বিচাবেব ভাব বইল বিদ্বজ্জনেব ওপবে—আমাব শুধু এটুকুই সান্ত্বনা যে, অপবিসীম নিষ্ঠাভবে কাজটি সম্পন্ন কবাব চেষ্টা আমি কবেছি। আমাব মা এবং আচার্যজী উভযেই সেই নিষ্ঠা আনযনে প্রেবণা যুগিযেছেন, নেপথ্যেব এই দুটি মানুষকে আমি প্রণতি জানাই।

যুবাচার্যজীব অসংখ্য বইযেব মধ্যে এই বইটিকেই অনুবাদকার্যেব জন্য বেছে নিযেছিলাম কেন, সেটিও এক প্রশ্ন। আজকেব বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীতে মনেব সমস্যাই সবচেযে বড সমস্যা, আমবা প্রত্যেকেই নানা মানসিক সমস্যাভাবে জর্জবিত। 'মনেব জযই জয' আগাগোডা মনেব সমস্যা নিযেই চর্চা কবেছে এবং কিভাবে তা অতিক্রম কবা যায সে ব্যাপাবে বাস্তব এবং বৈজ্ঞানিক সমাধান দিযেছে। এহেন কঠিন বিষযকে যুবাচার্যজী এমন সহজ, সবল ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত কবেছেন যে তা আমাব মনকে আকর্ষণ কবেছে। আমাব বিশ্বাস, বাংলা ভাষায এই ধবনেব বই খুব বেশি নেই। তাই এ বই পডে বাঙালী পাঠক যে বীতিমত উপকৃত হবেন তাতে কোন সন্দেহই নেই। মানসিক সমস্যাপীডিত এই পৃথিবীতে মনের সমস্যাকে অতিক্রম কবাব যেসব পদ্ধতিব কথা যুবাচার্যজী বলেছেন, আজকের দিনেও তার প্রযোগ অসম্ভব নয।

এই প্রযোগকার্য সম্পন্ন কবে দেশেব মানুষ লাভবান হতে পাববেন বলেই আমার বিশ্বাস। তুলসী অধ্যাত্ম নীডম-কে ধন্যবাদ, দেশেব ও দশের কল্যাণার্থে তাঁবা এই বইগুলি বিভিন্ন ভাষায রূপান্তবণেব কাজে ব্রতী হয়েছেন। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে যে চারটি বইয়ের বাংলা সংস্করণ এঁরা প্রকাশ কবলেন, সেগুলিব সাফল্য এলে পববর্তী গ্রন্থগুলিকে ভাবান্তবিতকবণেব কাজ এঁদেব পক্ষে সহজ হবে। তাই তাঁদেব হয়ে বইগুলিব বহুল প্রচাবেব জন্য বাংলাব জ্ঞানী-গুণী, সাধাবণ-অসাধাবণ প্রতিটি মানুষেব কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা কবছি।

এ বইয়েব অনুবাদ সম্বন্ধে একটা কথা সুধী পাঠক-পাঠিকাকে বলে নেওয়া ভাল। যুবাচার্যজী বইটি পাণ্ডুলিপির আকাবে লেখেন নি, এটি তাঁর বিভিন্ন শিবিবে দেওয়া বক্তৃতার সঙ্কলন। টেপ-বেকর্ড করা বক্তৃতাকে পববর্তীকালে বইয়েব আকাবে লিপিবদ্ধ কবা হয়েছে। বলা এবং লেখাব ভাষা সর্বদা এক হয না। তাই মাঝে মাঝে লেখাব মধ্যে পুনবাবৃত্তি এসে গিয়েছে। আমবা অবশ্য সতর্কতার সঙ্গে পুনবাবৃত্তিকে যথাসম্ভব বাদ দেবাব চেষ্টা কবেছি। তবু, তাকে যে সর্বদা পবিহাব করতে পেবেছি তা নয। তবে এতে এই মূল্যবান বইয়েব রসাস্বাদনে কোন বিঘ্ন ঘটবে বলে মনে হয না।

আব একটি কথা। যে প্রেক্ষা-ধ্যান নিয়ে এই বইয়ে আলোচনা কবা হয়েছে, সে সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু জানতে চান বা প্রেক্ষা-ধ্যান অভ্যাস কবতে চান, তাহলে এই গ্রন্থেব লেখক বা প্রকাশকেব সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাবেন।

সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনেব পালা। সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব ভাষাতত্ত্ব ও তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সত্যবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যাযকে, শত ব্যস্ততাব মাঝেও যিনি বইটিব মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। অধ্যাপক সুকুমাব চক্রবর্তী এ বইয়েব পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া সংশোধন করে দিযে অপরিসীম ঋণপাশে আমাকে আবদ্ধ করেছেন। পাণ্ডুলিপি বচনার ব্যাপাবে

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ কুমার রায়, শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী এবং শ্রীগৌরগোপাল সাহা নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। শ্রীরণেন গুপ্ত খুব অল্প সময়ের মধ্যে বইটির মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করেছেন, বেশির ভাগ প্রুফ দেখে দিয়েছেন এবং অনুবাদেও নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই ব্যক্তিগতভাবে ঋণী রইলাম।

স্বাধীনতা দিবস, ১৯৮৪ — বিনীত
২ রাজা উডমান্ট স্ট্রীট — চম্পালাল অঞ্চালিয়া
কলকাতা-৭০০০০১

সূচীপত্র

মনের জয়ই জয়

সরদারশহর শিবির

(১০ অক্টোবর, ১৯৭৬ থেকে ১৬ অক্টোবর, ১৯৭৬)

১

দেখা ও ভাবা

এই সংসাবে আমবা দুই বকম তত্ত্ব দেখতে পাই। তাদেব একটি অভেদ, অপবটি ভেদ। বখন আমবা অভেদকে দেখি তখন মনে কোন বিকল্প বা সন্দেহ উৎপন্ন হয না। কিন্তু যখন ভেদকে দেখি তখন মনে বিকল্প বা সন্দেহ উৎপন্ন হয। এবকম হয কেন? এই পার্থক্য কেন, এই ভিন্নতাই বা কেন? এই বকম এক ঘটনা সুদূব অতীতে ঘটেছিল।

একবার পার্শ্বনাথ পবম্পবাব পট্টধব কুমাব শ্রমণ কেশী তাঁব শ্রমণ পবিবাবসহ শ্রাবস্তী নগবে আসেন এবং তিন্দুক উদ্যানে অবস্থান কবেন। সেই সমযে ভগবান মহাবীবেব শিষ্য গণধব গৌতমও তাঁব শ্রমণ সহ ঐ নগবীতে আসেন এবং কোষ্ঠক উদ্যানে অবস্থান কবেন। উভযেব শ্রমণদল পবস্পবকে দেখাব সুযোগ পান। কিন্তু পবস্পবেব মধ্যে বেশভূষা ও আচবণেব পার্থক্য লক্ষ্য কবে তাঁদেব মনে সংশয জাগে। তাঁবা জানতেন যে তীর্থংকব পার্শ্ব চতুর্যাম ধর্মেব প্রজ্ঞাপনা কবেছিলেন এবং মুনিদেব জন্য চাব মহাব্রত বিধান করেছিলেন। আব মহাবীব শ্রমণদের জন্য পাঁচ মহাব্রতেব নির্দেশ দিযেছিলেন। চাব মহাব্রত আব পাঁচমহাব্রত দুই বিধানেব মধ্যে এই প্রভেদ কেন? পার্শ্বনাথেব শ্রমণদেব পবিধেয বস্ত্র সব বকম বঙেব ছিল। মহাবীবেব শ্রমণদেব বস্ত্র কেবল সাদা বঙেব

ছিল। আচরণের পার্থক্যও ছিল। কিন্তু কেন? দুই সম্প্রদায়ের শ্রমণদের মনে সন্দেহ জাগল। আচার্য কেশী ও গণধর গৌতম সে কথা জানতে পারলেন। তাঁরা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী ছিলেন। তাঁরা দুজনে এক স্থানে মিলিত হলেন। তাঁদের শ্রমণরাও সঙ্গে ছিলেন। কুমার শ্রমণ কেশী গণধর গৌতমকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমাদের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, আমরা একই উপলব্ধি লাভের জন্য সচেষ্ট। তবুও তীর্থংকর পার্শ্বনাথ চার মহাব্রতের এবং তীর্থংকর মহাবীর পাঁচ মহাব্রতের বিধান কি করে দিলেন? এই প্রভেদ কেন? বেশভূষাতে পার্থক্য কেন? চর্যাতেই বা পার্থক্য কেন? একই লক্ষ্য অভিমুখে চলা সত্ত্বেও এই পার্থক্য থাকায় শ্রমণদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। এর সমাধান কি? আপনি আশুপ্রজ্ঞ, এর সমাধান করুন।

গৌতম সমস্যার সমাধান করলেন। তাঁর বক্তব্যের প্রথম চরণেই তিনি যা বললেন তা খুবই মহত্ত্বপূর্ণ। তিনি বললেন—"পন্না সমিক্খয়ে ধম্মং তত্তং তত্তবিনিচ্ছিয়ং"—ধর্মের পরম অর্থকে জানতে হলে, তাকে নিশ্চয় করে জানতে হলে, প্রজ্ঞার দ্বারা তার সমীক্ষা কর। প্রজ্ঞার দ্বারা দেখ তার ভেতরে কি আছে। তার বাইরের রূপকে দেখো না। 'পন্না সমিক্খয়ে'—প্রজ্ঞার দ্বারা গভীরে অবতরণ করে দেখ. তার অতল গভীরে পৌঁছে তবেই তুমি জানতে পারবে পরম ধর্ম আসলে কি। এই বেশভূষার পার্থক্য, চার-পাঁচ মহাব্রতের ভিন্নতা—সংখ্যার এই পরিবর্তন প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম পদবাচ্য নয়। এগুলি থেকে ধর্ম মিলবে না। প্রজ্ঞার দ্বারা গভীরে অবতরণ করে দেখ। সেখানেই ধর্মকে দেখতে পাবে। তাতে কোন ভিন্নতা বোধ করবে না। সবই একই বস্তু বলে প্রতীত হবে। আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছি সেই প্রেক্ষা ধ্যান কি? প্রেক্ষা ধ্যান হল গভীরে অবতরণ করে দেখা। যতক্ষণ গভীরে অবতরণ করা না যায় ততক্ষণ সত্যকে দেখা সম্ভব হয় না। আমরা সত্যকে জানতে চাই। সত্যকে দেখা-জানার দুটি মাধ্যম আছে—একটি বিচার, অপরটি দর্শন অর্থাৎ দেখা। আমরা বিচারের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত,

কিন্তু দর্শনের পরিচয় এখনও আমরা পাইনি। বিচারের ভূমি নিচেই থেকে যায়, কিন্তু দর্শনের ভূমি তার অনেক ওপরে ওঠে। দর্শনের যে শক্তি আছে বিচারে তা নেই। দর্শন যেখানে যেতে পারে বিচার সেখানে পৌঁছতে পারে না। বিচারের বিস্তার খুবই সীমিত, দর্শন সুদূরপ্রসারী। যেখানে দর্শন হয় সেখানে বিচার সমাপ্ত হয়।

বিচারের সমাপ্তি ঘটানোর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় দর্শন। যখন আপনি দর্শনের ভূমিকাতে প্রবেশ করেন, দেখতে আরম্ভ করেন, তখন বিচার আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। আপনি হয়ত বহুবার ভেবেছেন বিচারের পাশ কিভাবে ছিন্ন করা যাবে, বিচারের প্রবাহ কিভাবে রুদ্ধ করা যাবে। এই যে একের পর এক বিচার মনের মধ্যে উঠেই চলেছে তা কিভাবে বন্ধ করা যাবে। কিন্তু কেবল এই ধরনের ভাবনার দ্বারা বিচার রোধ করা যাবে না। বিচার বন্ধ করা সম্ভব দর্শনের দ্বারা, যথাযথভাবে দেখার দ্বারা। আপনি দেখার অভ্যাস করুন। আপনি যেমনি দর্শন করতে আরম্ভ করবেন, দেখতে শুরু করবেন, তখনই বিচার বন্ধ হয়ে যাবে। দুই কাজ এক সঙ্গে চলবে না। হয় দর্শন চলবে, নয়তো বিচার চলবে। দর্শন যদি হয় বিচার বন্ধ হবে, বিচার যদি চলতে থাকে দর্শন হবে না। তারা পরস্পর বিপরীত পথের পথিক। একসঙ্গে তাদের দুটিকে নিয়ে চলতে পারবেন না। আপনার অভিরুচিমত দুটিকে ধরুন, থাকবে সেই একটিই, হয় দর্শন না হয় বিচার। সাধনার দৃষ্টিতে 'দেখা' খুবই মূল্যবান। সত্যকে জানার, সত্যকে দেখার সবচেয়ে বড় উপায় দর্শন।

প্রশ্ন হতে পারে—কি দেখব? কেমন করে দেখব? কেন দেখব? এই তিনটি প্রশ্নই স্বাভাবিক।

কি দেখব, এই প্রথম প্রশ্ন। উত্তর হচ্ছে, যা কিছু সামনে আসে তাই দেখুন। কি দেখতে হবে সে বিষয়ে কেউ নিয়ম বেঁধে দিতে পারে না। কেউ বলতে পারে না, এগুলি দেখ, ওগুলি দেখ না। যেখানে দেখাই উদ্দেশ্য সেখানে কি দেখতে হবে আর কি দেখা চলবে না, এ নিয়ে কোন

প্রশ্নই হতে পাবে না। যে কোন বস্তুকেই দেখা যেতে পাবে।

আকাবকে দেখুন। সেটাই সবচেয়ে সহজ দর্শন। যে কোন আকাব সামনে এলেই আমবা তা দেখতে শুরু কবি। যে কোন বস্তু দৃষ্টিগোচব হলেই আমবা তাব বাহ্য রূপ দেখতে আবম্ভ কবি। প্রত্যেক আকৃতিব দুটি রূপ আছে—একটি বাইবেব রূপ, অপবটি ভেতবেব রূপ। একটি বাহ্য, অপবটি আন্তবিক। এমন কোন বস্তু নেই যাব বাইবেব রূপ আছে, কিন্তু ভেতবেব কোন রূপ নেই। আবাব অন্তবেব রূপ আছে, কিন্তু বাহ্য কোনও রূপ নেই এমন কোন বস্তুও নেই। দুই রূপই থাকে। যেখানে বস থাকে সেখানে ছোবডাও দেখি, বসও দেখি। আমবা উভয়কেই দেখে থাকি। বাইবেব এবং ভেতবেব দুই রূপকেই আমবা দেখি। প্রথমে বাইবেবটি দেখি, পবে ভেতবেবটি দেখি। প্রথমে স্থূল রূপকে দেখি, পবে সূক্ষ্ম রূপকে দেখি।

প্রথম দর্শনে যা আমাদেব চোখেব সামনে আসে তা হল স্থূল রূপ। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে যতটা দেখা যায় তাই সব নয়, ভেতবেও অনেক কিছু থাকে , তাই আপনি সূক্ষ্মকেও দেখুন। আমাব হাতে একটা পেন্সিল আছে, আপনি এব স্থূল রূপকেই কেবল দেখছেন। আপনি পেন্সিলটিকে গভীবভাবে দেখতে থাকুন, এক মিনিট দুই মিনিট পাঁচ মিনিট ধবে দেখুন। দেখতে দেখতে আপনাব সামনে এব স্থূল রূপ নাশ পেতে থাকবে এবং এব ভেতবেব রূপ, এব সূক্ষ্ম রূপ, প্রকাশ হতে থাকবে। আপনি দেখছেন আব দেখছেন আব দেখছেন, আব এই ভাবে গভীবে অবতবণ কবছেন। এক বস্তুব কত যে নতুন নতুন রূপ ভেসে উঠবে তা দেখে আপনি বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে যাবেন।

আজকে আমবা পেন্সিলেব আকাব দেখলাম, তাব আকৃতিকে লক্ষ্য কবে একাগ্র হয়ে গেলাম। প্রথমে ওব একটি রূপই দেখলাম, কেবল তাব স্থূল আকাবটিই দেখলাম। দ্বিতীয়বাব দৃষ্টিপাত কবে ওব বঙ যে কি তা দেখলাম এবং তৃতীয়বাবে ওব গায়ে যে ক্ষুদ্র অক্ষবগুলি লেখা আছে তাও দেখলাম। এসব প্রথম বাবেই দেখা সম্ভব হয় নি। পেন্সিল একটি

সামান্য বস্তু, কিন্তু তাও নিজের মধ্যে অনন্ত পর্যায় সংগ্রহ করে রেখেছে। একবার দেখলেই ঐ অনন্ত পর্যায় আমাদের সামনে প্রকট হবে না। কিন্তু আমরা যতই গভীরে অবতরণ করে যতই সূক্ষ্মতার সঙ্গে দেখতে থাকব ততই ঐ সমস্ত পর্যায় আমাদের দৃষ্টিপথে ক্রমশঃ একের পর এক উদঘাটিত হতে থাকবে। এমনও সম্ভব যে, যদি আমরা ঐ পেন্সিল পাঁচ-দশ দিন ধরে দেখতে থাকি তবে সেটি আর পেন্সিলই থাকবে না, আমাদের কাছে সেটি অন্য কিছু হয়ে যাবে। তখন পেন্সিলই হয়ে দাঁড়াবে সত্য উদঘাটনের একটি মাধ্যম।

আমরা আকার দেখব—তার বাইরেরটাও দেখব, ভেতরটাও দেখব। স্থূল-সূক্ষ্ম দুটি রূপই দেখব। দেখতেই থাকব আর দেখতেই থাকব, আর ক্রমশঃ গভীরে অবতরণ করে দেখতে থাকব। দেখা, কেবল দেখা, আর গভীরে নেমে দেখা। আমরা যত বেশি সম্ভব গভীরে অবতরণ করে দেখতে থাকব। দেখা, কেবল দেখা, আর গভীরে নেমে দেখা। আমরা যত বেশি গভীরভাবে দেখতে থাকব তত এমন সব নতুন নতুন পর্যায় উদঘাটিত হতে থাকবে যা প্রথম দর্শনকালে কল্পনাই করা যায়নি।

যেমন ভাবে পেন্সিলকে দেখা হল তেমন ভাবেই শ্বাসকে দেখা দরকার। কেবল বাইরের বস্তু যে আমাদের কাছে দেখার যোগ্য তা নয়, আমাদের আশেপাশেই দেখার যোগ্য অনেক কিছু আছে। শ্বাসকে দেখ, শ্বাসের কল্পনাকে দেখ। শ্বাস যে বিন্দুকে ছুঁয়ে আছে তাকেও দেখ। শ্বাস কত দূর পর্যন্ত যায়, কোথায় মোড় ফেরে, কোথা থেকে ফিরে আসে এবং কোথায় ঐ শ্বাস প্রশ্বাসে পরিণত হয়—এ সব দেখ। শ্বাসের তীব্রতাকে দেখ, শ্বাস কতটা স্থূল তা দেখ, শ্বাস কতটা ছোট তাও দেখ। শ্বাস কি অধিক পরমাণু-সম্বলিত, না অল্প পরমাণু-সম্বলিত অবস্থায় আছে? শ্বাস কতটা দীর্ঘ? ওর দৈর্ঘ্যকে লক্ষ্য কর। শ্বাসের গতিকে লক্ষ্য কর। একই শ্বাসের বিভিন্ন রূপকে দেখতে থাক।

শরীরকে দেখ। শরীরের আয়তন খুবই ছোট, কিন্তু তা এক অতি বৃহৎ ভাণ্ডার। শরীরের যন্ত্রপাতি এত বিপুল যে তাঁর সঙ্গে তুলনায় পৃথিবীর

অতি বড কাবখানাগুলিও ছোট বলে মনে হবে। এই ক্ষুদ্র শবীবে এত বেশি সংখ্যক যন্ত্র আছে, আব তাদেব নির্মাণকৌশল এতই আশ্চর্যজনক যে, কোন মানুষ যদি ঐ সব যন্ত্র নির্মাণ কবতে চেষ্টা কবে, তবে আজ সর্ব বিষয়ে বিকশিত বিজ্ঞানেব যুগেও সে সফল হতে পাববে না। মানুষেব এই ক্ষুদ্রাকৃতি মস্তিষ্কে কোটি কোটি প্রকোষ্ঠ আছে, যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। কোন মানুষই তা নির্মাণ কবতে সমর্থ হবে না। কোন মানুষেবই এমন ক্ষমতা আব যোগ্যতা নেই যে সে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ কবতে পাববে।

নিজেব কাছেই যখন দেখাব এত বস্তু পডে আছে তখন বাইবে দৃষ্টি দেওযাব আবশ্যকতা কি? আপনি মস্তিষ্কেব এক একটি প্রকোষ্ঠকে দেখতে শুরু করুন। মস্তিষ্কে কোটি কোটি প্রকোষ্ঠ আছে। কোনটি স্মৃতিব প্রকোষ্ঠ, কোনটি অনুভূতিব প্রকোষ্ঠ। কোনটি ক্রোধেব প্রকোষ্ঠ, কোনটি ক্ষমাব প্রকোষ্ঠ। কোনটি অভিমানেব প্রকোষ্ঠ, কোনটি মাযাব প্রকোষ্ঠ। যত বকম আবেগ, যত বকম বৃত্তি, যত বকম বাসনা আছে—তাদেব প্রত্যেকেব পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে। সেগুলি দেখুন। আজ্ঞাচক্রকে দেখুন, নাসাগ্রকে দেখুন, নাভিমণ্ডলকে দেখুন। এই বকম আবও অনেক স্থান আছে। আপনি সবই দেখতে থাকুন। অনেক বহস্য উদঘাটিত হতে থাকবে।

দেখা কেবল দেখা নয়, তাব একটা পবিণামও আছে। শবীবেব কোন এক স্থানকে দেখাব অর্থ হল, মনকে সেখানে কেন্দ্রিত কবা। যখনই আপনি আজ্ঞাচক্রকে দেখবেন তখনই মন সহজেই একাগ্র হযে যাবে। কাবণ ঐ স্থানেব এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যে মন যখনই সেখানে পৌঁছবে তখনই সেখানে আটকে থাকবে। ঐ স্থানই মনকে ধবে বাখবে। আমাদেব শবীবেব অভ্যন্তবে এত অসংখ্য নাডী আছে, এত বৃহৎ নাডী-সংস্থান আছে যে, আমবা সেগুলি দেখে শেষ কবতে পাবব না।

আমাদেব শবীবেব মধ্যে অনেক গ্রন্থি আছে। যোগেব প্রাচীন আচার্যবা ঐগুলিকে 'চক্র' বলে অভিহিত কবেছেন। আধুনিক শবীব বিজ্ঞানীবা

ঐগুলিকে 'গ্লাণ্ডস' বলেছেন। জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধ পদ্ধতির 'জুডো'-তে ঐগুলিকে 'ক্যুসোস' বলে। এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, যোগের আচার্যরা চক্রগুলির যে যে স্থান ও আকার বর্ণনা করেছেন, আধুনিক শরীর বিজ্ঞানীরা গ্ল্যাণ্ডগুলির যে যে স্থান ও আকার স্বীকার করেছেন, এবং জুডো পদ্ধতিতে ক্যুসোসের যে যে স্থান ও আকার বলা হয়েছে—তা তিন ক্ষেত্রেই সমান। বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

ক্রমিক সংখ্যা	জুডো ক্যুসোস	গ্ল্যাণ্ডস	যোগচক্র
১	টেণ্ডো	পিনিয়ল গ্ল্যাণ্ড	সহস্রার চক্র
২	উতো	পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড	আজ্ঞা চক্র
৩	হিচু	থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড	বিশুদ্ধি চক্র
৪	ক্যোটোটুস্যু	থাইমাস গ্ল্যাণ্ড	অনাহত চক্র
৫	সুইগেটস্যু	সোলার প্লেক্সাস	মণিপুর চক্র
৬	মাইওজো	অ্যাড্রিনাল গ্ল্যাণ্ড	স্বাধিষ্ঠান চক্র
৭	সুরগিনে	পেলভিক প্লেক্সাস	মূলাধার চক্র

একের পর এক গ্ল্যাণ্ড বা ক্যুসোস বা চক্রকে দেখতে থাকুন। ঐ সবের স্থান স্পষ্টরূপে প্রতিভাষিত হতে আরম্ভ করবে। এদের দেখার পরিণাম সুমহৎ হয়ে থাকে।

আমাদের সামনে দেখার মত বহু বস্তু আছে। সুতরাং আমরা কি দেখব এই প্রশ্ন নিরর্থক। দেখার জন্য আমাদের এই শরীরই পর্যাপ্ত। তা ছাড়া জগৎ অতি প্রকাণ্ড। এত প্রকাণ্ড যে দেখার যোগ্য বস্তুর অভাব কোন দিনই হবে না। দেখার পক্ষে কোন বস্তুই অযোগ্য নয়। যে বস্তুকে আমরা সবচেয়ে তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বলে মনে করি তার দর্শনেও আমাদের সত্তার দর্শন হতে পারে। কোন বস্তু ততক্ষণই তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বা মন্দ থাকে যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টিকোণ অন্য রকম থাকে। যখন আমাদের দৃষ্টিকোণ সত্তাকে দেখার উপযুক্ত হয় তখন কোন বস্তুই তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বা মন্দ থাকে না। তখন ভাল-মন্দের ভেদ সমাপ্ত হয়ে যায়।

কেবল যথার্থকে দেখবাব, সত্যকে দেখবাব কথাই শেষে থেকে যায।

আমাদেব প্রথম প্রশ্ন ছিল—কি দেখব? এ সম্বন্ধে আমি কিছুটা আলোচনা কবলাম মাত্র।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন—কেমন কবে দেখব? এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেখা যতটা গুরুত্বপূর্ণ তাব চেযেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—কেমন কবে দেখব। এব সোজা উত্তব হবে, চোখ দিযে দেখ। এ উত্তব ঠিকই যে আমবা চোখ দিযে দেখি। কিন্তু কেবল চোখ দিযে দেখাই যথেষ্ট নয। চোখ দিযে দেখাব আগে যে সব অপবিহার্য শর্ত আছে সেগুলি বুঝতে হবে। প্রথম শর্ত হল, অনাসক্তভাবে দেখতে হবে। নির্লিপ্ত হযে দেখতে হবে। বাগ-দ্বেষ শূন্য চিত্ত নিযে দেখতে হবে। যদি আসক্তি এসে যায, ঠিক দেখাই হবে না। চোখ দেখবে বটে, কিন্তু যথার্থ দেখবে না—নজবে অন্য কিছু এসে যাবে।

বসিক লোকেব কাছে তাব স্ত্রীব গোল মুখাবযব চাঁদেব মত সুন্দব মনে হয। আবাব কিন্তু ক্ষুধার্ত লোকেব কাছে তাব স্ত্রীব গোল মুখ রুটিব মত মনে হতে পাবে। কাবণ দেখাব সঙ্গে একজন কামাসক্তি জুড়ে দিযেছে, অন্য জন জুড়ে দিযেছে পদার্থাসক্তি। নতুবা স্ত্রীব মুখ কি কবে চাঁদেব মত হবে, কি কবেই বা রুটিব মত হবে?

নাটকেব এক দৃশ্য কল্পনা কবা যায—এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি চাঁদ দেখছে, পূর্ণিমাব চাঁদ দেখছে, তাব চোখেব সামনে গোল গোল রুটি ভেসে বেড়াচ্ছে।

আমবা চোখ দিযে দেখছি, কিন্তু যথার্থ বস্তু দেখাই দিচ্ছে না। বস্তুব সঙ্গে আমাব যে আসক্তি জুড়ে দিচ্ছি তাই আমি দেখতে পাচ্ছি। বহু সময়ে সুন্দব অসুন্দব হযে দেখা দেয। আবাব অসুন্দবও সুন্দব দেখা দেয। যাব সঙ্গে আসক্তি জুড়ে দেওযা হযেছে তা অসুন্দব হলেও সুন্দব প্রতীত হবে। যাব সঙ্গে ঘৃণা বা তিবস্কাবেব ভাব জুড়ে দেওযা হযেছে তা সুন্দব হলেও অসুন্দব বলে প্রতীত হবে। বেচাবা চোখ কোথায যথার্থ বস্তু দেখতে পাবে? চোখেব ওপবে যে আসক্তিব, বাগ-দ্বেষেব,

প্রিয়তা-অপ্রিয়তার আবরণ পড়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আবরণ দূর না হয়—আসক্তি ও রাগ-দ্বেষ মিটে না যায়, প্রিয়তা ও অপ্রিয়তার বোধ নষ্ট না হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত চোখ যথার্থভাবে দেখতে পারে না। যার যা প্রকৃত রূপ তাকে সেই রূপে দেখতে সমর্থ হবে না। কোন লোক যথার্থই ভাল, কিন্তু আমি তাকে মন্দ দেখছি, মন্দ বলে মনে করছি। আবার কোন লোক যথার্থই মন্দ। কিন্তু আমি তাকে ভাল দেখছি, ভাল বলে মনে করছি। কারণ ভাল বা মন্দ মনে করার সঙ্গে অন্য এক ভাবনা কাজ করছে। এ কারণেই অনাসক্ত হয়ে দেখুন। নিরপেক্ষ ভাবে দেখুন, তবেই কেবল যথার্থভাবে দেখতে পাবেন। যা ঘটিত হচ্ছে ঠিক তাই দেখুন। তার সঙ্গে কোন রকমের চিন্তা বা ভাবনা জুড়ে দেবেন না। বস্তুকে অনাসক্ত ভাবে দেখা, রাগ-দ্বেষ-রহিত চিত্তে দেখা, নিরপেক্ষ ভাবে যা যে রকম তাকে ঠিক সেই ভাবে দেখা—এই হল আমাদের দেখার প্রকার।

যখন অনাসক্ত চেতনা জাগ্রত হয়ে যায় তখন যে কোন মাধ্যমকেই আমরা কাজে লাগাতে পারি। চোখ এক মাধ্যম। স্থূল বিষয়, যা চোখের মাধ্যমে দৃশ্য হয়, তা আমরা চোখ দিয়ে দেখব। যা মনের দ্বারা দেখার যোগ্য তা আমরা চোখ বন্ধ করে মনের দ্বারাই দেখব। যদি চোখ খুলে রেখেই দেখতে চান তো সেই ভাবেই দেখুন। ভেতরকে দেখুন। এই দেখাকে বলে 'অনিমেষ দর্শন'। কোনও বস্তুকে অপলক দৃষ্টিতে দেখুন। চোখ খোলা আছে, খোলাই থাকুক। পলক যেন না পড়ে। এই হল 'অনিমেষ দর্শন'। অর্থাৎ অপলক দৃষ্টিতে দেখা। তন্ত্র ও হঠযোগে একে 'ত্রাটক' বলা হয়েছে। ত্রাটকের অর্থ হল, অপলক দৃষ্টিতে এক বিন্দুকে দেখা। নিরন্তর দেখা।

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—কেন দেখব? চেতনার মূল স্বভাবই হল দেখা। চিন্তা করা বুদ্ধির কাজ। বুদ্ধি চেতনার একটি রশ্মি মাত্র। আর বিচার তার আলোক। দেখা অখণ্ড চেতনার কাজ। চেতনা যখন অনাবৃত হয় তখন কেবল দর্শন হয় চিন্তন, আর হয় না। দেখাই আমাদের স্বভাব।

সেজন্য কেন দেখব এ প্রশ্নই হয না। নিজেব স্বভাবেব সঙ্গে আমাদেব পবিচয কম, তাই এই প্রশ্ন অস্বাভাবিকও নয। যতই গভীব ও স্থিব ভাবে আমবা দেখতে শিখব ততই আমাদেব একাগ্রতা বাড়বে ও সমাধিব পুষ্টি সাধন হবে। সমাধি লাভ কবাব সবচেযে সবল উপায হল দেখা। কোন এক বিন্দু বা লক্ষ্যেব ওপব মনকে স্থিব করুন আব নিবন্তব দেখতে থাকুন। কিছুক্ষণ পবেই নির্বিচাবতা এসে যাবে এবং সমাধিব অনুভব হতে থাকবে। নিবন্তব দেখাব কাল যতই বাড়বে ততই সমাধিব পুষ্টি সাধন হবে।

একাগ্রতা ও নির্বিচাবতা লাভেব যত প্রকাব সাধন আছে, যথা—মন্ত্র,জপ, শ্বাস-নিবোধ, ঐকান্তিক বিচাব, অবলম্বন প্রভৃতি—তাদেব কোনটাই স্বাভাবিক নয। কাবণ প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন বিশেষ বিকল্প বা প্রযত্নেব প্রযোজন হয। দেখা কিন্তু স্বাভাবিক। তাব জন্য কোন কল্পনা, বিচাব বা বিকল্পেব সহাযতা নেওযাব আবশ্যক হয না। মনকে নিযোজিত কবলেই চলে, তাতেই সহজে স্বভাব উদ্বুদ্ধ হয আব লুক্কাযিত শক্তি প্রকট হতে থাকে। স্বভাবেব অনুভূত চৈতন্যেব সাক্ষাৎকাব, স্থূলেব মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত সূক্ষ্মেব প্রতীকিকবণ, আনন্দ ও শক্তিব অনুভব—এ সব নিবন্তব দর্শনেব দ্বাবাই পাওযা যেতে পাবে। সুতবাং দেখাব অর্থ নিবতিশয গভীব ও জটিলতাপূর্ণ নয, এবং দুরূহ মীমাংসা-সাপেক্ষও নয।

দর্শন (দেখা) সম্বন্ধে যে তিনটি প্রশ্ন উঠেছিল ঃ কি দেখব ? কেন দেখব ? কেমন কবে দেখব ? সেগুলিব সংক্ষিপ্ত আলোচনা কবা হল।

এখন দ্বিতীয প্রসঙ্গ হল, চিন্তন। চিন্তা কবা, বিচাব কবা, ভাবা। চিন্তনও সত্যকে উপলব্ধি কবাব এক প্রকৃষ্ট সাধন। চিন্তন বা বিচাবেব সার্থকতা আছে। বিচাব তখনই ব্যর্থ হয যখন তা একটি বিষযেব ওপব কেন্দ্রিত হয না। কেউ যদি কেবল বিচাবই কবতে থাকে তবে বিচাব অসার্থক হবে। একজন সমঝদাব মানুষ ও পাগলেব মধ্যে প্রভেদটা কোথায ? তাদেব মধ্যে সত্যিই খুব বেশি পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি

নিজের ইচ্ছামত নিজের বিচারশক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে সে সমঝদার, আর যে তা পারে না সে পাগল। সমঝদার ব্যক্তি বিচার করে, পাগলও বিচার করে। এমন মনে করবেন না যে, পাগল চিন্তা বা বিচার করতে পারে না। পাগলও চিন্তা করে, বিচার করে। কিন্তু যে বিচার তার মনে এসে যায়, তাকে আর সে ছাড়তে পারে না। ঐ বিচার যেন তাকে আঁকড়ে ধরে। ফলে তার মনে সতত ঐ একই বিচার চলে। যাকে বিচার আঁকড়ে ধরে, যে বিচার ছাড়তে পারে না, তাকে পাগল বলে। আর যে বিচারকে ছাড়তে পারে, তাকে ইচ্ছামত বদলাতে পারে, সে সমঝদার। দুজনের মধ্যে এই সামান্য পার্থক্য, যেন একটি সূক্ষ্ম রেখা দিয়ে দুজনের মধ্যে ব্যবধান করা হয়েছে।

কোন এক বিষয়ে চিন্তা করতে করতে যখন ইচ্ছা তখন সেই বিষয় ত্যাগ করে অন্য এক বিষয়ে চলে যাওয়ার ক্ষমতার খুবই উপযোগিতা আছে। আমরা বিচারের দ্বারা সত্যকে বুঝতে পারি, জানতে পারি। এই বিচার ধ্যানের দ্বারা অনেক মহত্ত্বপূর্ণ তথ্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে। এক প্রাচীন পদ্ধতি আছে, যা যোগের প্রায় সব শাখাতেই পাওয়া যায়। আচার্য শিষ্যকে এক সমস্যা দিয়ে বললেন, এর সমাধান খোঁজ কর। কোন বইতে সমাধানের খোঁজ পাওয়া যাবে না, বস্তুতঃ বই থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যাবে না। আচার্য উপদেশ দিলেন, সমস্যাটি নিয়ে বিচার কর, চিন্তা কর। একদিন, দুদিন, দশদিন—যতদিন না সমাধান পাওয়া যায় ততদিন বিচার করতে থাক, চিন্তা করতে থাক। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা অনেক দূরের ব্যাপারের খোঁজখবর পাওয়া গেছে, অতীতের ঘটনাবলীর সন্ধান মিলেছে, আর ভবিষ্যতে ঘটতে চলেছে এমন ঘটনা জানা গেছে।

এক পাথরের টুকরো হাতে এল। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে এটা কোন উপাদানে গঠিত। তখন হয়ত জানতে হবে, কোন কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে এই পাথর এতদিন টিঁকে আছে। পাথর নিয়ে বিচার চলল। পরিশেষে এমন এক অবস্থা এল যখন পাথর অব্যক্তরূপে তার সমস্ত

ঐতিহাস জানিযে দিল।

কোন এক শব্দেব অর্থ আমাকে জানতে হবে। আমি চিন্তা কবতে লাগলাম। এমন সময আসবে যখন শব্দ নিজেই তাব অর্থ প্রকাশ কববে।

মহর্ষি চবক আয়ুর্বেদেব প্রাচীন আচার্য। তিনি জঙ্গলে চলে গেলেন। সেখানে বিভিন্ন গাছপালাব সামনে বসে বললেন—'তুমি আমাকে বল তোমাব উপযোগিতা কি? কোন বোগেব চিকিৎসায তুমি কাজে লাগ? তোমাব পবিণামই বা কি হতে পাবে। বল, নিজেব কথায নিজেব কাহিনী আমাকে শোনাও।' এই বলে তিনি তন্ময হযে গেলেন, একাগ্রচিত্তে সমস্যাব চিন্তা কবতে লাগলেন। একাগ্রতা যখন চবম বিন্দুতে পৌঁছল, তখন গাছপালা তাদেব শ্রেষ্ঠ গুণ ধর্ম বর্ণনা কবতে লাগল এবং চবক তা জানতে পাবলেন। এ ঘটনা সত্য। গাছ অবশ্য কথা বলে না। কিন্তু ঐ সমস্যা নিযে নিবন্তব চিন্তা কবাব ফলে মন এত গভীবে প্রবেশ কবে যে সূক্ষ্ম পর্যাযেব সঙ্গে তাব সাক্ষাৎকাব হয। তখন আপনা থেকেই শ্রেষ্ঠ পর্যাযগুলি উদঘাটিত হয। এই হল বিচাবেব প্রক্রিযা, সত্যকে জানাব বিশেষ উপযোগী প্রক্রিযা। এই প্রক্রিযা দ্বাবা আজও অনেক বহস্যেব উদঘাটন কবা যায। জৈন পবিভাষায একে 'ধর্ম্য ধ্যান' বলা হয।

দুই প্রকাব ধ্যানকে শুভ মনে কবা হয—এক ধর্ম্য ধ্যান, অপব শুক্ল ধ্যান। শুক্ল ধ্যানেব অর্থ—আত্মাকে দেখা। এই ধ্যানে আত্ম-সাক্ষাৎ-কাব হয। ধর্ম্য ধ্যানেব অর্থ হল বস্তুব স্বভাব। এখানে ধর্ম নেই, ধর্ম্য আছে। ধর্ম-অধর্ম শব্দ দুটি এখানে ব্যবহাবযোগ্য নয। এই শব্দ দুটি আচাবেব সঙ্গে, আচবণেব সঙ্গে, সম্বন্ধযুক্ত, ধর্ম্য শব্দেব সঙ্গে এদেব সম্বন্ধ নেই। ধর্ম্য শব্দেব অর্থ বস্তু স্বভাব। বস্তুব স্বভাব বিচাব দ্বাবা, অনুসন্ধানেব দ্বাবা, চিন্তন দ্বাবা জানা—এই হল ধর্ম্য ধ্যানেব প্রক্রিযা। এব দ্বাবা বস্তুব গুণ-ধর্ম জানা যায। কোন বস্তুব কি গুণ, কি দোষ তা জানা যায। বস্তুব অভ্যন্তবীণ স্বৰূপ, সূক্ষ্ম স্বৰূপ জানা যায। এই হল

বিচার ধ্যান বা চিন্তন ধ্যান। এর তাৎপর্য হল বিচার প্রধান ধ্যান, চিন্তন প্রধান ধ্যান। আমি স্বীকার করি না যে চিন্তনের দ্বারা বা বিচারের দ্বারা ধ্যান হয় না ; বিচার করাও ধ্যান, চিন্তা করাও-ধ্যান। তবে বিচার তখনই ধ্যানে পরিণত হয় যখন তা এক দিকেই গড়িয়ে প্রবাহিত হয়, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে না বা বিক্ষিপ্ত হয় না। একদিকে যাওয়া জলধারায় পরিণত হয়। এই ধারাই চাই। ধ্যানের ধারা চলবে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জলের বিন্দুতে জলধারা হয় না। সেই রকম ছড়িয়ে পড়া বিচার দ্বারা ধ্যান হয় না। বিচার যখন কেন্দ্রিত হয়, এক দিকে প্রবাহিত হয়, তখন তা ধ্যান পদবাচ্য হয়।

বিচারও ধ্যান, নির্বিচারও ধ্যান। উভয় প্রকার ধ্যানের নিজ নিজ মহত্ত্ব আছে। একদিকে প্রবাহিত বিচারই ধ্যান, তাকে বলে বিচার ধ্যান। দর্শনের ভূমিতে হয় নির্বিচার ধ্যান। এখানে বিচার হয় না, কেবল দর্শনই হয়। একথা মানা যায় না যে নির্বিচার ধ্যানে কিছুই ঘটে না। কিছুই না ঘটা তো মূর্চ্ছার অবস্থা, ধ্যানের অবস্থা নয়। ধ্যানের কোন না কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বা বিষয় থাকে। এক প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন আমরা একদিকে চিন্তাকে প্রযুক্ত করি তখন ধ্যান হয় না। যখন আমরা একভাবে দেখি তখন ধ্যান হয়। উত্তর হল, একদিকে চিন্তা করা বিচার-ধ্যান, আর দেখা নির্বিচার-ধ্যান ; উভয়ই ধ্যান।

প্রেক্ষা ধ্যানে দুয়ের উপযোগিতা আছে। প্রেক্ষার অর্থ নির্বিচার ধ্যান, দেখার ধ্যান। প্রেক্ষা ধ্যানের প্রথম অঙ্গ হল দেখা। এই অবস্থায় আমরা কেবল দেখি, কোন বিচার করি না। শরীরকে দেখি, কিন্তু বিচার করি না। শরীরের ভেতরে যা কিছু ঘটে চলেছে তা লক্ষ্য করি। কোথায় চঞ্চলতা হচ্ছে ? কোথা থেকে শব্দ আসছে ? কোথায় কোন অবয়ব সক্রিয় আছে ? এই সবই আমরা দেখি, কেবল দেখি, কোন চিন্তা বা বিচার করি না। আমাদের শরীরের ভেতরে সর্বদা নানা প্রকার ক্রিয়া হয়ে চলেছে, অনেক প্রকার শব্দ উত্থিত হচ্ছে। আমরা এই সব ক্রিয়ার কথা জানি না, এই সব শব্দ শুনি না। কারণ বাইরে এত শব্দ নিয়ত

উঠছে যে ভেতবেব সূক্ষ্ম শব্দ শোনাব অবসবই আমাদেব হয না। এই সব শব্দ আপনি ধ্যানেব দ্বাবা শুনুন, সত্যিই শোনা যাবে। আমাদেব হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক কবছে, সে শব্দ আপনি শুনতে পাবেন। বক্তেব প্রবাহ নিবন্তব বযে যাচ্ছে, তাব শব্দও আপনি শুনতে পাবেন। এজন্য অবশ্য আপনাকে সূক্ষ্মতাব মধ্যে যেতে হবে। পূর্ণ একাগ্রতা আনতে হবে। তবেই আপনি ঐ সব সূক্ষ্ম শব্দ শুনতে পাবেন। প্রেক্ষা ধ্যানেব অর্থ কেবল দেখা, চিন্তা কবা বা বিচাব কবা নয।

প্রেক্ষা ধ্যানেব দ্বিতীয অঙ্গ—অনুপ্রেক্ষা। অনুপ্রেক্ষাব-অর্থ, ধ্যানে আমবা যা কিছু দেখি তাব পবিণাম সম্বন্ধে বিচাব কবা। 'অনু' শব্দটিব অর্থ—যা পবে ঘটে। ধ্যানে যা দেখি, প্রেক্ষায় যা দেখি, তাকে পবে প্রেক্ষা কবা, তাব পবিণাম সম্বন্ধে বিচাব কবা— এই হল অনুপ্রেক্ষা। 'অনু'—অর্থাৎ পবে, 'প্রেক্ষা'—অর্থাৎ বিচাব কবা। আমবা দেখি শবীবেব কোন অংশে স্পন্দন হচ্ছে। পবমাণু আসছে যাচ্ছে, পবমাণুব উপচয হচ্ছে, আবাব অপচযও হচ্ছে। পবমাণুব জন্ম হচ্ছে, বাড়ছে। আমবা এ সমস্ত দেখি। তাব পবে চিন্তা কবি, এ সবেব পবিণাম কি হবে? আমবা অনিত্যকে অনুপ্রেক্ষা কবি, কাবণ পবমাণুব এই যে স্পন্দন আব যাতাযাত তা নিত্য হতে পাবে না। ঐ সমস্ত যখন অনিত্য উপলব্ধ হয তখন আমবা উপলব্ধি কবি শবীব অনিত্য। শবীব অনিত্য, এ তথ্য জানাব আধাব কি? জানাব আধাব—প্রেক্ষা। যখন আমবা প্রেক্ষাব দ্বাবা দেখি শবীবে স্পন্দন, কম্পন, গতি, পবমাণুব যাতাযাত, পবমাণুব অপচয আছে, তখন বুঝি এ সবেব অর্থ, শবীব অনিত্যধর্মা। এই অনিত্যতা অনুভব কবা, বিচাব কবা, চিন্তা কবা—এবই নাম অনুপ্রেক্ষা।

প্রেক্ষা আব অনুপ্রেক্ষা এক সঙ্গে চলবে। আমবা প্রেক্ষা কবব, অনুপ্রেক্ষাও কবব। প্রেক্ষা ও অনুপ্রেক্ষা কোনটাই নিবন্তব চলতে পাবে না। আমবা কখনও প্রেক্ষা কবব, আবাব কখনও অনুপ্রেক্ষা কবব। প্রথমে প্রেক্ষা, তাবপবে অনুপ্রেক্ষা। প্রথমে দেখা, তাবপবে যা দেখলাম

তাব সম্বন্ধে বিচাব কবা। বিচাবেব ফলে যা সাব নিষ্কর্ষ পাওযা যাবে তা জীবনে কাজে লাগাতে হবে।

ধ্যানেব তুটি দিক—প্রেক্ষা ও অনুপ্রেক্ষা। আমবা দেখব আব চিন্তা কবব। উভয প্রকাবে ধ্যানকে অবলম্বন কবে আমবা সত্যকে অনুভব কবব, যথার্থকে জানব আব নিবপেক্ষভাবে বস্তুকে দেখাব অভ্যাস কবব। তবেই আমবা প্রেক্ষাধ্যানে সফলতা লাভ কবতে পাবব। প্রেক্ষাধ্যানেব প্রযোজন এই যে, এব দ্বাবা আমবা গভীবে অবতবণ কবে দেখাব ও সম্যক প্রকাবে চিন্তা কবাব অভ্যাস কবতে পাবি এবং পবিশেষে সত্যেব সাক্ষাৎ লাভ কবে কৃতার্থ হতে পাবি।

২

শরীর সাধনা

প্রথমে 'পাওযাব হাউস' তৈবি কবা হয, পবে তা থেকে তাব টানা হয। তখন সেই তাবেব ভেতব দিযে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয আব বালবেব মাধ্যমে প্রকট হয। যতক্ষণ পর্যন্ত বালবেব সঙ্গে সংযোগ না ঘটে তত-ক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রকট হতে পাবে না। আমবা কেবল বিদ্যুৎ প্রবাহেব ওপব মনোযোগ কেন্দ্রিত কবি না, ববং যাব মাধ্যমে তা অভিব্যক্ত হয তাব ওপবও পূর্ণ মনোযোগ আবোপ কবি।

আমাদেব শবীব হচ্ছে সববকম শক্তিব অভিব্যক্তিব সবচেযে শক্তিশালী মাধ্যম। আমবা যদি শক্তিব ওপব মনোযোগ কেন্দ্রিত কবি আব সেই শক্তিব অভিব্যক্তিব মাধ্যমেব ওপব মনোযোগ না দিই, তবে তা হবে সবচেযে সাংঘাতিক ভুল। শবীবই মাধ্যম, সুতবাং তাকে উপেক্ষা কবা মাবাত্মক ভুল।

প্রথমেই আমাদেব মনোযোগ দিযে দেখতে হবে, যেসব শক্তি প্রকট হবে সেগুলি ধাবণ কবাব সামর্থ্য আমাদেব শবীবেব আছে কিনা। তাব সে ক্ষমতা আছে কিনা। শবীব যদি সশক্ত না হয, সক্ষম না হয়, তবে কোন শক্তিই তাতে অবতবণ কববে না বা অভিব্যক্ত হতে পাববে না। কাবণ দুর্বল শবীবে কোন শক্তিব অভিব্যক্তি সম্ভবপব নয়। আমাদেব

শরীরে যতগুলি শক্তিকেন্দ্র আছে সেগুলিকে আগে সুদৃঢ় করতে পারলে তবেই শরীরে বিশেষ কোন শক্তির অবতরণ সম্ভব হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি পরামর্শ দিই যে, আমরা যেন আমাদের শরীরের প্রতি উদাসীন না হই বা ঘৃণার ভাব পোষণ না করি। বরং আমরা যেন শরীরকে ভালবাসতে শিখি। কারণ শরীরই আমাদের সব রকম সফলতার মাধ্যম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমও বটে। সবার আগে আমাদের শরীরকে বুঝতে হবে আর শরীরে যেসব শক্তি কেন্দ্র, যেসব চৈতন্য-কেন্দ্র অবস্থিত আছে সেগুলিকে বুঝতে হবে।

শরীর কি? সাধারণভাবে বলতে গেলে, রক্ত, মাংস ও নোংরা জিনিষের পিণ্ডমাত্র। এতে আছে হাড়, মজ্জা, মেদ প্রভৃতি। এগুলি বড়ই বীভৎস, দেখলেই মন ঘৃণায় ভরে ওঠে। আমাদের সামনে শরীর বীভৎস রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৈরাগ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তার বীভৎসতা দেখতে যত্ন করে থাকি। এই দৃষ্টিকোণ ভুল নয়। এ কথা সত্য যে শরীর যথার্থই বীভৎস, এতে সার পদার্থ কিছু নেই। যে সাতটি ধাতুতে শরীর গঠিত তার সব কটিই নশ্বর। শরীর যে বীভৎস, বিকৃত ও খারাপ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ তো দেখার এক কোণ মাত্র, অন্য অন্য কোণ থেকেও দেখতে হবে। কোন বস্তুকে কেবল এক কোণ থেকে দেখলে যথেষ্ট হবে না। যদি আমরা কেবল এক কোণ থেকেই দেখি তবে আমরা একাঙ্গী হয়ে যাব এবং আমাদের দৃষ্টিকোণ অসম্যক হবে। আমাদের দৃষ্টিকোণ তখনই সম্যক হয় যখন আমরা একই বস্তুকে বিভিন্ন কোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত হই। যখন আমরা অনেক কোণ থেকে দেখি তখনই হয় প্রকৃত দর্শন। অন্যথায় কেবল দেখাই হয়। সে দেখা খণ্ডিত দৃষ্টি মাত্র, ফলে প্রমাদদুষ্ট।

শরীরকে দেখার অন্য দৃষ্টিকোণও আছে। তা এই যে, আমাদের পক্ষে শরীর যতটা সারভূত ততটা অন্য কোন মূর্ত বস্তুই নয়। একমাত্র এই শরীরই পরমাত্মার বা চৈতন্যের বা শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকট করতে সক্ষম। সমর্থ শরীর না থাকলে কেউ কেবলজ্ঞানী হতে পারে না।

কেবলজ্ঞান আত্মার শক্তি, আত্মার নিরাবরণ অবস্থা। এই অবস্থায় জ্ঞানের সমস্ত আবরণ দূর হয়, আর পূর্ণ চেতনার উদয় হয়। কিন্তু এই জ্ঞান প্রকট হওয়ার একটা শর্ত আছে। যে কোন শরীর কেবলজ্ঞানের অবতরণ সহ্য করতে পারবে না। এজন্য শর্ত এই যে, যে শরীর বজ্র-ঋষভ-নারাচের মত সুদৃঢ় সংগঠনযুক্ত একমাত্র সেই শরীরই কেবলজ্ঞানের অবতরণের ধাক্কা সহ্য করতে পারবে। এই রকম শরীর-ধারী ব্যক্তিই কেবলী হতে পারে, অন্য কেউ নয়। বজ্র-ঋষভ-নারাচ হল সবচেয়ে শক্তিশালী শরীর সংরচনা। এরকম শরীরে অস্থির বাঁধন খুব মজবুত হয়। এরকম শরীরসম্পন্ন ব্যক্তিই কেবলজ্ঞানী হতে পারে। সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

আপনি ভাবতে পারেন, এ কেমন শর্ত? শরীরের সঙ্গে কেন এমন শর্ত? কেবলজ্ঞান প্রাপ্তির অর্থ তো চেতনার অভ্যুদয়, বিশুদ্ধ চেতনার অবতরণ, চেতনার পূর্ণ বিকাশ। তা আত্ম-নির্মলতা থেকে পাওয়া যায়, সম্পূর্ণরূপে রাগ-দ্বেষের বিলয় হলে তা মেলে। তবে এর সঙ্গে শরীর-সম্বন্ধীয় শর্ত কেন? এই প্রতিবন্ধ কেন, যে ব্যক্তির শরীর-সংরচনা বজ্র-ঋষ-নারাচের মত সুদৃঢ়, সে ব্যক্তিই শুধু কেবলী হতে পারে, অন্যে নয়।

এরকম তর্ক হতে পারে বটে, কিন্তু আমি বলি এমন শর্ত খুবই মহত্বপূর্ণ।

মনে করুন, একটা ছোট মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। তার ওপর দশ জন বসতে পারে। এটুকু মাত্র তার ক্ষমতা। এখন যদি পঞ্চাশজন তার ওপর বসার চেষ্টা করে, তবে মঞ্চটি ভেঙ্গে যাবে। কারণ পঞ্চাশ জনের ভার বহন করার শক্তি তার নেই। পাতলা কাপড়ের ওপর বেশি ভারি জিনিষ ফেলে দিলে কাপড় ফেটে যাবে। যতটা ভার বহন করার ক্ষমতা যার আছে সে কেবল ততটা ভারই বহন করতে পারে।

শরীরের সংহনন, শরীরের সংরচনা যদি দুর্বল হয়, যদি স্নায়ু-সংস্থান, কমজোর হয় এবং তা সত্ত্বেও যদি কৈবল্যের মত বিরাট শক্তি সেই

শবীবে অবতবণ কবে তবে সেই শবীব ফেটে যাবে। কৈবল্যেব কথা দূবে থাকুক, ছোট কোন শক্তিব অবতবণও সেই শবীব সহ্য কবতে পাববে না। তা একেবাবেই বিকল হযে যাবে।

মস্তিষ্কে সহস্রাব নামে এক চক্র আছে, তা এক প্রসিদ্ধ শক্তি-কেন্দ্র। কোন দুর্বল ব্যক্তি ঐ শক্তি-কেন্দ্রেব উপব ধ্যান কবল। তাব ফল কি হল? ধ্যানেব দ্বাবা ঐ চক্র সক্রিয হযে উঠল এবং সক্রিযতাব ফলে উষ্ণতা উৎপন্ন হল, তাপ আব শক্তি উৎপন্ন হল। সেই তাপ এত তীব্র হয যে দুর্বল শবীব তা সহ্য কবতে পাবে না, ধাবণ কবতে পাবে না। ফলে সেই দুর্বল ব্যক্তি পাগল হযে যেতে পাবে।

সাধাবণত বলা হযে থাকে, সহস্রাব চক্রেব ওপব ধ্যান কব, মনকে সেখানে একাগ্র কব। কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে বাখতে হবে যে ঠিক কোন অবস্থায ঐ কেন্দ্রেব ওপব ধ্যান কবা উচিত হবে। যদি আমবা আগে আজ্ঞাচক্রেব সাধনা সম্পূর্ণ না কবি, আজ্ঞাচক্রেব ওপব ধ্যানকে কেন্দ্রিত কবাব ক্ষমতা বিকশিত না কবি, অথচ সোজা সহস্রাব চক্রেব ওপব ধ্যান কবাব চেষ্টা কবতে থাকি, তবে অনর্থ ঘটতে পাবে। সেক্ষেত্রে লাভেব বদলে লোকসানই হতে পাবে। সহস্রাব চক্রে ধ্যান কবাব এই যে প্রযত্ন, তা সার্থক হবে না, কাবণ সেখানকাব তীব্র তাপ সহ্য কবাব ক্ষমতা আমাদেব শবীবে গডে ওঠেনি। অনেক ধ্যান-সাধক পাগল হযে যান। সেটা কিন্তু ধ্যানেব দোষ নয, সাধকেবই দোষ। কাবণ সাধক জানে না, কখন কোন অবস্থায কোন স্থানে ধ্যান কবা উচিত, আগে কোন শক্তিব বিকাশ কবা দবকাব এবং পবেই বা কোন শক্তিব কবা উচিত। যেখানে এই জ্ঞান থাকে না সেখানে উত্তেজনা বাডে, উত্তাপ বাডে এবং ফলে লাভেব বদলে লোকসানই হয।

আমাদেব একথা বুঝতে হবে যে, শবীবেব বিভিন্ন শক্তিব বিকাশেব একটা নির্দিষ্ট ক্রম আছে। শবীব সাধনা কবতে হলে ঐ শক্তিগুলিব ক্রমিক বিকাশ কবতে হবে। শবীব সাধনাব প্রথম ধাপই হল, ঠিকমত বসতে শেখা। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয। এই আধাবেব ওপবেই

আসনের বিকাশ ঘটেছে। বসার হাজার হাজার প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে, কেবল দুই-এক প্রকার নয়। বসা একটা সামান্য কাজ বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে এত মনোযোগ দেওয়ার কারণ কি? বসার এত প্রকারভেদের সার্থকতা কি? আসনের বিশেষ বিকাশের প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ করার আবশ্যকতা কি?

বসা সামান্য কাজ, মানুষ যেমনভাবে চায় তেমনভাবে বসতে পারে। কিন্তু যখন শরীরের সাধনা করা হয় এবং শরীরের মধ্যে বিশিষ্ট শক্তির অবতরণ সম্ভব করার জন্য প্রযত্ন করা হয়, তখন বসার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে। কিভাবে বসতে হবে তা বুঝতে হবে।

এমনভাবে সোজা হয়ে বস, যাতে মেরুদণ্ডের হাড় যেন সোজা অবস্থাতেই থাকে এবং গ্রীবাদেশও যেন সোজা থাকে। পিছনের সম্পূর্ণ অংশ অর্থাৎ সুষুম্নার অগ্রভাগ থেকে মূলাধার পর্যন্ত সমস্ত অংশই, যেন সোজা থাকে। এভাবে বসার সাধনা করতে হয়। সাধারণত মানুষ সোজা হয়ে বসে না, হয় সামনের দিকে ঝুঁকে বসে, নয় পেছনের দিকে ঝুঁকে বসে, আবার কখন পাশে হেলে বসে। কোন ক্ষেত্রেই সে ঠিক সোজা হয়ে বসে না। সাধনার দিক থেকে সোজা হয়ে বসার খুবই প্রয়োজন আছে। সোজা হয়ে বসার উদ্দেশ্য হল, আমার প্রাণধারার পথে যেন কোন বাধা বা অবরোধ সৃষ্ট না হয়। প্রাণধারার সর্বাধিক প্রবাহ চলে পৃষ্ঠরজ্জুস্থ সুষুম্না নাড়ির ভেতর দিয়ে। মেরুদণ্ডের হাড় অনেকটা ফাঁপা। ওর ভেতরে সুষুম্না নালী আছে। ওটা মধ্য নালী, ওর ভেতর দিয়ে প্রাণের প্রবাহ চলে। যদি বাঁকা হয়ে বসি, প্রাণের প্রবাহে বাধা উৎপন্ন হয়। আমি শক্ত হয়ে বসলে বা এপাশে-ওপাশে হেলে বসলেও প্রাণপ্রবাহের বাধা হয়। ঠিক সোজা হয়ে বসলে এই বাধা উৎপন্ন হয় না। সেজন্য বলা হয় যে, সোজা হয়ে বস। মেরুদণ্ডের হাড়ের বা সুষুম্না নালীর গুরুত্ব কেবল সাধনার দৃষ্টিতেই নয়, স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতেও এদের বিশেষ মূল্য আছে। আয়ুর্বেদের আচার্যরা লিখে গিয়েছেন, ভোজন করতে সোজা হয়ে বস, বেঁকে বস না। কথা বলার সময়ে বাঁকা

হয়ে বস না, হাঁটবার সময় বাঁকা হবে না। শরীরের যে কাজই কর, লক্ষ্য রেখ, মেরুদণ্ড যেন সোজা থাকে, যেন না বাঁকে।

সুষুম্নার সুস্থতাই আমাদের স্বাস্থ্যের মূল আধার। মেরুদণ্ডের হাড় যদি সুস্থ থাকে ও সঠিক অবস্থায় থাকে, তবে আমাদের সম্পূর্ণ সুস্থ থাকার বিষয়ে কোন গোলযোগ হবে না। আর তা যদি সুস্থ না থাকে, তবে তার প্রভাব সমস্ত শরীরের ওপরই বর্তাবে। এখন চিকিৎসাজগতে এই তথ্য স্বীকৃত হয়েছে যে, মেরুদণ্ডের হাড়ের বিকৃতির কারণেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এজন্য কোন ব্যাধিরই আলাদাভাবে চিকিৎসা করার দরকার হয় না, কেবল মেরুদণ্ডের হাড়ের চিকিৎসা করলেই সেই ব্যাধির উপশম হয়। এটা চিকিৎসার এক পদ্ধতি।

আমার হাঁটুতে ব্যথা হওয়ায় একজন চিকিৎসক দেখাই। তিনি 'আকুপাংচার' পদ্ধতিতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি বললেন— 'মেরুদণ্ডের হাড়ে কিছু গোলযোগ ঘটেছে, তাই হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে।' এ কেমন সম্বন্ধ। ব্যথা হয়েছে হাঁটুতে, আর সম্বন্ধ মেরুদণ্ডের হাড়ের সঙ্গে। পেটের ব্যথা, মাথার ব্যথা, কোমরের ব্যথা, শরীরের যে কোন স্থানের ব্যথা, সব কিছুরই কারণ মেরুদণ্ডের হাড়ের কোন না কোন গোলযোগ। তার চিকিৎসা করলেই ব্যথা সেরে যাবে, শরীর নিরাময় হবে। মেরুদণ্ডের হাড় আমাদের শরীরের ও স্বাস্থ্যের মূল কেন্দ্র। সাধনার দৃষ্টিতেও তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে সাধক সুষুম্নাকে ঠিকমত বুঝতে সমর্থ হয়েছেন তিনি সাধনার শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করার যোগ্যতা লাভ করেছেন। আর যিনি সুষুম্নাকে ঠিকমত বুঝতে পারেননি তিনি সাধনা করতে চেষ্টা করলেও তাঁর সে চেষ্টা সফল হবে না।

আমাদের শরীরে অনেক চৈতন্য-কেন্দ্র আছে, যেখানে চৈতন্য বিকশিত হয়, প্রকট হয়। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমেই বিশেষ বিশেষ শক্তির অবতরণ হয়। এই সব কেন্দ্রের সাধনা করতে হবে। বিকশিত করতে হবে। যতদিন আমরা সেগুলিকে বিকশিত করতে না পারি ততদিন প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন উপযোগিতা হবে না। এই

প্রসঙ্গে এক গল্প বলছি, যাতে আলোচ্য তথ্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে।

এক ভাই তার বোনের বাড়ি গিয়েছে। আহারের সময় হয়েছে। না জানি বোনের মনে কোন্ ভাবের উদয় হল—সে এক থালা গম এনে ভাইয়ের সামনে রেখে দিল। ভাই তো আর প্রাকৃতিক চিকিৎসা করাচ্ছিল না যে কাঁচা গমই খাবে। বোনের দেওয়া গমের থালা দেখে ভাই বলল—'বোন। এ কি? এ কি করে খাওয়া যায়?' বোন বলল—'কেন,আমি তো মূল বস্তুই খেতে দিয়েছি। সব খাদ্যই তো গম থকে তৈরি হয়, তাই ওটাই মূল খাদ্য। আমি ভাবলাম, ভাই আমার ঘরে এসেছে, তাকে মূল বস্তুই খাওয়াব।' ভাই সে কথা শুনল, তারপর না খেয়ে উঠে পড়ল। বেচারা খাবেই বা কি?

এরপর কয়েক মাস গেল। ভাইয়ের কাছে বোনের মেয়ের বিয়ের সংবাদ এল। বোনের বাড়িতে ভাই এক পুটলি পাঠাল। ভাইয়ের বাড়ি থেকে কিছু এসেছে দেখে বোন খুশি হল। কিন্তু সে পুটলি খুলে দেখল তার ভিতরে তূলা—কেবল তূলা—আছে। বোন এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারল না। সে আশা করেছিল খুব ভাল কাপড় এসেছে। অথচ এসেছে কেবল তূলা। কিছুদিন পরে ভাই বোনের বাড়ি এল। বোন জিজ্ঞাসা করল—'এ কেমন তামাসা? বিয়েতে তূলার কি দরকার? পাঠাবে কাপড়-চোপড়, আর পাঠালে শুধু তূলা। এ কেমন কাজ?' ভাই বলল—'বোন। আমি তো মূল জিনিসই পাঠিয়েছি। সব রকম কাপড় তো এই তূলা থেকেই তৈরি হয়। আমি ভাবলাম, কাপড়চোপড় কি পাঠাব। বোনের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে, সেখানে কাপড়ের মূল বস্তুই পাঠাই। তাই তূলা পাঠালাম। সব রকম কাপড়ের মূলই হল তূলা।'

সব আহার্য বস্তুই গম থেকে প্রস্তুত হয় আর সব কাপড়ই তূলা থেকে তৈরি হয়। একথা ঠিকই বটে, কিন্তু এর দ্বারা পুরো বিষয় বলা হয় না, তার একদিক মাত্র বলা হয়। আমিও স্বীকার করি যে, গম থেকেই সব ভোগ্য দ্রব্য তৈরি হয় আর তূলা থেকেই সব কাপড় তৈরি হয়। কিন্তু কেবল গম দিয়ে পেট ভরে না আর কেবল তূলা দিয়ে লজ্জা

নিবারণ হয় না বা শৈত্য ও আতপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। গম দিয়ে খাদ্য বানাতে হয়, তবেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। তুলা দিয়ে কাপড় বুনতে হয়, তবেই লজ্জা নিবারণ করা সম্ভব হয়, আর শৈত্য ও আতপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। পেট কেবল তখনই ভরবে যখন গম থেকে রুটি বানিয়ে খাওয়া হবে। শৈত্য ও আতপ থেকে কেবল তখনই ত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে যখন তুলা থেকে কাপড় বুনে নেওয়া হবে।

শরীর মূল বস্তু, শরীর কাঁচা মাল। এর থেকে আমরা যা চাই তাই বানাতে পারি, প্রাপ্ত হতে পারি। এই শরীরের মধ্যে আমাদের সকল প্রকার শক্তির কেন্দ্র, চৈতন্যের কেন্দ্র বিদ্যমান আছে। সেখান থেকে আমরা বর্তমানকে দেখতে পারি, অতীতকে দেখতে পারি এবং ভবিষ্যৎকেও দেখতে পারি। শক্তিবিশেষের অবতরণ হলে আমরা নিজের হাড়কে বজ্রের মত কঠিন করে গড়তে পারি, নিজের বুকের ওপর মোটরগাড়ি বা হাতিকে তুলে নিতে পারি।

এমন অনেক লোক আছে যারা এই প্রকার শক্তি প্রদর্শন করে। তারা বুকের ওপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যেতে দেয়। অথচ তাদের হাড় ভাঙ্গে না, শরীরের সামান্য ক্ষতিও হয় না। এ কি করে সম্ভব হয়? সম্ভব হয় এই কারণে যে, তারা প্রাণকে সাধনার দ্বারা শক্তিশালী করেছে। তাই তাদের শরীরের কিছুই বিকল হয় না। এটাই নিয়ম। কিন্তু কাঁচা মাল দিয়ে, কেবল শরীর দিয়ে, এমন কিছু করা সম্ভব নয়। কাঁচা গম দিয়ে পেট ভরে না, কেবল তুলা দিয়ে শৈত্য ও আতপের প্রতিরোধ হয় না। পেট ভরানোর জন্য, দেহ আচ্ছাদনের জন্য, অন্য অনেক প্রস্তুতির আবশ্যকতা থাকে। এ কথা শরীর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। শরীরের সাধনা করার আবশ্যকতা আছে। তার শক্তি ও চৈতন্যকেন্দ্রগুলিকে বিকশিত করে নেওয়ার আবশ্যকতা আছে। পূর্ণ প্রস্তুতির আবশ্যকতা আছে। তাই সাধনার দৃষ্টিতে শরীরের সাধনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

শরীরের সাধনা করতে হবে। শরীরের প্রত্যেক অবয়বের শক্তি

আব চৈতন্যেব অবতবণ ঘটানোব, অভিব্যক্ত কবানোব যে যে ক্ষমতা আছে, সেই সব ক্ষমতা কেন্দ্রকে আমবা এমন সমর্থ কবে গড়ে তুলব যে প্রবল শক্তিব অবতবণ, বিশাল চৈতন্যেব অভিব্যক্তি সম্ভব হবে, আব আমবা তাব উপযোগ কবতে সক্ষম হব।

শবীব সাধনাব এক উপায় হল—আসন। আপনাবা শুনে থাকবেন ভগবান মহাবীব ষোল দিন ষোল বাত একভাবে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতেন। সোজা দাঁড়িয়ে থাকাও এক প্রকাব আসন। মহাবীব যদি কখন 'উকড়ু' আসনে বসতেন তো সাবাবাত সেই আসনে বসে থাকতেন। এই আসনে পাযেব পাতা মাটিব ওপব থাকে, কিন্তু গোড়ালি থাকে কিছুটা উঁচু। তিনি পাযেব পাতাব ওপব ভব বেখে সাবা বাত সাবা দিন বসে থাকতেন। জৈন, বৌদ্ধ আব বৈদিক পবম্পবায হাজাব হাজাব সাধু ও সন্ন্যাসী হযেছেন। তাঁবা শবীবেব সাধনাব জন্য বিভিন্ন প্রকাব আসনেব সাহায্য নিযেছেন। কোন সাধক এত দীর্ঘ সময একই আসনে বসে থাকেন—একথা অস্বাভাবিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে মনে হতে পাবে। এটা অস্বাভাবিক মনে হতে পাবে বটে, কিন্তু আসলে এটা তা নয। আপনাকে কেউ যদি বলে, সাবা বাত না শুযে 'উকড়ু' আসনে বসে বাত কাটান, তাহলে আপনি নিশ্চয ভাববেন—এ কি? এ তো অস্বাভাবিক কথা। কিন্তু যাঁবা শবীবেব সাধনা কবেছেন তাঁদেব কাছে এ সব প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয, অস্বাভাবিকও নয।

কাযোৎসর্গ কবা অস্বাভাবিক ব্যাপাব বলে মনে হতে পাবে। তর্ক উঠতে পাবে যে, শবীবকে নড়াচড়া কবতে না দিযে কি কবে একভাবে বসে থাকা যেতে পাবে? এ অসম্ভব। আপনাবা জানতে পাবেন যে, ভগবান ঋষভেব পুত্র বাহুবলী বাব মাস ধবে কাযোৎসর্গেব মুদ্রায দাঁড়িযে ছিলেন। এইভাবে পুবো এক বছব গত হযেছিল। তাঁব চাবপাশে ঘাস গজিযে গিযেছিল। লতাপাতা তাঁব শবীবকে ঘিবে ফেলেছিল। পাখিবা তাঁব শবীবেব ওপব বাসা বেঁধেছিল। তিনি স্থিব ও অচঞ্চল ভাবে সোজা দাঁড়িযে ছিলেন। এ কি সম্ভব যে কোন ব্যক্তি এক বছব

ধবে, পুবো বাব মাস ধবে, সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন? কোন বকম নড়াচড়া কবেন নি? অসম্ভবই মনে হয়। সবাই এ বকম কবতে পাবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আপন শক্তিকে জাগ্রত কবাব জন্য, আপন শক্তিকেন্দ্রগুলিকে বিকশিত ও প্রকট কবাব জন্য, শবীবেব সাধনা কবেছেন সে ব্যক্তি ঐরূপ কবতে পাবেন। এমন অবস্থা যে হতে পাবে তা অস্বীকাব কবা যায় না। তবে আমি স্বীকাব কবি যে, এই অবস্থাকে সম্ভব কবে তুলতে যে প্রযত্নেব দবকাব তা আমবা কবতে সমর্থ হই নি।

প্রথম কথাই হল, আসনেব অভ্যাস কবা। আসন বলতে দাঁড়িয়ে থাকা, শোযা, বসা—সবই বোঝায। শবীবেব সাধনাব জন্য আসনেব সাধন খুবই আবশ্যক। আসনেব সাধনাব অর্থ হল, সুপ্ত শক্তি কেন্দ্রগুলিকে জাগ্রত কবা, সক্রিয কবা ও গতিশীল কবা। আসন শবীবসাধনাব একমাত্র অঙ্গ নয, আব এক অঙ্গ হল—শ্বাস।

শ্বাস শবীব থেকে আলাদা কিছু নয, শবীবেবই এক ভাগ। শ্বাসেব সাধনাব অর্থ, শবীবেব সাধনা আব শবীবেব সাধনাব অর্থই শ্বাসেব সাধনা।

দ্বিতীয প্রশ্ন এই যে, শ্বাস কি ভাবে গ্রহণ কবব? হাজাব বকমেব আসন যেমন উদ্ভাবিত হযেছে, তেমনই শক্তি জাগবণেব দিকে লক্ষ্য বেখে শ্বাস নেওযাব হাজাব প্রকাবেব পদ্ধতি উদ্ভাবিত হযেছে। আজ আমি সব বকম পদ্ধতি প্রযোগেব কথা বলব না, তাদেব সামান্য কযটিব প্রযোগেব কথা বলব।

প্রেক্ষা ধ্যানে আমবা দীর্ঘশ্বাস, সমবৃত্তি শ্বাস ও সহজ শ্বাস—এই তিন বকম পদ্ধতি প্রযোগ কবে থাকি। অবশ্য এই তিন প্রকাবই সব নয। শ্বাসেব প্রযোগ অনেক আসনেব সঙ্গেই বিকশিত হযেছে। কোন ব্যক্তি এক ঘণ্টা শ্বাসকে রুদ্ধ কবে বসে থাকতে পাবে। কোন ব্যক্তি এক ঘণ্টা ধবে ভস্ত্রিকা প্রাণাযাম কবতে পাবে। দ্রুত শ্বাস নিযে শবীবকে প্রকম্পিত কবতে পাবে। আবাব কোন ব্যক্তি সূক্ষ্ম শ্বাস দ্বাবা শবীবকে নিস্পন্দ কবে বাখতে পাবে। এ সবই উৎকৃষ্ট প্রক্রিযা। তবে

এগুলির দ্বারা যে বিকাশ হয় তা আত্মিক বিকাশ নয়। এই বিকাশের জন্য প্রযত্ন করার পেছনে এই দৃষ্টি থাকে যে, এর দ্বারা শক্তিকেন্দ্রগুলিকে মজবুত ও দৃঢ় করে গড়া যাবে। কোন লৌহকার বা স্বর্ণকার হাপরের সামনে লোহা বা সোনা রেখে তাকে আগুনে তাপ দেয়। তারা এ কাজ বৃথা করে না। তাদের উদ্দেশ্য, তারা তাপদিয়ে লোহা বা সোনাকে এমন নরম অবস্থায় আনবে যে তারা তাদের ইচ্ছামত আকার ঐ লোহা বা সোনাকে দিতে পারবে। সোনাকে এই উদ্দেশ্যে গালিয়ে ফেলা হয় যে, যে আকারে ইচ্ছা সেই আকারে তা গড়ে নেওয়া যাবে। তেমনই প্রাণায়াম হল, শ্বাসের উত্তাপে শক্তিকেন্দ্রগুলিকে ঢেলে দেওয়ার এক প্রক্রিয়া। এমন বহু প্রক্রিয়া আছে যাতে আমরা শক্তিকেন্দ্রগুলিকে এত উত্তমরূপে বিকশিত করতে পারি যে তাদের মধ্যে অতি উচ্চস্তরের শক্তির অবতরণ ঘটা সম্ভব হতে পারে। আমাদের সমস্ত স্নায়ু-সংস্থান. নাড়ী-সংস্থান প্রভৃতি, যা শক্তিকে ধারণের ক্ষেত্রে কাজ করে, তা সবই এই প্রক্রিয়ার দ্বারা বিকশিত ও শক্তিশালী হয়।

তৃতীয় প্রশ্ন হল, শরীরস্থ চক্রগুলির বিকাশ। এই চক্রগুলি হল জ্ঞানকেন্দ্র, শক্তিকেন্দ্র। শরীর বিজ্ঞানে যাকে বলা হয় গ্রন্থি, যোগের ভাষায় তাকে বলা হয় চক্র।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, আমাদের মস্তিষ্কের পশ্চাৎ অংশে দুটি গ্রন্থি আছে। এরা খুবই ছোট এবং পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এই দুটি গ্রন্থির মধ্যে বিশেষ একটিকে বিকশিত করার ফল হবে এই যে. সেটি বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মন আনন্দে ভরে যাবে। আপনার সংবেদন নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু ঘটুক না কেন, আপনার মনে কোন সংবেদন হবে না, কোন পীড়া বা ব্যথা হবে না। এক অখণ্ড আনন্দ নিরন্তর বর্তমান থাকবে।

কিন্তু এই গ্রন্থির সঙ্গে জড়িত অপর গ্রন্থিটি যদি জাগ্রত হয়ে যায়, বিকশিত হয়ে যায়, তবে আপনার মন সর্বদা দুঃখে ভরা থাকবে, আর সে দুঃখের শেষ কখনও হবে না। ভাল-মন্দ যাই ঘটুক, দুঃখ নিরন্তর

বর্তমান থাকবে। দুঃখের পার আপনি পাবেন না।

দুটি গ্রন্থি জড়িত হয়েই আছে, অথচ তাদের একটি আনন্দের, অন্যটি দুঃখের। একটি বিকশিত হলে আনন্দের সাগরে হিল্লোল ওঠে, অন্যটি বিকশিত হলে দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। গ্রন্থিদুটি এমনভাবে জড়িত যে তাদের বিশেষ একটিকে জাগ্রত করার প্রক্রিয়ায় বিপদ এই যে, আনন্দের গ্রন্থিকে জাগ্রত করতে গিয়ে সামান্য ভুলের ফলে দুঃখের গ্রন্থির জাগরণ ঘটলে সাধক দুঃখের কূপে নিপতিত হবেন। আনন্দের গ্রন্থিকে জাগাতে গিয়ে দুঃখের গ্রন্থিকে জাগিয়ে তোলা যে কত বড় বিপদ, তা কল্পনা করাও কঠিন।

সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, শক্তি—এ সবই কেবল আমাদের গ্রন্থি, জ্ঞানতন্তু আর শরীর তন্তুসমূহের আধারেই প্রকট হতে পারে। এগুলি সারা শরীরে বিস্তৃত। এমন অবস্থায় আমরা কি করে শরীরকে উপেক্ষা করতে পারি? শরীরকে তৈরি না করে আমরা কেবল ভাবনার বলে আগে এগোতে পারব না। এটা খুবই আবশ্যক যে, আমরা যেমন ভাবনাকে শুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করি, তেমনই যেন শরীরের শক্তিকে বিকশিত করার জন্য প্রযত্ন করি। শরীরে যে সব সুপ্ত জ্ঞানতন্তু আছে, জ্ঞানতন্তুর গুচ্ছ আছে—সেগুলিকে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। যতদিন সেগুলি প্রস্ফুটিত না হবে ও তাদের বিশিষ্ট শক্তিকে ধারণ করার ক্ষমতা বিকশিত না হবে, ততদিন বিশিষ্ট শক্তির ও আনন্দের অবতরণের জন্য চেষ্টা করলেও তা সফল হবে না। শরীর বিজ্ঞান বলে যে, আমাদের গ্রন্থিগুলির স্রাব ও হর্মোন উপযুক্ত মাত্রায় নির্গত না হলে কোন বিশেষ প্রক্রিয়াই কার্যকর হয় না। স্বাস্থ্যের দিকে থেকেও ওই এক কথা, যতক্ষণ কোন বিশেষ হর্মোনের অভাব থাকবে ততক্ষণ শরীর ঠিক চলবে না।

'থাইরয়েড' একটি গ্রন্থি। যদি ঐ গ্রন্থির স্রাব ঠিক না হয়, উপযুক্ত মাত্রায় না হয়, তবে আপনার মন হতাশায় ভরে যাবে, আর হীন ভাবনা আপনার মনে উদয় হবে। এমন ক্ষেত্রে শরীর যদি শিশুর হয়

তবে তাব বিকাশ বন্ধ হযে যাবে, শবীবেব বাড ও হ্রাস প্রভৃতিব মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপাব এই গ্রন্থিব স্রাবেব ওপব নির্ভব কবে। কেউ খিটখিটে স্বভাবেব হয, কাবও স্বভাব হয প্রসন্ন। এটা আপনি কেবল ব্যক্তিগত কর্মফল বলে মনে কববেন না। কর্মেব ফল হতে পাবে বটে, কিন্তু কর্মেব ফল কোন মাধ্যমে প্রকট হবে, সে সম্বন্ধেও আপনাকে চিন্তা কবতে হবে। আমাদেব সবচেযে বড ভুল এই যে, আমবা মেনে নিযেছি প্রত্যেক কার্য ক্রিযা বা কর্মেব আধাবেব ওপবই ঘটে বা ভাবনাব আধাবেব ওপবই ঘটে। অথবা অন্য কোন নিমিত্ত আমবা মেনে নিযেছি। কিন্তু একথা আমবা ভুলে গিযেছি যে, এব পেছনে শবীবেবও হাত আছে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যোগ আছে। আমবা তো শবীবকে উপেক্ষা কবে বসে আছি। আব শবীবকে উপেক্ষা কবাই আমবা বৈবাগ্য বলে মনে কবেছি। একেই আমবা শবীবেব প্রতি বিবক্তি বলে বুঝেছি। আমবা মনে কবেছি, শবীবে এমন কি পদার্থ আছে যে তাব প্রতি আমবা মনোযোগ দেব। শবীবেব প্রতি মনোযোগ দেওযাব কোন আবকশ্যতাই নেই।

এই দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ ভুল। আমাদেব চিন্তা-ভাবনাব সাথে, আমাদেব প্রসন্নতাব সাথে, আমাদেব শক্তিব বিকাশেব সাথে শবীবেব নিবিড সম্বন্ধ আছে, এ কথা কখনও ভুললে চলবে না। আমবা এখন যদি সাধনাব চর্চা কবতে ও বিশেষ প্রকাব শক্তিকে নিজেব মধ্যে অভিব্যক্ত কবতে চাই, তবে সবাব আগে মনোযোগ দিযে এই কথা ভাবতে হবে আমবা কতটা শবীবেব সাধনা কবেছি, শবীবকে আমবা কতদূব উপযুক্ত কবে নিযেছি। কোন চিত্রকবই উপযুক্ত ভিত্তি ছাডা চিত্র নির্মাণ কবতে পাবে না। সুন্দব চিত্র অঙ্কিত হবে অথচ ভিত্তিতে আছে গোমযেব লেপ, সেক্ষেত্রে সুন্দব চিত্র অঙ্কিত হবে কি কবে? সুন্দব চিত্রেব জন্য উপযুক্ত উপকবণ ও উপযুক্ত অবস্থা চাই। এগুলি যদি মেলে তবেই সুন্দব চিত্র নির্মাণ কবা সম্ভব হয।

অনুরূপ ভাবে বলতে হয, আমবা যেন মূল বস্তুকে না ভুলি। শবীবেব সাধনা কবতে হবে, তাব বিশিষ্ট কেন্দ্রগুলিকে জানতে হবে,

বিকশিত করতে হবে এবং সেগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে। এ সবই অত্যন্ত জরুরী কাজ।

মনোবিজ্ঞানে একটি শব্দ প্রচলিত আছে—মনোদৈহিক। এর অর্থ, শরীরও মনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। আমরা শরীর ও মনকে সব রকমে পৃথক করতে পারি না। কারণ বাস্তবিকপক্ষে মন শরীরের এক অংশ। শরীরের সমস্ত ক্রিয়া মস্তিষ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আবার মস্তিষ্ক শরীরেরই এক অংশ।

শরীরের তিনটি প্রধান ভাগ—মস্তিষ্ক, ধড় ও পা। মস্তিষ্ক শরীরের মুখ্য ভাগ। মন শরীরের এক ভাগ, বচন শরীরের এক ভাগ আর শ্বাসও শরীরের এক ভাগ। এ সমস্তই শরীরের মাধ্যমে প্রকট হয়। সিদ্ধান্তের ভাষায় এমন বলা যায় যে, মনের জন্য অণু গ্রহণ শরীরই করে, বচনের জন্য অণু গ্রহণ শরীরই করে এবং শ্বাসের জন্য অণু গ্রহণও শরীরই করে। ওদের জন্য যে কাঁচামাল দরকার হয় তা সবই শরীর যোগান দেয়। বাকি সব কিছু পরে তৈরি হয়।

মন কাকে বলা হয়? মনের গঠনযোগ্য যে সব অণু শরীর গ্রহণ করে, সে সব অণু ত্যাগের ক্রিয়ার নামই মন।

বচন কাকে বলা হয়? বচনের গঠনযোগ্য যে সব অণু শরীর গ্রহণ করে, সে সব অণু ত্যাগের ক্রিয়ার নামই বচন।

শ্বাস কাকে বলা হয়? শ্বাসের গঠনযোগ্য যে সব অণু শরীর গ্রহণ করে, সে সব অণু ত্যাগের ক্রিয়ার নামই শ্বাস।

এই ভাবে দেখা যায়, শরীরই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কেন্দ্র। শরীর সম্বন্ধে দুটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমটি হল, শক্তির বৃথা ব্যয় আমাদের বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়টি হল, আমাদের প্রাণশক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

আমরা জেনে অথবা না জেনে বহু শক্তি ব্যয় করে বসি। শক্তির ব্যয় শরীর করে, মস্তিষ্ক করে, স্বচালিত নাড়ী-সংস্থানও করে। এই তিনটির দ্বারাই শক্তি ব্যয়িত হয়।

সাধনার ক্ষেত্রে কায়োৎসর্গের গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। কায়োৎসর্গ করার বিধান বার বার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল, শক্তির যে অযথা ব্যয় হচ্ছে তা বন্ধ করা। বলা হয়েছে, মৌন অবলম্বন কর। কেন? এই জন্য যে, কথা বলার দ্বারা যে শক্তি খরচ হয় তা বাঁচান যায়। বলা হয়েছে, মনকে কেন্দ্রিত কর, চঞ্চলতা স্তব্ধ কর। কেন? এই জন্য যে, মস্তিষ্কের যে শক্তি অনর্থক খরচ হয় তা বাঁচান যায়।

এ সবই উৎকৃষ্ট ক্রিয়া। কারণ এদের দ্বারা শরীরের শক্তিকে রক্ষা করা যায় এবং শক্তির বৃথা অপচয় বন্ধ করে তা প্রকৃত উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যায়। যে শক্তির বৃথা ব্যয় হচ্ছে তা বন্ধ করে শক্তির ভাণ্ডার সুরক্ষিত রাখা যায়, আর বিশিষ্ট চেতনার অবতরণের জন্য শক্তির উপযোগ করা যায়।

দ্বিতীয় কথা হল, শক্তির সঞ্চয়—প্রাণশক্তির সঞ্চয়। প্রাণধারা আমাদের শক্তির সবচেয়ে বড় স্রোত। প্রাণধারার দ্বারাই শক্তির প্রাপ্তি হয়। আমাদের শক্তির কেন্দ্র হল মূলাধার চক্র, আর সেখানে অবস্থিত ব্রহ্মগ্রন্থি। সেখানে প্রাণ উৎপন্ন হয়। মূলাধারের তাপেই প্রাণের উৎপত্তি। নাভিচক্র থেকে স্বাধিষ্ঠান চক্রের নিচ পর্যন্ত দেহের যে ভাগ, সেখানকার তাপে প্রাণতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই প্রাণই আমাদের জীবনী-শক্তি আর প্রাণশক্তি। তা আমাদের জীবনকে সঞ্চালিত করে। এই শক্তিকে উৎপন্ন করা যায়।

এক প্রয়োগের কথা আমি আপনাদের বলছি। আমি নিজে অনেকবার এই প্রয়োগ করে দেখেছি। চলতে চলতে যখন শ্রান্ত হয়ে পড়েছি এবং বোধ করেছি সমস্ত শরীর যেন শিথিল হয়ে গিয়েছে, পা যেন আর চলছে না, তখন এই প্রয়োগ করেছি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ফল পেয়েছি। মনে হয়েছে শরীরে নতুন বল এসেছে, আর সব শ্রান্তি মিটে গিয়েছে। বসে থাকতে থাকতে যখন শিথিলতা অনুভব করেছি তখন দশ-বিশ বার এই প্রয়োগের পুনরাবৃত্তি করেছি, আর

তৎক্ষণাৎ শিথিলতা মিটে গিয়েছে, সঞ্জীবতার অনুভূতি এসেছে। এটা প্রাণশক্তিকে উৎপন্ন করার প্রয়োগ। এই প্রয়োগ হল—মূলবন্ধ মুদ্রা। আপনি আপনার গুহ্যদেশকে সঙ্কুচিত করুন। দশ-বিশ মিনিট ঐ মুদ্রায় অবস্থান করুন। আপনার তখন মনে হবে, নতুন শক্তির সঞ্চার হতে আরম্ভ হয়েছে, নতুন সামর্থ্য আসছে। কারণ, প্রাণ উৎপন্ন হওয়ার যে কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্রের ওপর আপনি সংযম করেছেন, তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাকে 'জেনারেটর' বানিয়েছেন। এই হল শক্তির সঞ্চয়।

শক্তি উৎপন্ন করতে বাইরের কিছুর সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। সূর্য প্রাণশক্তির, জীবনীশক্তির সবচেয়ে বড় কেন্দ্র, সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার এবং অক্ষয় ভাণ্ডার। আমরা সূর্যের সাহায্যে প্রাণশক্তিকে আকর্ষণ করতে পারি। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা সঙ্কল্প করব—প্রাণশক্তির সংগ্রহ হচ্ছে, সঞ্চয় হচ্ছে, মস্তিষ্কমার্গে প্রাণশক্তির অবতরণ হচ্ছে। দশ-বিশ মিনিট মনে মনে এই সঙ্কল্পকে আলোড়ন করে আমরা ধ্যানস্থ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে থাকব। তখন আমাদের মনে হবে যে, নতুন শক্তির ও স্ফূর্তির সঞ্চার শুরু হয়েছে।

আমি শরীর-সাধনার বিষয় ও উপায় সম্বন্ধে কিছু রেখাপাত করলাম। এটি দিগদর্শন মাত্র। তবে যদি আমরা এ সব কথা ঠিকমত বুঝতে পারি তো শরীরকে আমরা এমনভাবে তৈরি করতে পারব যে, আমরাই অতি বৃহৎ শক্তিকে শরীরে অবতরণ করার জন্য, প্রকট ও অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান করতে সমর্থ হব।

৩

শরীর সাধনা

ধ্যানের সঙ্গে ধ্যেয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ধ্যেয় অনেক প্রকারের, ধ্যানও অনেক। সকলের পক্ষে একই ধ্যেয় অনুকূল হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন ধ্যেয় অনুকূল হতে পারে। একের পক্ষে যা অনুকূল তা অপরের পক্ষে অনুকূল নাও হতে পারে। সহজ শ্বাসের ওপর ধ্যান করা কারও পক্ষে সরল ও অনুকূল হয়। কেউ আবার সহজ শ্বাসকে ধরতে পারে না, অথচ অনুলোম ও বিলোমকে সহজেই ধরতে পারে এবং তার ওপরেই তার মন জমে যায়। কেউ আবার দীর্ঘ শ্বাসকে অনায়াসে ধরতে পারে। অতি সম্প্রতি এক সাধক বলেছেন যে, সমবৃত্তি শ্বাসের ওপর ধ্যান কেন্দ্রিত হয়। কিন্তু সহজ শ্বাসকে আয়ত্ত করা যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এটা আবশ্যক নয় যে, সব সাধকের পক্ষে ধ্যেয় একই প্রকার হবে। কারণ, মানুষ যন্ত্র নয় বা যান্ত্রিকও নয়। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা আছে, ভিন্ন ভিন্ন রুচি আছে। তাই সকলের ধ্যেয় যে একই হবে এমন মনে করা উচিত নয়। যেমন প্রেক্ষা ধ্যেয়, তেমনি অনুপ্রেক্ষাও ধ্যেয়। আজ আমি কেবল শব্দাত্মক ধ্যানের আলোচনা করব। এই ধ্যানকে পদস্থ ধ্যানও বলা হয়।

চার প্রকার ধ্যানের কথা বলা হয়েছে—পিণ্ডস্থ, পদস্থ, রূপস্থ আর রূপাতীত। এদের মধ্যে দ্বিতীয় ধ্যান হল—পদস্থ। এটি শব্দ-ধ্যান, শব্দের সাধনা। কথা না বলা, মৌন থাকা এক ব্যাপার, আর কথা বলা আর এক ব্যাপার। আমরা কেবল মৌন থাকব, কথা বলব না, এ সম্ভব নয়, আবার কেবল কথা বলেই যাব, এও সম্ভব নয়। জীবনে বলা ও না বলার সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার। না বলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আগে আমি বলতে চাই যে, আমাদের শব্দ-সাধনা করতে হবে। আমাদের শব্দের মহত্ত্ব বুঝতে হবে, তৎসংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়াও জানতে হবে। এর অর্থ হল, পদস্থ ধ্যান করা বা পদকে ধ্যেয় করা এবং তার আধারেই চিত্তের একাগ্রতাকে স্থাপিত করা।

পদের বিশেষ মহত্ত্ব আছে। আমরা যখন কোন পদ উচ্চারণ করি তখন কেবল পদই নির্গত হয় না বা কেবল শব্দ নির্গত হয় না, সেই সঙ্গে আমাদের ভাবনা, আমাদের সঙ্কল্প, আমাদের মনের শক্তিও বাইরে আসে, আর সব কিছুর সঙ্গে শ্বাসেরও যোগ হয়। শরীর, শ্বাস, বায়ু, ধ্বনি, সঙ্কল্প-শক্তি, মানসিক শক্তি—এই সব কিছুর যখন যোগ হয় তখন কোন শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। কোন ব্যক্তি যখন কথা বলে তখন সেই বলার পেছনে কেবল শব্দই থাকে না, বিশিষ্ট প্রকারের শক্তিও থাকে, আর বক্তার নিশ্চয় অনুসারে সেই শক্তি প্রকট হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবেরা অমরকংকায় গেলেন। সেখানকার রাজা পদ্মনাভ দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিলেন। পদ্মনাভ সংবাদ পেয়ে নিজের সেনাকে সজ্জিত করে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের বললেন—'যাও, যুদ্ধ কর।' পাণ্ডবরা যুদ্ধ করতে গেলেন। তাঁরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী ছিলেন। পদ্মনাভ সামনে এলেন। পাণ্ডবরা বললেন—'আজ এমন ভীষণ যুদ্ধ হবে যে সে যুদ্ধে হয় আমরা থাকব আর না হয় পদ্মনাভ থাকবে। দু পক্ষের এক পক্ষ মাত্র থাকবে।' এই কথায় মনের যে সঙ্কল্প ছিল, ভাবনা ছিল, তা প্রকট হয়ে গেল। যুদ্ধ হল। পরিস্থিতি এমন হল যে, পদ্মনাভ স্থির থাকলেন

আব পাণ্ডবদেব পলাযন কবতে হল। এব কাবণ, পাণ্ডবদেব সঙ্কল্প শিথিল ছিল। তাঁদেব সঙ্কল্প সূত্র ছিল—'অম্হে বা পউমনাভে বা' হয আমবা থাকব, নয পদ্মনাভ থাকবে। পদ্মনাভ থাকলেন, আব 'তাঁবা পালিযে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সব দেখলেন। তিনি এগিযে এসে বললেন, 'সঙ্কল্পেব ভাষা আমি বলছি। 'অম্হে, ন পউমনাভে'—আমবা থাকব, পদ্মনাভ থাকবে না। আবাব যুদ্ধ হল। পদ্মনাভ যুদ্ধ হেবে পালিযে গেলেন।

আমাদেব মুখ থেকে কেবল শব্দ নির্গত হয না, তাব সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব অন্তঃকবণেব শক্তি, সঙ্কল্পেব শক্তিও নির্গত হয। আমাদেব যেমন নিশ্চয, যেমন ভাবনা, আব ঐ নিশ্চয ও ভাবনাব যেমন বল—তা সবই শব্দেব সঙ্গে প্রকট হয। আমবা শব্দেব শক্তিকে বুঝতে পাবছি, আব এও জানতে পাবছি যে শব্দেব সঙ্গে আবও কিছু জড়িত থাকে।

আমবা অর্হমেব ধ্বনি কবি, অর্হম্ উচ্চারণ কবি। প্রেক্ষাধ্যান আবম্ভ হয অর্হম্ ধ্বনিব দ্বাবা। প্রত্যেক কাজ আবম্ভ হয অর্হম ধ্বনি দিযে। কিন্তু কেন? আমবা যখন ধ্যান করতে বসেছি, তবে ধ্বনি কেন? ধ্যানে তো মৌন থাকাই উচিত, কিন্তু অর্হম্ ধ্বনি কেন? অনুপ্রেক্ষা কেন? শব্দেব প্রযোগ কেন?

আমবা শব্দ প্রযোগ ছাড়তে পাবি না। শব্দেব শক্তি অতি বিপুল। মন্ত্রেব শক্তিব সঙ্গে লোকে পবিচিত। সেটি কোন্ শক্তি? ও তো শব্দেবই শক্তি। ঐ শক্তি আজ বিজ্ঞানে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে, বিশ্লেষিত হচ্ছে। আমাদেব শবীবেব দুটি মুখ্য ভাগ আছে—একটি মস্তিষ্ক, আব অপবটি শবীবেব বাকি সমস্ত অংশ। এই দুই ভাগেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। শবীবেব মধ্যে বক্তেব গতি আছে, সংক্রমণ আছে। প্রত্যেক ধমনীব ভেতবে, প্রত্যেক স্নাযুব ভেতবে বক্তেব প্রবাহ চলছে। হৃৎপিণ্ড নিজের কাজ কবছে, যকৃৎ নিজেব কাজ কবছে, পাচন-তন্ত্রও নিজেব কাজ করে চলেছে। প্রত্যেক অবযবই আপন আপন কাজে ব্যাপৃত আছে। ফলে সংঘর্ষণ সৃষ্ট হচ্ছে, আব সংঘর্ষণ থেকে বিদ্যুৎ

উৎপন্ন হচ্ছে। একে 'ঘার্ষণিক' বিদ্যুৎ বলা যায, কাবণ সংঘর্ষণ থেকে তা সঞ্জাত হয। আব এক প্রকাব বিদ্যুৎ আমাদেব মস্তিষ্কে উৎপন্ন হয, একে 'ধাবাবাহিক' বিদ্যুৎ বলা যায। এ বিদ্যুৎ নিবন্তব উৎপন্ন হযেই চলেছে। আমাদেব শবীবে এই দুই প্রকাব বিদ্যুৎ আছে—ঘার্ষণিক বিদ্যুৎ আব ধাবাবাহিক বিদ্যুৎ। দুটিতেই বিপুল শক্তি আছে। বাযু দেহেব মধ্যে প্রবেশ কবছে, তাব ধাক্কায শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে। শব্দেব সঙ্গে দুই প্রকাব বিদ্যুৎ যুক্ত হয। শবীবেব, ঘর্ষণজাত বিদ্যুৎ ও মস্তিষ্কেব চুম্বকীয বা ধাবাবাহিক বিদ্যুৎ—উভযই শব্দেব সঙ্গে যুক্ত হয। ফলে শব্দ শক্তিশালী হয, শব্দকে কেন্দ্র কবে শক্তি উৎপন্ন হয।

আমবা যখন কথা বলি, তখন শব্দেব সঙ্গে বিদ্যুৎ নির্গত হয। এক ব্যক্তিব কথা অপব ব্যক্তিব ওপব প্রভাব বিস্তাব কবে। তাব কাবণ, শব্দেব সঙ্গে যে বিদ্যুৎ নির্গত হয সেই বিদ্যুৎ প্রভাবশালী। আমাদেব শবীবে বিদ্যুৎ নির্গমনেব কযেকটি প্রধান স্থান আছে, যথা— হাতেব আঙুল, পাযেব আঙুল, চোখ আব ধ্বনি। এই সব স্থান দিযে শবীবেব বিদ্যুৎ বহির্গমন কবে। শব্দেব সঙ্গে বিদ্যুতেব সংযোগ হয়, আব ঐ সংযোগ শব্দকে শক্তিশালী কবে তোলে। ফলে শব্দ প্রভাব উৎপাদন কবে। শব্দেব তবঙ্গ, প্রকম্পন বাইবে নির্গত হযে শক্তি উৎপন্ন কবে।

সাধাবণ ভাষায এই যা বলছি তাব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দেওযা যায। আমি যেভাবে কথা বলছি সেভাবে যদি বাব বছব নিবন্তব বলতে থাকি তবে যে পবিমাণ বিদ্যুৎ নির্গত হবে তা দিযে একবাব দাড়ি কামানোব উপযুক্ত জল গবম কবে নেওযা যাবে। এই পবিমাণ অবশ্য খুবই সামান্য, কিন্তু যখন মুখ-নিঃসৃত শব্দেব সঙ্গে সঙ্কল্পেব শক্তি যুক্ত হয তখন তাতে তীব্রতা আসে, আব তাব গতিও হয তীব্র। সঙ্কল্প শব্দকে এতই তীব্র গতিসম্পন্ন কবে যে, শব্দ এক সেকেণ্ডে এক কোটি মাইল পথ অতিক্রম কবতে পাবে। আলোব গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লাখ ছিযাশি হাজাব মাইল। কিন্তু সঙ্কল্প-শক্তিব সঙ্গে নির্গত শব্দ এমন বিশিষ্ট প্রকাব গতি-সম্পন্ন হয যে, তা এক সেকেণ্ডে এক কোটি মাইল যেতে পাবে।

বর্তমানে এ ব্যাপারে বহু প্রকার অনুসন্ধান চলছে। বিজ্ঞানের অনেক বিকাশ হয়েছে। আজ 'সুপারসোনিক' বিমান আকাশের বুক ভেদ করে উড়ে চলেছে। তার গতি শব্দের গতির চেয়েও অধিক। হীরা কাটার জন্য এমন যন্ত্র নির্মিত হয়েছে, যা এক সেকেণ্ডে বিশ হাজার 'স্ট্রোক' বা আঘাত করতে পারে। ঐ যন্ত্র সূক্ষ্ম ধ্বনির দ্বারা চালিত হয়।

আমাদের পদস্থ ধ্যানের শক্তি বুঝতে হবে। পদ এক মাধ্যম। শব্দ এক মাধ্যম। আমরা অর্হনের জপ করি, অর্হনের ধ্বনি করি। অর্হনের ধ্বনি কেবল শব্দ নয়। ধ্যেয় সর্বদা গুপ্ত থাকে, আমাদের সামনে আসে না। ধ্যেয় যদি প্রকট হয়, ধ্যেয়কে যদি প্রকটিত করা যায়, তবে আর ধ্যানের কোন আবশ্যকতা থাকে না। কারণ ধ্যেয় স্থূল রূপেই আমাদের সামনে বিরাজ করে। সর্বদাই অসিদ্ধকে সিদ্ধ করার প্রয়াস করা হয়। তর্কশাস্ত্রে সাধ্যের লক্ষণ করা হয়েছে—'অসিদ্ধং সাধ্যম্'—যা অসিদ্ধ, তাই সাধ্য। যদি সিদ্ধ বস্তু হয়, তবে তাকে সাধ্য করা চলে না, কারণ সিদ্ধকে সাধন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। সাধ্য সেই বস্তুকেই করা যায় যা সিদ্ধ নয়, যাকে সাধা হয়নি, যার সাধনা করতে হবে। যদি অর্হম্ আমাদের সামনে প্রকট হয়, সিদ্ধ হয়, তবে তাকে ধ্যেয় বলে নেওয়ার কোনই আবশ্যকতা থাকে না। আমরা অর্হমকে ধ্যেয় করেছি এই জন্য যে, তা আমাদের কাছে প্রকট নয়, সিদ্ধ নয়। আমরা তাকে প্রকট করতে, সিদ্ধ করতে, চেষ্টা করি।

আমরা অর্হম্‌কে ধ্যেয় করে নিয়েছি। অর্হম্‌কে ধ্যেয় করার দুটি উপায় আছে— আকার ও শব্দ। আমরা ধ্যেয়র কোন প্রতিকৃতি করি বা মূর্তি বানাই, অর্থাৎ কোন আকারে তাকে গড়ে নিই এবং কল্পনা করি যে, এটিই অর্হম্।

দ্বিতীয় উপায় হল শব্দ। আমরা অর্হম্‌কে ধ্যেয় করি, আর শব্দকে করি ধ্যানের মাধ্যম। আমরা অর্হমকে জপ করি, ধ্বনি করি। আমরা অর্হমের ধ্বনিকে কেবল উচ্চারণ করি না, কিন্তু ঐ উচ্চারণের পেছনে আমাদের যে ধ্যেয় অর্হং গুপ্ত আছেন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি।

শব্দকে মাধ্যম করে, অর্হম্ শব্দ যার প্রতিনিধিত্ব করে, অর্হতের সেই স্থিতি পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে চাই। আমরা সেই স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছতে চাই, যা অর্হম শব্দের বাচ্য। তাই হল অর্হতের স্থিতি।

একটি বাচ্য, অপরটি বাচক। শব্দ বাচক, তার অর্থ বাচ্য। অর্হম্ বাচক, আর তার যা অর্থ তা বাচ্য। অর্হম শব্দের অর্থ হল, অর্হতের স্থিতি। আমরা বাচকের দ্বারা বাচ্য পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। সাধন দ্বারা সাধ্য পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। আমরা শব্দের ধ্বনির সঙ্গে নিজের ভাবনা জুড়ে দিয়ে নিজের ভেতরে অর্হতের যে স্বরূপ লুকায়িত আছে তাকে প্রকট করতে চাই।

অর্হমের এই প্রকৃষ্ট ভাবনা যদি আমাদের বোধগম্য হয় তবে অর্হমের ধ্বনির প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝতে পারব, আর এই ভাবনা যদি বোধগম্য না হয় তবে অর্হমের ধ্বনি আমাদের কাছে এক প্রথাগত শব্দ রূপেই থেকে যাবে।

মন্ত্রের পদের নির্বাচন এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে করতে হয়। সর্ব প্রথম দৃষ্টিকোণ হল, শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র পদের সম্বন্ধ। আমরা যেন একথা ভুলে না যাই যে, আমাদের সাধনার সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্বাস সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ সাধন। আমরা শ্বাসকে যেন বিস্মৃত না হই, তার গুরুত্ব যেন ভুলে না যাই। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে শ্বাসের যোগ করা প্রয়োজন।

মন্ত্রের নির্বাচন এমন হবে, যাতে এক নিঃশ্বাসেই সম্পূর্ণ মন্ত্র রটন করা যায়। মন্ত্রের সঙ্গে শ্বাসের লয় যুক্ত করা চাই। শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্রের সম্বন্ধ স্থাপন করা চাই। অর্হম একটি মন্ত্র শব্দ। এর উচ্চারণ সহজেই আনন্দের সঙ্গে এক শ্বাসেই করা যায়। তাতে কোন অসুবিধেই নেই। দীর্ঘ উচ্চারণ করলেও এই শব্দ একই শ্বাসে সমাপ্ত হবে।

তবে নির্বাচন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হতে পারে। মন্ত্র বড়ও হতে পারে। যেমন—ণমো অরহংতাণং, ণমো সিদ্ধাণং, ণমো আযরিযাণং,

ণমো উবজঝায়ণং, ণমো লোএ সব্ব সাহুণং। এই মন্ত্রে পাঁচ পদ আছে। পাঁচ পদেব এই পুবো মন্ত্রটি একই শ্বাসেব উচ্চাবণ কবা খুবই কঠিন কাজ। সে ক্ষেত্রে এক উপায আছে। মন্ত্র যদি বড হয তবে তাকে ভাগ কবে নেওযা যায। এক এক ভাগ এক এক শ্বাসে উচ্চাবণ কবা যায। 'ণমো অবহংতাণং'—এই ভাগেব উচ্চাবণ এক শ্বাসে সহজেই কবা যায। 'ণমো সিদ্ধাণং'—এই ভাগেব উচ্চাবণ দ্বিতীয শ্বাসে কবা যায। এই ভাবে পাঁচটি পদ পাঁচটি শ্বাসে উচ্চাবণ কবা সম্ভব হয। পাঁচ শ্বাসে পুবো মন্ত্রেব জপ কবা যায। শ্বাসেব কথা এখানেই পর্যাপ্ত নয। শ্বাসেব সঙ্গে মন্ত্র-পদেব লযবদ্ধতা হওযা আবশ্যক।

সঙ্গীতজ্ঞ বাদ্যযন্ত্রেব সঙ্গে গান গায। বাদ্যেব সঙ্গে তাব গানেব লযেব একতা হয। সেই বকম, শ্বাসেব সঙ্গে মন্ত্র পদেব একতা হওযা দবকাব। শ্বাসেব সঙ্গে যখন মন্ত্র পদেব লয যুক্ত হয তখন সহজেই একাগ্রতা আসে। তখন শ্বাস ও মন্ত্র পদেব উচ্চাবণেব মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকে না। উভযেব সম্পূর্ণ মিল হয, ফলে তন্ময়তা এসে যায। শ্বাসেব প্রকম্পন আব ধ্বনিব প্রকম্পন—দুটি একসঙ্গে যুক্ত হযে যায।

আমবা সবাই এক প্রকম্পনেব জীবন যাপন কবি। যদি এমন কোন ক্যামেবা বা আযনা থাকত যাব সামনে দাঁডিযে আমবা দেখতে পাবতাম, তবে দেখাব ক্ষমতা থাকলে আমবা দেখতাম যে বাইবেব সব কিছু কেবল স্থূল ও বস্তুত তুচ্ছ। সূক্ষ্মরূপে দেখতে গেলে সমস্ত শবীব অণুব প্রকম্পন মাত্র। প্রবল বর্ষা আবম্ভ হযেছে। জোবে জল নিচে গডিযে পডছে। জলে একটি বুদ্‌বুদ উঠল, আব ফেটে পডল। দ্বিতীয বুদ্‌বুদ উঠল, আব ফেটে পডল। আবাব তৃতীয বুদ্‌বুদ উঠল ও ফেটে পডল। এই ক্রমই চলতে লাগল। প্রবল বর্ষায় বুদ্‌বুদেব নাচন লেগে যায। আমাদেব শবীবেও এই বকম নাচ চলছে। পবমাণু আসছে, আবাব যাচ্ছে, সংঘটিত হচ্ছে, আবাব বিঘটিত হচ্ছে। তবঙ্গেব পব তবঙ্গ উঠছে। সাবা শবীব যেন তবঙ্গ প্রবাহেব প্রকম্পনেব

এক পুলিন্দা। তবে ভাগ্য ভাল এই অবস্থা দেখতে পাওয়ার উপায় আমাদের নেই। তাই আমরা মনে করি যে, শরীর একটি সুদৃঢ়, নিরেট বস্তু। কিন্তু নিরেট হবে কি করে? বিজ্ঞান স্বীকার করে যে আমাদের সমস্ত দৃশ্য জগৎ, যাকে আমরা জানি ও চিনি, তাকে যদি কেটেকুটে একত্র সংহত করি, তবে তা আয়তনে একটা খেলার বলের মত হবে। সারা জগৎ একটা বল যতটা বড, মাত্র ততটা বড হবে। কেবল আপনারা বা আমরা নই, সব পাহাড, নদীনালা, সব ঘরবাড়ি, সমস্ত বালুকণা সব কিছু কেটেকুটে এক করে নিলে, সেই পুঞ্জিত বস্তুর পরিমাণ হবে একটা বলের যে পরিমাণ, কেবল তাই। নিরেট বস্তু খুবই কম আছে। কেবল প্রকম্পন, প্রকম্পন আর প্রকম্পন। শরীরকে নিরেট বস্তু বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ভেতরে যান, ভেতরে গেলেই দেখবেন সবই ফাঁপা, কেবল ফাঁপা। ওপরে চামডা দিয়ে ঢাকা, তাই ভেতর দেখাই যায় না। একটি মানুষকে কেটেকুটে একত্রিত করে নিলে বোধহয় তা একটি পরমাণুর সমানও হবে না। শরীরের তরঙ্গ, শ্বাসের তরঙ্গ, বিচারের তরঙ্গ, ধ্বনির তরঙ্গ—আমরা কেবল তরঙ্গের দ্বারা বেষ্টিত আছি। দর্শনের ভাষায় বলতে হয়, আমরা পর্যায়ের দ্বারা বেষ্টিত আছি। পর্যায়ের পর পর্যায়। দ্রব্য কোথায়? আত্মা দ্রব্য, তাকে তো দেখা যায় না। অণুও দ্রব্য, কিন্তু তা অতি সূক্ষ্ম। সবই পর্যায়ের আবর্ত। তরঙ্গের পর তরঙ্গ। পর্যায়ের পর পর্যায়। প্রকম্পনের পর প্রকম্পন। প্রকম্পনের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনধারা চলেছে।

আমরা ঠিকভাবে প্রকম্পনের উপযোগ করব, তার শক্তির উপযোগ করব। ধ্বনির তরঙ্গের উপযোগ করতে আমরা শিখব। ধ্বনির তরঙ্গ থেকে উৎপন্ন শক্তিকে ঠিকভাবে নিয়োজিত করব। যখন ধ্বনি তরঙ্গ মনের তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়, সঙ্কল্পের তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়, আর শ্বাসের তরঙ্গের সঙ্গেও যুক্ত হয়, তখন অতি বড শক্তি উৎপন্ন হয়।

শব্দের কম্পন তার চরম সীমান্তে পৌঁছে 'ক্ষ' কিরণ-এক্স-রে-রূপে পরিণত হয়। তখন তার গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক কোটি মাইল হয়ে

যাব। সংকল্পেব কম্পন তাতে আবও শক্তি নিযোজন কবে। একজন যোগেব মর্মজ্ঞ আচার্য বলেছেন, যাব দৃঢ় নিশ্চযে কোন ছেদ নেই, সে কি না কবতে সমর্থ? তাব পক্ষে কিছুই দুষ্কব নয়। শব্দেব সিদ্ধি আস্থাব থেকে হয। আস্থাহীন শব্দ শক্তিশূন্য হযে যায। শব্দের সাধনাব অর্থই হল আস্থা ও শব্দেব মধ্যে ব্যবধান লোপ কবা। আব অর্থ হল, ধ্বনিকে আস্থাব কবচ পবিযে দেওযা।

৪

মনের পটুতা বিধান

আমাদের চেতনার অনেক স্তর আছে। তাদের মধ্যে সর্বাধিক স্থূল স্তর হল ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম, মন অপেক্ষা বুদ্ধি সূক্ষ্ম, আর বুদ্ধি অপেক্ষা অধ্যবসায় সূক্ষ্ম। এই রকম অসংখ্য স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরের নামকরণ করা সম্ভব নয়। চেতনার অনেক স্তরের মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি, অনেক স্তরের মধ্য দিয়েই আমাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে।

ইন্দ্রিয়গুলি খুবই স্থূল, তাই তারা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। মনের চেতনা সূক্ষ্ম, তাই মনকে বোঝা অপেক্ষাকৃত কঠিন। আমরা ধ্যান করি, আমাদের ধ্যানের সম্বন্ধ মনের সঙ্গে। ধ্যানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন সোজাসুজি সম্বন্ধ নেই। ধ্যানের প্রথম সম্বন্ধই মনের সঙ্গে। ধ্যান এক প্রকার মানসিক ক্রিয়া। বাস্তবিক পক্ষে ধ্যান খুব বিপজ্জনক। ধ্যান খুব সহজ কাজ নয়, এর থেকে অনেক বিপদ হতে পারে। যা লাভজনক হয়, তা বিপজ্জনকও হয়। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যার থেকে কেবল লাভই হয় কখনও কোন বিপদ হয় না। বরং লাভের সম্ভাবনা যত অধিক হয় বিপদের সম্ভাবনাও তত অধিক হয়। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ধ্যান থেকে আমরা যেমন অনেক

কিছু লাভ করতে পারি, তেমনই ধ্যান থেকে আমাদের অনেক রকম বিপদও হতে পারে। যদি আমরা ঠিক প্রক্রিয়া না বুঝে ধ্যান করতে যাই তবে অনেক ক্লেশের মধ্যে পড়তে পারি। ধ্যানের দ্বারা এক বিশেষ প্রকার তাপের সৃষ্টি হয়। কেউ যদি সে তাপ সহ্য করতে না পারে তবে সে পাগল হয়ে যেতে পারে। সেজন্য ভালভাবে বুঝে সুঝে, বিচার বিবেচনা করে ধ্যান করা উচিত। ধ্যানের ক্ষেত্রে খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হওয়াই উচিত। এটা সম্ভব নয় যে, প্রথম দিন ধ্যান করতে বসেই এক ঘণ্টা ধরে ধ্যান করতে পারব। এক ঘণ্টা ধ্যান করার অভ্যাস করতে দীর্ঘ সময় লাগে। প্রথম দিন যদি দু মিনিট ধ্যান হয় তবে বিরাট সফলতা লাভ হয়েছে মনে করতে হবে। দু মিনিট ধ্যান সামান্য কথা নয়। যদি কোন ব্যক্তি দু মিনিট কেন্দ্রিত থাকতে পারে, একাগ্র থাকতে পারে, স্থির থাকতে পারে, তবে বুঝতে হবে তার সাফল্য এসেছে, তার উপলব্ধি হয়েছে। এমন লোক খুবই কম মেলে যে এক বৎসরের চেষ্টায় দু মিনিট ধরে এক বিষয়ে একনাগাড়ে একাগ্র থাকতে পারে। কারণ ঐ সময়ের মধ্যেই তার মন বিচলিত হয়ে যেতে পারে। দু মিনিট কাল মনে কোন ব্যবধান আসবে না, কোন বিকল্প উদয় হবে না—এ বড় কম কথা নয়।

আমাদের মনে নিরন্তর বিকল্প উদয় হচ্ছে, ব্যবধান এসে যাচ্ছে। আমরা কোন এক বিচার নিয়ে বসলাম। সেই বিষয়ের ওপর একাগ্র হওয়ার চেষ্টা করা মাত্রই মনে বিভিন্ন বিকল্প আর ব্যবধান উৎপন্ন হতে থাকে। মন যখন চঞ্চল অবস্থায় থাকে তখন কত যে ব্যবধান হতে পারে তা কল্পনা করাই যায় না। একাগ্র হলে পরে বোঝা যায় যে বিকল্পের প্রবাহ কত দ্রুত চলছে আর একাগ্রতায় কত ব্যবধান উৎপন্ন করছে। ধ্যান খুবই বিপজ্জনক। প্রথম ক্ষণেই বা প্রথম দিনেই বা শিক্ষণ-শিবিরের প্রথম আয়োজনেই ধ্যান সিদ্ধ হয়ে যাবে—এটা কোন কথাই নয়। এটা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে এখন যে অভ্যাস চলছে তা কেবল অবধানের অভ্যাস।

যোগেব ভাষায মনেব তিন অবস্থা আছে—অবধান, একাগ্রতা বা ধাবণা, আব ধ্যান। মনোবিজ্ঞানেও অনুরূপ বিচাব আছে। তাতেও তিন অবস্থাব কথা বলা হযেছে, যথা—অ্যাটেন্‌শন, কনসেনট্রেশন আব মেডিটেশন। অবধান, কেন্দ্রীকবণ আব ধ্যান। মনেব এই তিন অবস্থা। সমস্ত মানসিক ক্রিযা এই তিন অবস্থাব মধ্যেই ঘটে।

মনেব প্রথম অবস্থা—অবধান, অ্যাটেন্‌শন। এটা মনেব ক্রিযা, যে ক্রিযাব দ্বাবা আমবা মনকে কোন বস্তুব প্রতি ব্যাপৃত, লগ্ন কবি। যে মন সর্বদা ঘুবে বেডায, তাকে এক বস্তুব প্রতি ব্যাপৃত কবা, মনকে সচেতন কবা—চৈতন্যবান কবা—এই হল অবধানেব অবস্থা। এই অবস্থায পদার্থেব সঙ্গে মনেব সম্বন্ধ স্থাপিত হয। একেই অবধান বলে। আমবা বলি—সাবধান হযে যাও। এব অর্থ হল—এক কার্যেব প্রতি একচিত্ত হযে যাও। যা কবতে হবে কেবল তাব ওপব চিত্তকে লগ্ন কব।

অবধান যেমন বাহ্য বস্তুব ওপব হয, তেমনই সময সময নিজেব মূল স্বরূপেব প্রতিও হয। যখন মৌলিক স্বরূপেব প্রতি অবধান হয, তখন সেই স্থিতিতে প্রজ্ঞাব উদয হয। আব বাহ্য বস্তুব প্রতি অবধান হয না। মনেব অবধান তখন নিজেব প্রতিই চালিত হয। নিজেব প্রতি মনেব অবধান এক বিশেষ প্রকাব স্থিতিব লক্ষণ। এই স্থিতিতে প্রজ্ঞাব উদয হয, আন্তবিক চেতনা প্রকট হয।

মনেব দ্বিতীয অবস্থা—কন্‌সেন্‌ট্রেশন, যা যোগেব ভাষায একাগ্রতা বা ধাবণা। এটা অবধানেব পবেব অবস্থা। এই অবস্থায আমবা যে বিষযে অবধানকে ব্যাপৃত কবেছি, পদার্থেব সঙ্গে মনেব সম্বন্ধ স্থাপিত কবেছি, সেই বিষযেই কেন্দ্রিত হযে যাই। যে মন চাবদিকে ঘুবে বেডাচ্ছে, অনেক বস্তুব প্রতি ধাবিত হচ্ছে, তাকে অন্য সব বস্তু থেকে হটিযে এনে একই বস্তুতে কেন্দ্রিত কবা—এই হল কন্‌সেন্‌ট্রেশন, একাগ্রতা বা ধাবণা। এই মনেব ধাবণাবস্থা। ধ্যানেব আগে ধাবণা কবতে হয। শবীবেব কোন অংশে বা কোন বস্তুতে মনকে স্থাপিত কবে নেওযা, মনকে আবোপিত কবে নেওযা—এই হল ধাবণা।

পতঞ্জলি ধাবণাব এই পবিভাষা কবেছেন—'দেশবন্ধঃ চিত্তস্য ধাবণা' চিত্তকে কোন প্রদেশে বেঁধে দেওযা, কোন বস্তুব সঙ্গে চিত্তেব সম্বন্ধ স্থাপিত কবা যাতে চিত্ত তাতেই বাঁধা থাকবে, অন্যত্র কোথাও যাবে না, এই হল ধাবণাব অবস্থা।

মনেব তৃতীয অবস্থা—মেডিটেশন, ধ্যান। অবধানেব পব ধাবণা, আব ধাবণাব পব ধ্যান। কেন্দ্রীকৃত মনেব যে সঘন অবস্থা, তাই হল ধ্যান, ধ্যানে মন স্থিব হযে যায, একেবাবে জমে যায। দীর্ঘ সময ধবে মন যখন জমে থাকে তখন সেই অবস্থাকে বলা হয ধ্যানাবস্থা। এই হল মেডিটেশন, ধ্যান।

আমবা তিন অবস্থা সম্বন্ধেই বিচাব কবলাম। ধ্যান হল তৃতীয অবস্থা।

সর্বপ্রথমে অবধানেব অভ্যাস কবতে হবে। মনেব এমন স্থিতি আনতে হবে যাতে অবধান কবা সম্ভব হয। মন অত্যন্ত গতিশীল তত্ত্ব। মনেব কাজই হল গতিব ওপব থাকা। বাস্তবে কিন্তু এটাই মনেব স্বভাব নয। আমবা একেবাবে বিপবীত দিকে যেতে চাই। স্রোতেব সঙ্গে চলা খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেকেই স্রোতেব সঙ্গে চলতে পাবে। নৌকাও স্রোতেব সঙ্গে চলে। স্রোতেব প্রতিকূলে চলা কঠিন কাজ। যে স্রোতেব প্রতিকূলে চলতে সক্ষম হয সেই সাধক, সাধনা তাকেই সাজে। ভগবান মহাবীব বলেছেন—

'অনুসোযপটিঠএ বহুজণম্মি পডিসোযলদ্ধলকেখণং।

পডিসোযমেব অপ্‌পা দাযব্বো হোউকামেণং॥'

সমস্ত সংসাব স্রোতেব পিছেই চলছে। সাবা সমাজ, সকল জনতা স্রোতেব পিছে চলছে—প্রবাহেব সঙ্গে সঙ্গে চলছে। এরূপ স্থিতিতে প্রতিস্রোতে চলা খুবই কঠিন কাজ। তিনি আগে খুবই মহত্বপূর্ণ কথা বলেছেন—'অনুসোও সংসাও, পডিসোও উত্তাবো'—অনুস্রোত অর্থাৎ স্রোতেব পিছনে চলা—তাবই নাম সংসাব। স্রোতেব পেছনে চলাই হল চঞ্চলতা। স্রোতেব সঙ্গে সঙ্গে চলা—তাকেই বলে অশান্তি,

তাকেই বলে দুঃখ। স্রোতের প্রতিকূলে চলা—তাকেই বলে শান্তি। তাকেই বলে স্থিরতা, তাকেই বলে উত্তরণ, পার পেয়ে যাওয়া। যে স্রোতের প্রতিকূলে চলার ক্ষমতা রাখে সে বাস্তবিকই পার পেয়ে যায়। ধ্যানের ক্রিয়া প্রতিস্রোতের ক্রিয়া, স্রোতের প্রতিকূলে চলার ক্রিয়া। যে মন চঞ্চল ও গতিশীল তাকে কেন্দ্রিত করা, অবহিত করা, স্থির করা—এ সবই বিপরীত ক্রিয়া অর্থাৎ মনের যে স্বভাব নয় সেই স্বভাবেই মনকে টেনে স্থাপিত করা। এর থেকেই বোঝা যায়, ধ্যান কত কঠিন ক্রিয়া। এ কথা মনে করবেন না যে, ধ্যান খুবই সহজ ও সরল ক্রিয়া। আমি ধ্যানকে বিভীষিকা রূপে দেখাতে চেষ্টা করেছি। হয়ত কিছু লোক এতে ভয় পেয়ে যাবে। তারা ভাববে ধ্যানের সাধনা যদি এত কঠোর হয় তবে তারা ধ্যান করতে বসবে কেন? আমি চাই না যে বস্তুস্থিতি কি—প্রকৃত অবস্থা কি, তা আপনারা বুঝবেন না। আপনাদের মনে ভয় হতে পারে বলে আমি সত্যকে গোপন করব—একথা আমি মানি না। এরকম ভ্রান্তি আমি পছন্দ করি না। আমি চাই না যে আপনারা ভ্রান্তি নিয়ে থাকুন। যে জিনিষ যে রকম তাকে ঠিক সে রকমই বুঝতে হবে। ধ্যানের সাধনা বাস্তবিকই কঠিন। আমরা যদি ধ্যানকে সহজ মনে করে চলি তবে আমরা ভ্রমে পতিত হব, আর হয়ত আমরা ধ্যানের স্থিতি পর্যন্ত পৌছতেই পারব না। এ রকম আত্ম-আন ভ্রান্তি বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা ধ্যান করছি মূর্চ্ছাকে ভাঙ্গার জন্য, প্রমাদকে ধ্বংস করার জন্য। সে স্থলে যদি ধ্যানের দ্বারা নতুন মূর্চ্ছা বা নতুন ভ্রান্তি জন্ম নেয় তবে খুবই অনিষ্ট হবে। আমরা অসত্যকে দূর করার জন্য ধ্যান করছি, অথচ ধ্যানের ফলে নতুন অসত্যের সৃষ্টি হল এ কখনই বাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি হতে পারে না। সেজন্য যথার্থবাদী ও বস্তু-বাদী হয়ে, বাস্তবিক অবস্থা বুঝে, আমাদের ধ্যানের মার্গে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের মানতে হবে ধ্যান এক দীর্ঘস্থায়ী সাধনা, এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া। অল্প সময়ের মধ্যেই ধ্যানকে সিদ্ধ করার জন্য আমরা যেন ত্বরা না করি। ধ্যানকে সিদ্ধ করার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন [illegible]

আলোচনা আমি 'কাকে সাধনা কবব ?'—এই বিষযেব অন্তর্গত কবেছি। সম্পূর্ণ তৈবি না হয়ে, অন্য যে সাধন প্রযোজন তা সমাপ্ত না কবে, আমবা যদি ধ্যানকে সিদ্ধ কবতে চাই, তবে লাভেব বদলে ক্ষতিব সম্ভাবনাই অধিক হবে।

যে ব্যক্তি মন্ত্রেব সাধনা কবছে সে যদি কবচেব ক্রিযা না কবে, তবে তাব ভীষণ বিপদ হতে পাবে। সর্বপ্রথমেই তাকে আত্মবক্ষাব কবচ বানিযে নিতে হয। এজন্যই বিভিন্ন মন্ত্রেব দীক্ষাব সঙ্গে বিভিন্ন কবচেব ব্যবস্থা কবা হযেছে। কবচ তৈবি কবাব উদ্দেশ্য হল, নিজেব জন্য বজ্রসম দৃঢ পঞ্জব নির্মাণ কবা। কবচ প্রস্তুত কবে নেওযাব পবে বাইবেব কোন শক্তি কবচধাবীকে আঘাত কবতে পাবে না। শবীবেব প্রত্যেক অবযবেব জন্য পৃথক পৃথক কবচেব ব্যবস্থা আছে। মাথা থেকে পাযেব অঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত প্রত্যেক অবযবকেই কবচ পবিযে দিযে সুবক্ষিত কবা যায।

প্রাচীনকালে সৈনিক কবচ ধাবণ কবে যুদ্ধস্থলে আসত। লোহা বা অন্য ধাতু দিযে তৈবি কবচ এত মজবুত হত যে তববাবি বা বর্শাব আঘাত তা ভেদ কবতে পাবত না। কবচ পবিধান কবে যোদ্ধা সুবক্ষিত হত, বাইবেব আঘাত থেকে মুক্ত থাকত।

অনুরূপ ভাবে, মন্ত্রেব সাধক মন্ত্রেব সাধনা আবম্ভ কবাব আগে কবচ তৈবি কবে তা ধাবণ কবে, যাতে বাইবেব কোন শক্তি তাকে আঘাত কবতে না পাবে বা তাব কোন অনিষ্ট কবতে না পাবে।

প্রস্তুতি সকলকেই কবতে হয। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া কোন কাজ কবা সম্ভব হয না। ধ্যানেব জন্যও পূর্ব প্রস্তুতিব প্রযোজন আছে। এই প্রস্তুতিব অঙ্গ হিসাবে শবীবেব সাধনা খুবই দবকাবী। আব মানসিক প্রস্তুতিব জন্য সর্বাগ্রে অবধানেব অভ্যাস কবা আবশ্যক।

সেজন্য আজ আমি ধ্যানেব আলোচনা কবাব আগে মনকে পটু, কুশলী ও প্রশিক্ষিত কবাব বিষযে আলোচনা কবছি। মনকে এই প্রকাবে প্রশিক্ষিত কবতে হবে যে, মনেব ক্ষমতা বিকশিত হবে আব

ধ্যানের স্থিতি পর্যন্ত পৌছে যাওয়ার যোগ্যতা সম্পাদিত হবে। অবধান দ্বারা যোগ্যতার সম্পাদন হয়। মনকে পটু না করে—মনের পটুতা বিধান না করে—ধ্যানের ভূমি পর্যন্ত পৌছান সম্ভব হয় না। সেজন্য মনকে কুশলী ও দক্ষ করা বিশেষ প্রয়োজন। মনকে পটু করার জন্য অনেক রকম অভ্যাস বিধান করা হয়। আসনের অভ্যাস এই জন্য করান হয় যে, এর দ্বারা শরীরে পটুতা আসে। আসনের দ্বারা আমাদের মেরুদণ্ডের হাড় এমন নমনীয় হয় যে, আমরা ইচ্ছামত শরীরকে বাঁকাতে বা ঘোরাতে পারি। যার মেরুদণ্ডের হাড় নমনীয় নয় সে শরীর বাঁকাতে পারে না, তার শরীর অনড় হয়। যেমন শারীরিক সাধনার উদ্দেশ্যে মেরুদণ্ডের হাড় নমনীয় রাখার জন্য আসনের অভ্যাস করা আবশ্যক, তেমনই মানসিক সাধনার উদ্দেশ্যে অবধানের বিবিধ প্রয়োগ করাও আবশ্যক।

মনের সম্বন্ধ বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে। মনকে আমরা শিক্ষিত করতে চাই। মনের প্রশিক্ষণের একটি ক্রম আছে। নন্দীসূত্রে এই ক্রম সুন্দরভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে।

প্রথম ক্রম-যুগল হল—অল্পগ্রাহী, বহুগ্রাহী। মনকে আমি এক কাজে লাগালাম, যার একবিন্দু মাত্রই মন ধরতে পারে, মন অল্পই ধরতে পারে আর অল্পকালই কোন বস্তুকে ধরে রাখতে পারে। এই হল অল্প-গ্রাহী। বহুগ্রাহীর অর্থ—বহুকে ধরা, বড় বস্তুকে ধরা, আর দীর্ঘকাল ধরে রাখা।

আমরা প্রেক্ষা করি। শরীরের প্রেক্ষা করি, শ্বাসের প্রেক্ষা করি। উপদেশ দেওয়া হয়, নাসাগ্রে যাতায়াতকারী শ্বাসকে দেখ। শ্বাসের আগম দেখ, নির্গমও দেখ। যে শ্বাস ভিতরে আসছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখ। যে শ্বাস বাইরে যাচ্ছে, তাকেও লক্ষ্য কর। নাসাগ্র বিন্দুতে কেবল শ্বাসকে দেখ। মনকে নাসাগ্রের ওপর কেন্দ্রিত কর, অবহিত কর। মনের অবধানকে নাসাগ্রের ওপর স্থাপিত করে যাতায়াতকারী শ্বাসকে দেখ। দরজায় দাঁড়িয়ে প্রহরী সর্বদা দৃষ্টি রাখে, কে ভেতরে

আসছে আব কে বাইবে যাচ্ছে। যখন কেউ ভেতবে আসে বা বাইবে যায, তখন প্রহবী সতর্ক হযে দেখে। সেই বকমভাবে নাসাগ্র থেকে যে শ্বাস আসছে-যাচ্ছে, তাকে দেখতে হয। এই শ্বাস বাইবে গেল, এই শ্বাস ভেতবে এল--এই গতাগতি দেখ, ধ্যানকে কেন্দ্রিত কব। এই হল অল্পেব প্রেক্ষা, অল্পেব অবধান। এই হল অল্পগ্রাহী।

বহুগ্রাহী অর্থাৎ বহুব প্রেক্ষা। উপদেশ দেওযা হয, মনকে শ্বাসেব সঙ্গে ভেতবে নিযে যাও, প্রশ্বাসেব সঙ্গে মনকে বাইবে নিযে এস। এটা বহুব অবধান—বহুগ্রাহী। অল্পগ্রাহীব ক্ষেত্রে আমাদেব পথ ছিল অল্প, এখন আমাদেব পথ হল দীর্ঘ। অল্পগ্রাহীব ক্ষেত্রে মনকে কেবল নাসাগ্রে স্থিব বাখা হযেছিল, এখন মনকে শ্বাস-প্রশ্বাসেব পুবো পথেবই অবধান কবতে হয। পথ দীর্ঘ হযে যায, ফলে যাত্রাও দীর্ঘ হয। যেখানে নাভিব আশপাশ থেকে শ্বাস উঠছে সেখানেই শ্বাসেব সাথে মনকে জুডে দিতে হয আব তাকে শ্বাসেব সঙ্গে সঙ্গে ভেতবে নিযে যেতে হয। যেখানে গিযে শ্বাসযন্ত্র সমাপ্ত হয আব শ্বাস ফুসফুসে প্রবেশ কবে, সেখান পর্যন্ত মনকে নিযে যেতে হয। একেবাবে ডাযাফ্রাম পর্যন্ত মনকে নিয়ে যেতে হয। যেখানে শ্বাসেব সীমা সে পর্যন্ত শ্বাসকে টেনে নিতে হয। এই হল বহুব অবধান, বহুব গ্রহণ, বহুব প্রেক্ষা। সুতবাং অভ্যাসেব এই দুটি ক্রম আছে—

১। অল্পেব গ্রহণ—অল্পকে দেখাব অভ্যাস।

২। বহুব গ্রহণ—বহুকে দেখাব অভ্যাস।

প্রথমটিব ক্ষেত্রে আমবা একটি ক্ষুদ্র বিন্দুকে দেখি, দ্বিতীযটিব ক্ষেত্রে আমাদেব পথ দীর্ঘ হযে যায, অবগাহনেব মার্গও দীর্ঘ হযে যায।

অভ্যাসেব দ্বিতীয ক্রম-যুগল হল—

একবিধগ্রাহী।

বহুবিধগ্রাহী।

এক প্রকাব বস্তুকে দেখা আব বহু প্রকাব বস্তুকে দেখা। উপদেশ দেওযা হযেছে, নাসাগ্রে যে প্রকম্পন হচ্ছে তা দেখ, অথবা নাসাগ্রেব

ওপর শ্বাসের স্পর্শ অনুভব কর। এও এক প্রকারের অবধান।

যেমন জলে প্রকম্পন হয়, উর্মিমালা ওঠে, তেমনই শরীরও প্রকম্পিত হয়। কেবল প্রকম্পন আর প্রকম্পন। উর্মি আর উর্মি। স্থিরতা বলে কোন পদার্থই নেই। এই পরিস্থিতিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, নাসাগ্রে যে প্রকম্পন হয় তা দেখ। এও এক প্রকারের গ্রহণ, এক প্রকারের অবধান। এতে মনকে এক স্থানের ওপর অবহিত করে দেওয়া হয়েছে। একে বলে, একবিধগ্রাহী।

বহুবিধগ্রাহীর অর্থ হল—এক সঙ্গে অনেক বস্তুকে দেখা। মনের পটুতা আরও বেড়ে যায়। একসঙ্গে অনেক বস্তুকে কেবল দেখা নয়, মন তাদের গ্রহণ করতেও সমর্থ হয়।

যে অবধান করে, সে মনকে পটু করার প্রশিক্ষণও নেয়। তার অভ্যাস এত তীব্র হয়, ফলে তার পটুতা এত বিকশিত হয়, সে একই সঙ্গে অনেক বস্তুকে ধরতে পারে। উপাধ্যায় যশোবিজয়জী শ্রেষ্ঠ অবধানকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী তার্কিক বিদ্বান ছিলেন। তিনি অবধান করতে লাগলেন। একশ পিতলের বাটি তাঁর সামনে রাখা হল। এক ব্যক্তি এক এক করে সবগুলি বাটি বাজাতে লাগল। প্রত্যেক বাটির ধ্বনিই অবধানকারী অবধান করলেন। তাঁর মন ধ্বনির সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে অবহিত হল। একশ বাটির ধ্বনিই এই ভাবে গৃহীত হল। তারপর পরীক্ষার সময় এল। পরিষদ থেকে এক ব্যক্তি এল। সে একটি বাটি বাজাল, আর তার সংখ্যা জিজ্ঞাসা করল। অবধানকারী বলে দিলেন ঐ ধ্বনি অমুক সংখ্যার বাটির ধ্বনি। এই ভাবে আরও অনেক প্রশ্নকর্তা এল, বাটির সংখ্যা জিজ্ঞাসা করল। অবধানকারী প্রত্যেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

এ ধ্বনি পটুতার জ্ঞান। একই রকমের বাটিগুলির ধ্বনি প্রায় এক রকমেরই হয়। কিন্তু অবধানকারী ধ্বনিগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরতে পারেন। তিনি আপন শ্রবণেন্দ্রিয়ের পটুতা এতই বিকশিত করেছেন যে ধ্বনির অতি সূক্ষ্ম পার্থক্যও তাঁর জ্ঞানগোচর হয়।

আমাদের সঙ্ঘের কিছু অবধানকারী 'সপ্তসন্ধান' নামক অবধান করে থাকেন। এটা এক সঙ্গে অনেক বিষয় গ্রহণ করার ক্ষমতার পরিচায়ক। একজন এক কথা বলল, আর একজন সেইক্ষণেই আর এক কথা বলল। অবধানকারীর পেছনে তার দুই হাতে দুটি ভিন্ন বস্তু স্পর্শ করান হল। তিন জন সামনে দাঁড়িয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখাল। এইভাবে সাত ব্যক্তি সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করল। সমস্তটাই একই ক্ষণে করা হল। অবধানকারী ঐ সাতটি ক্রিয়াকেই একই ক্ষণে গ্রহণ করে নেয়। এমনি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন কাজ একই সঙ্গে ধরতে পারা, আর সেগুলি যথাযথ বলতে পারা বহুবিধগ্রাহীর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবধানের এরূপ কুশলতা থেকে, পটুতার এরূপ অভ্যাস থেকে, এক সঙ্গে অনেক বস্তুকে ধরতে পারার ক্ষমতা এসে যায়।

এই চারটি বিকল্প হল—অল্পের গ্রহণ, বহুর গ্রহণ, একবিধের গ্রহণ ও বহুবিধের গ্রহণ। এ মানসিক প্রশিক্ষণের ক্রম। এই ক্রম অনুসরণ করে মনকে প্রশিক্ষিত করা যায়। মনের কি প্রবল শক্তি আছে আপনি কল্পনা করুন। আপনারা একে যাদু বা আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে করবেন না। মনের এই প্রবল শক্তি সকলেই মধ্যেই আছে। আপনাদের মধ্যে আছে, আমার মধ্যে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মন সকল শক্তির আধার হয়ে আছে। এই মাত্র পার্থক্য যে, কিছু ব্যক্তি অভ্যাস দ্বারা মনের পটুতা বিধান করেছে, মনকে বিকশিত করেছে। আর কিছু ব্যক্তি সেরকম কোন প্রযত্ন করেনি, ফলে তাদের মন বিকশিত হয়নি। পার্থক্য কেবল প্রযত্নের, কেবল অভ্যাসের। আমরা যদি প্রযত্ন করি তবে আমরাও মনের পটুতা সাধন করতে পারি, আর তা হলে বহুবিধ গ্রহণ আমাদের পক্ষেও সহজ হয়ে যাবে।

আমাদের অনেক সাধু-সাধ্বী অবধানের প্রয়োগ করে থাকেন। সাধারণ লোকের কাছে এটা আশ্চর্যজনক ক্ষমতা বলে মনে হয়। তারা মনে করে এটা চমৎকারী দৈবী শক্তির নিদর্শন। কিন্তু এতে চমৎকারিতা

কিছু নেই। এটা কোন দৈবী শক্তি বা বিদ্যা নয়। বাইরের কোন শক্তিই নয়। এটা কেবল মনের প্রশিক্ষণ, মনের শক্তি। এই আধারেই সব প্রয়োগ ঘটে। একে চমৎকার বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে এটা মনেরই পটুতা, তার অতিরিক্ত কিছু নয়।

তৃতীয় চরণ হল—ক্ষিপ্রগ্রাহী, চিরগ্রাহী। এরাও একটি যুগল। মনকে এমন অভ্যাস করান হয় যে তা বাহ্য পদার্থ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করে সব কিছু গ্রহণ করে নিতে পারে। তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতে পারে। কেউ একটি ঘর এক মুহূর্ত দেখল, তারপরে চোখ বুঁজে ঘরে যা কিছু আছে সব বলে দিল। ভিতের রঙ সাদা, সামনে কাল রঙের বোর্ড, এতগুলি লেখার তক্তা আছে, তাতে লাল, কাল, নীল অক্ষর আছে, এতগুলি দরজা-জানালা আছে। মোটের ওপর ঘরের পুরো বিবরণ দিয়ে দিল। একেই বলে, ক্ষিপ্র-গ্রহণ। এককালেই সব কিছু গ্রহণ করা, সব কিছু ধরে নেওয়া।

আমরা মনের ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত নই। মনের প্রচুর ক্ষমতা আছে। আমরা খুবই কম জানি। অল্প কিছু জানতে পারলেই আমরা আশ্চর্যান্বিত হই। যদি আমরা মনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা জানতে পারি, বিকশিত করে নিতে পারি, তবে কি না কি হতে পারে বোঝা কঠিন। আজ মনের কিছু ক্ষমতাকে বিকশিত করে মানুষ ভগবান বনে যায়, সারা দুনিয়া তাকে ভগবান বলে মেনেও নেয়। ঠিক আছে। ভগবান হয়ে যাওয়া কিছু খারাপ কথা নয়। নিজের অন্তরে নিজের যে ভগবান আছেন তাঁকে প্রকট করা খুবই ভাল কথা। তবে দুনিয়া খুবই তাড়াতাড়ি ভগবান বলে স্বীকার করে। মনের সামান্য কিছু ক্ষমতার প্রকাশ সামনে ঘটল, অমনি ভগবান বলে মেনে নিল। মনের পূর্ণ ক্ষমতা যদি জানতে পারি, যদি সেই ক্ষমতাকে সাধনা করে অভিব্যক্ত করতে পারি, তবে না জানি কত বড় ভগবান হয়ে যাব।

অন্যপক্ষে বিকল্প হল—চিরগ্রাহী। চিরগ্রাহী কোন কিছু তৎক্ষণাৎ ধরতে পারে না, কিন্তু ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময়ে তা ধরে ও গ্রহণ করে।

চতুর্থ চরণ হল—অনিঃসৃতগ্রাহী, নিঃসৃতগ্রাহী। এও এক ক্রমযুগল।

এই অনিঃসৃতগ্রাহী এক বিচিত্র ক্ষমতা। এটা মনের এমন অভ্যাস, এমন অবধান, যে তা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য আমি এক কাহিনী বলছি ঃ

এক শ্রেষ্ঠ চিত্রকর রাজসভায় গেলেন। সেখানে দৈবযোগে তিনি রাণীর পায়ের একটি আঙ্গুল দেখতে পেলেন। প্রাচীনকালে রাণীরা 'অসূর্যম্পশ্যা রাজদারা' হতেন, সূর্যও তাঁদের দেখতে পেত না। এখনকার দিনে অন্যরকম—এখন তো সব কিছুই অনাবৃত। যা হোক, চিত্রকর রাণীর পায়ের আঙ্গুল দেখে নিলেন। তারপর তিনি রাণীর এক পূর্ণ প্রতিকৃতি আঁকলেন। তিনি সেই চিত্র রাজার কাছে আনলেন। রাজা দেখলেন—মহারাণীর চিত্র। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপরে ভাল করে চিত্রটি দেখলেন। যেখানে রাণীর দেহে তিল আছে বা জট আছে, চিত্রেও ঠিক সেখানে তিল বা জট আছে। রাণীর দেহের প্রত্যেকটি চিহ্ন চিত্রিত রাণীর দেহেও আছে। চিত্রকর ভেবেছিলেন চিত্রটি দেখে রাজা প্রসন্ন হবেন এবং যথেষ্ট পুরস্কার দেবেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত। রাজা মনে করলেন রাণীর সঙ্গে চিত্রকরের গুপ্ত সম্বন্ধ আছে, নতুবা এমন চিত্র সে কি করে আঁকল। রাজা সন্দিগ্ধ হলেন, তাঁর মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাল। তিনি চিত্রকর ও রাণী উভয়ের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন।

মন্ত্রীর হল দুর্ভাবনা। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর, যাঁকে পাওয়া দেশ বা রাষ্ট্রের সৌভাগ্য—তাঁর মৃত্যুদণ্ড। এ যে মহা অনর্থ। মন্ত্রী রাজার কাছে গিয়ে বললেন—'মহারাজ। আপনি এ কি করছেন? এমন কুশলী চিত্রকরকে বধ করবেন, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন?' রাজা উত্তর দিলেন—'তুমি ঠিক জান না। এ লোক দুষ্ট, দুশ্চরিত্র, অযোগ্য।' মন্ত্রী বললেন—'সত্যিই কিন্তু এমন নয়, মহারাজ।' রাজা বললেন—'কি নির্বোধের মত কথা বলছ? শরীরের কোথায় কোন চিহ্ন আছে তা

শবীব না দেখে কি কবে জানা যায?' তখন মন্ত্রী বললেন—'মহাবাজ। এই চিত্রকবেব অদ্ভুত শক্তি আছে। সে দেহেব যে কোন অবযব দেখে সম্পূর্ণ চিত্র বানাতে পাবে, এই বকম চিত্রই বানাতে পাবে।'

বাজা পবীক্ষা কবে দেখলেন। চিত্রকব পবীক্ষায উত্তীর্ণ হলেন। বাজা তাঁব মৃত্যুদণ্ড বদ কবলেন।

এই হল অনিঃসৃতগ্রাহী। কোন বস্তুব অল্প কিছুকে আশ্রয কবে গোটা বস্তুটিই বিশ্লেষণ কবে দেওযা।

আব এক ঘটনাব কথা বলি।

বোমেব বাদশাহ ভাবতেব বাজাব কাছে কিছু সুবমা পাঠালেন এবং জানালেন যে ঐ সুবমা অতিশয মূল্যবান ও শক্তিশালী। ঐ সুবমা অন্ধত্ব দূব কবে—অন্ধেব চোখে লাগালে সে দৃষ্টিশক্তি ফিবে পায। আসলে বাদশাহ পবীক্ষা কবতে চেযেছিলেন ভাবতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে কিনা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি না থাকে তবে সে দেশ সহজেই জয কবে নেওযা যাবে।

দূত সুবমা নিযে ভাবতে এল। বাজাব কাছে এসে বাদশাহেব সব কথা বলল। বাজা ভাবলেন, সুবমাব পবিমাণ তো খুবই অল্প, এ কাকে দেওযা যাবে? নগবে তো অনেক অন্ধ লোকই আছে। যেটুকু সুবমা আছে তাতে কেবল একজোডা চোখেব দৃষ্টি ফিবতে পাবে। বাজাব তখন নিজেব বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রীব কথা মনে হল। এই মন্ত্রী অতিশয বুদ্ধিমান ও দূবদর্শী ছিলেন। তিনি অন্ধ হযে যাওযায বাজকার্য থেকে নিবৃত্ত হযে ঘবেই সময কাটাচ্ছিলেন। বাজা তাঁকেই ডেকে পাঠালেন। প্রধান মন্ত্রী এলেন। বাজা তাঁকে বললেন, 'এই সুবমা নিন, চোখে লাগান, আবাব দেখতে পাবেন। সুবমা কিন্তু এত অল্প যে তা একবাবই দু চোখে লাগানো যেতে পাবে। একথা মনে বাখবেন।'

প্রধান মন্ত্রী সুবমাব কৌটো নিলেন। তুলিতে সুবমা ভবে এক চোখে লাগালেন। অল্পক্ষণেব মধ্যেই সেই চোখেব জ্যোতি ফিবে এল। এক চোখে দেখতে পেলেন। তখন তিনি আব এক তুলি ভবে সুবমা নিলেন,

কিন্তু তা চোখে না লাগিযে জিহ্বাব ওপব বেখে দিলেন। বাজা বললেন, 'আবে, এ কি কবলেন? আপনি তো কানা হযে থাকবেন, কেবল এক চোখে দেখতে পাবেন। লোকে আপনাকে কানা বলবে। ছিলেন অন্ধ, এবাব হলেন কানা।'

প্রধান মন্ত্রী বললেন—'বাজন্। আমি কানা হব না। স্বযং চক্ষুষ্মান হযে হাজাব হাজাব লোকেব দৃষ্টি ফিবিযে দেব।'

প্রধান মন্ত্রী যে সুবমা জিহ্বাতে লাগিযেছিলেন তা বিশ্লেষণ কবে ফেললেন। বস্তুটি যে কি জানতে পাবলেন। আব দেখতে দেখতে সুবমাব পুবো 'ফর্মুলা' লিখে বাজাকে দিলেন। প্রধান মন্ত্রী বললেন, 'বাজন। এই সুবমাব সব উপাদানই আমি জানতে পেবেছি। এখন আমি এই সুবমা প্রস্তুত কবে হাজাব হাজাব চক্ষুহীনকে চক্ষুষ্মান কবব। যদি আমি সুবমাব দ্বিতীয তুলি আমাব আব এক চোখে লাগাতাম তবে আমাব দুই চোখই দেখতে পেত, কিন্তু তাতে কেবল আমাব একলাবই লাভ হত। এখন আমি আমাব এক চোখেব সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ চোখেব জ্যোতি ফিবিযে আনতে পাবব।'

মন্ত্রী ঘবে গিযে সুবমা প্রস্তুত কবলেন। বোম থেকে আগত দূতকে এক কৌটা সুবমা দিযে বললেন, 'ঘবে ফিবে যাও। তোমাব বাদশাহকে বল, এই বকম সুবমা তিনি যত চান আমাদেব দেশ থেকে চেযে নিতে পাবেন।'

দূত বোমে ফিবে বাদশাহকে সব কথা বলল। বাদশাহ বুঝলেন, যে দেশে এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাস কবে সে দেশ আক্রমণ কবলে পবাজয অবশ্যম্ভাবী।

এই হল অনিঃসৃত গ্রহণ। এটি অদ্ভুত শক্তি। কোন বস্তুব অল্প কিছু অংশকে আশ্রয কবে সম্পূর্ণ বস্তুটি বিশ্লেষণ কবে দেওযা।

এসব কল্পিত কাহিনী নয, কেবল কল্পনা বিলাস নয। এ সব মনেব বিচিত্র ক্ষমতাগুলিব প্রকাশ।

আমি মনেব অবধানেব কিছু কিছু প্রযোগ, মনেব প্রশিক্ষণেব কোন

কোন প্রণালী, আলোচনা করলাম। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারব যে, মনের ক্ষমতা অভ্যাসের দ্বারা, সাধনা দ্বারা বিকশিত করা যায়, আর মনকে পটু করে গড়ে নেওয়া যায়। এ সবই অবধারণের বিবরণ, ধ্যানের বিবরণ নয়। অবধারণের দ্বারাই যখন মনকে এতটা পটু করা যায় তখন ধ্যানের দ্বারা মনের ক্ষমতা কতদূর বিকশিত হতে পারে তা নিজেরই বোধগম্য। আপনারা তা কল্পনা করে নিতে পারেন—আমার বুঝিয়ে দেওয়ার আবশ্যকতা নেই।

অতএব আমাদের সর্বাগ্রে অবধানের অভ্যাস করতে হবে। মনকে কোথায় নিয়োজিত করতে হবে, কেমন করে নিয়োজিত করতে হবে এই সব তথ্য আমাদের ঠিক বুঝে নিতে হবে, যাতে আমাদের চেতনায় ধ্যান করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা আবির্ভূত হয়। অবধারণের পরে সংকেন্দ্রনে মনের ধারণার কথা বুঝতে হবে। যখন এই দুইটি ঠিক বুঝতে পারব, তখন তৃতীয় চরণ, আমাদের চেতনায় ধ্যান করার ক্ষমতা জাগ্রত হবে।

৫

না করার মূল্য

একটি লোক একটি বাগানে ঢুকে দেখল অনেক লম্বা লম্বা গাছ আছে। সে বাগানের মালিকে বলল, 'গাছগুলি বড়ই লম্বা হয়েছে।' মালি বলল, 'বাবুজী, 'গাছের লম্বা হওয়া ছাড়া আর কোন্ কাজ আছে।'

সবার আগে কাজের কথাই আমাদের চিন্তায় আসে। গাছ পর্যন্ত নিষ্কর্মা নয়। কোন পদার্থই কাজ ছাড়া থাকে না। বস্তুর লক্ষণই হল অর্থক্রিয়াকারিত্ব। সেই বস্তুই সত্য, যা নিজের কাজ করতে থাকে, কিছু না কিছু করতে থাকে। যা কিছু করে না তা সৎ নয়, অর্থাৎ তার কোনও অস্তিত্ব নেই, তা পদার্থ নয়। পদার্থের অর্থই হল ক্রিয়াশীল। ক্রিয়াশীলতা পদার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমরা একথা জানি এবং মানি যে, প্রত্যেক লোকেরই কিছু না কিছু করা উচিত। পদার্থেরও কিছু না কিছু করতে হয়। চেতন বা অচেতন উভয়ের মধ্যেই কিছু না কিছু কাজ হতে থাকে। যে লোক কিছু করে তাকে উদ্যোগী, কর্মঠ, কর্মী পুরুষ বলে মানতে হবে একথা আমরা গ্রাহ্য করেছি। যে লোক কিছু করে না তাকে অলস, বেকার, প্রমাদগ্রস্থ এবং অকর্মণ্য বলে আমরা মনে করি। মানুষের কোনও না কোনও কাজে নিরত থাকা উচিত, এই কথার ওপরে আমরা বিশেষ

জোর দিই। যে কিছু করে সে 'আমি কিছু করছি' ভেবে আনন্দ পায়, আবার কখনও কখনও গর্বও অনুভব করে। যে কিছু করে না সে 'আমি কিছু করি না' এই ভেবে হীনমন্যতা অনুভব করে। অন্য লোকেও তাকে উপহাস করে বলে—ও নিষ্কর্মা, কিছুই করে না।

নিষ্কর্মা লোকের এই দুনিয়ায় কোনও স্থান নেই। সর্বদাই কোনও না কোনও কাজে ব্যাপৃত থাকা উচিত। বর্তমান কালের অর্থশাস্ত্রও বলছে, নিষ্কর্মা হয়ে থেকো না। ব্যবসা বা অন্য যে কাজ পাও তাই কর, আর যদি কোন কাজ না মেলে তবে গর্ত খোঁড়, বোঁজাও, আবার গর্ত খোঁড়, আবার গর্ত ভর, তবুও কর্মহীন হয়ে থেকো না। কোনও একটা কাজ করতে থাক। এই ভাবে কাজ করার ওপরে আমরা এতটা জোর দিই যে নৈষ্কর্মের মূল্য আমাদের দৃষ্টি থেকে একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে। নিষ্ক্রিয়তারও তাৎপর্য আছে, একথা আজকাল আমরা আর স্বীকার করি না। বর্তমান যুগ এত প্রবৃত্তিবহুল যে নিবৃত্তির কথা আমাদের বোধগম্য হয় না। নিবৃত্তির এত নিন্দা করা হয়েছে যে তার যে কোনও মূল্য আছে একথা আমরা স্বীকার করতে চাই না। তাকে আমরা মূল্যহীন বানিয়ে দিয়েছি।

প্রবৃত্তির ঘর্ষণ থেকে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। প্রবৃত্তি সংঘাত সৃষ্টি করে, সংঘাত উৎপাদন করে। প্রবৃত্তিকে একাধিকার দেওয়াই বর্তমান কালের সব সংঘর্ষের সবচেয়ে বড় কারণ। বর্তমান কালের অশান্তির মূল কারণ শুধু ক্রিয়াকে মূল্য দেওয়া, অক্রিয়ার মূল্য অনুভব না করা। নৈষ্কর্মের যে একটা বাস্তব মূল্য আছে এ কথা অস্বীকার করা। এটাই আজকাল সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে।

আমি আজ কিছু উল্টোপাল্টা কথা বলব। এই প্রবৃত্তিবহুল যুগে আমারও হয়ত প্রবৃত্তির সমর্থন করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা করব না। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আমাকে কিছু বলতে হবে। শ্রোতাদের হয়ত সে সব কথা ভাল লাগবে না। কিন্তু সত্য গোপন করাও উচিত নয়। সত্য চিরন্তন, অমোঘ। কারণ সত্যকে অস্বীকার করলে তা থেকে নানা

প্রকার সমস্যার উদ্ভব হয় এবং তা মানুষকে আক্রমণ করে। যদি প্রবৃত্তির মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে নিবৃত্তির যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা যায় তা হলে হয়ত নানা সমস্যার আপনা থেকে সমাধান হয়ে যাবে।

নিবৃত্তির মূল্য প্রবৃত্তির চেয়ে কম নয়। অক্রিয়া ক্রিয়ার চেয়ে কম মূল্যবান নয়। যদি এই কথার অর্থ বোধগম্য হয় তাহলে কর্মও খুব অর্থপূর্ণ হতে পারে। কর্মের সাথে সাথে ত্রুটি দোষ আসে। সেগুলি কমে যেতে পারে। গীতাতে সুন্দর একটি কথা বলা হয়েছে—'প্রত্যেক প্রবৃত্তির সাথে দোষ জড়িত আছে। এমন কোনও প্রবৃত্তি নেই যার সঙ্গে কোনও দোষ সংশ্লিষ্ট নয়। যেমন ইন্ধন দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সাথে ধূমের উপস্থিতি অনিবার্য তেমনি প্রবৃত্তির সাথে দোষের সহাবস্থান অনিবার্য। 'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা।' অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত সেই রকম সমস্ত আরম্ভ দোষের দ্বারা আবৃত। এই অনুভব বাস্তবিক, তা সত্য পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রবৃত্তির যখন নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গতি হয় তখন প্রবৃত্তির সহগামী দোষসমূহের সমাপ্তি ঘটতে পারে। প্রবৃত্তি যেন নিবৃত্তির সাথে সাথে চলে। অন্যথায় প্রবৃত্তির দোষ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মানুষের সর্বনাশের কারণ হয়। এই জন্য আমরা যেন নিবৃত্তির মূল্য বুঝি, অক্রিয়ার মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করি এবং নৈষ্কর্মের মহত্বপূর্ণ পরিণাম অনুভব করি।

প্রবৃত্তির সবচেয়ে বড় সাধন যন্ত্র হল এই শরীর। শুরুতে আমি শরীরের প্রবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আজ আমি কিছু বিপরীত আলোচনা করব। আমি প্রবৃত্তির থেকে মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

আপনি কায়োৎসর্গ করুন। কায়াকে বিসর্জন করুন। শরীরকে ত্যাগ করুন। জীবিতাবস্থায় নিজেকে মৃতবৎ অনুভব করুন। শরীরকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট এবং প্রবৃত্তিশূন্য করুন। একেই বলে কায়গুপ্তি বা কায়োৎসর্গ। শরীরকে উৎসর্গ করা, কায়াকে ত্যাগ করা, এ বড়ই কঠিন কাজ। মৃত্যুর পরে প্রত্যেক মানুষই শরীর ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু

জীবিত অবস্থায় শরীরকে ত্যাগ করা বড়ই কঠিন সাধনা। কায়াকে ত্যাগের কথায় মহামুনি গৌতমের মনেও একটি প্রশ্ন জাগল। তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কায়াগুত্তয়াত্র ণং ভন্তে। জীবে কিং জণযই? ভগবন্। কাযগুপ্তি কা পরিণাম ক্যা হৈ।'

কায়গুপ্তিতে জীবের কি লাভ হয়? কায়গুপ্তির পরিণাম কি? তার উত্তরে ভগবান বললেন 'কায়াগুত্তয়াত্র ণং সংবরং জণযই।' কায়গুপ্তি দ্বারা সংবরণ হয়। দুটি কথা আছে— আস্রব এবং সংবর। যার দ্বারা দোষ আমাদের ভেতর প্রবেশ করে তাকে আস্রব বলা হয়। আমাদের ভেতরে কোন দোষ নেই। আমাদের আত্মাতেও কোনও দোষ নেই। ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তার ভেতরে কোনও মলিনতা বা আবিলতা নেই। দরজা এবং জানালা দিয়ে ময়লা ও ধুলো ভেতরে আসতে থাকে। যেখানে এতটুকু ফাঁক আছে সেখান দিয়ে ধুলো ভেতরে ঢুকতে থাকে। ঝড় আসে। তাকে রোধ করা সম্ভব হয় না। কেউ কখনও ঝড়ের গতিরোধ করতে পারে না। এমন কোনও উপায় নেই যার দ্বারা ঝড়-তুফানের দুর্বার প্রবাহকে অচল করে দেওয়া যায়। কোনই উপায় নেই। কেউ কোনও দিন ঝড়-তুফানের গতিরোধ করতে পারে নি। কিন্তু এমন ব্যবস্থা বা উপায় আছে যার দ্বারা ধুলোর ঘরের ভেতরে প্রবেশ করা বন্ধ করা যায়। যদি আমরা দরজা-জানলা সব বন্ধ করে দিই তবে ধুলো ঘরের ভেতরে আসতে পারবে না, বাইরেই থেকে যাবে। আমাদের চেতনায় কোনও আবিলতা নেই। চেতনা শুদ্ধ, নির্মল, স্বচ্ছ। কিন্তু যেমন প্রত্যেক ঘরেরই দরজা জানালা আছে সেই রকম চেতনারও প্রবেশপথ আছে, দরজা জানালা আছে। তাকে আমরা আস্রব বলব। আস্রব কথাটির অর্থ ছিদ্র। সেই ছিদ্রপথে বাইরে থেকে তত্ত্ব আসে, আর তাতে আমাদের চেতনা ভরপুর হয়ে যায়। এই সব তত্ত্ব বিজাতীয়, আগন্তুক। যা বিজাতীয় তা প্রায়শই সঙ্কট সৃষ্টি করে, নানা প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করে। যা স্বাভাবিক, আপনা আপনি ঘটে, তা থেকে বিঘ্নের উদ্ভব হয় না। বিজাতীয় বস্তুতে সর্বদাই বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে।

তাকে অস্বীকাব কবা সম্ভব নয। আমাদেব এমন ব্যবস্থা কবতে হবে যাতে আস্রব না থাকে। চেতনাব দবজা জানালা যেন খোলা না থাকে, কোনও ছিদ্র যেন খোলা না থাকে। সব প্রবেশপথ যেন বন্ধ হযে যায, সুবক্ষিত হয। সংস্কৃত ভাষায ‘গুপ্’ ধাতুব অর্থ ‘বক্ষণ’। ‘গুপ্ত’ কথাটিব অর্থ হবে ‘সুবক্ষিত’। কাযগুপ্তিব অর্থ, শবীবকে সুবক্ষিত কবা। আমবা শবীবকে এমনভাবে সুবক্ষিত কবব যাতে ভেতবে কোনও আগন্তুক বস্তু কোনও অবকাশ বা শূন্যস্থান না পায। বাইবেব কোনও কিছু ভেতবে আসতে না পাবে। কেবল আমবা থাকব, আমাদেব চেতনা থাকবে, এ ছাড়া ভেতবে আব কিছু থাকবে না। এই প্রক্রিযাব নাম ‘সংবব’। ভগবান মহাবীব বলেছেন, ‘যে কাযগুপ্তি কবতে পাবে সে সংবব উৎপন্ন কবে, আস্রবেব পথ রুদ্ধ কবে। যে সংবব উৎপাদন কবে সে নিজেই সংবব হযে যায।’

তিনি এক বিবাট মহত্ত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, বাইবে থেকে যা কিছু নেওযা হয তা নেওয়াব একমাত্র উপায আমাদেব শবীব। মানসিক, বাচনিক বা শ্বাসসংক্রান্ত যে কোন পবমাণু আমাদেব ভেতবে প্রবিষ্ট হোক না কেন তাদেব সবাব জন্য একটিমাত্র আস্রব বা প্রবেশ পথ আছে—সেটি আমাদেব শবীব। শবীবে যদি চঞ্চলতা না থাকে, প্রবৃত্তি না থাকে, সক্রিযতা না থাকে, তবে শবীবেব ভেতবে কোনও কিছুই প্রবেশ কবতে পাবে না। যে সমস্ত পবমাণু শবীবেব ভেতবে প্রবিষ্ট হয সেগুলি শুধু শবীবেব চঞ্চলতার ফলেই প্রবিষ্ট হতে পাবে। শবীবেব চঞ্চলতা নিঃশেষিত কবা, তাব সমাপ্তি ঘটানোব নামই কাযগুপ্তি। শবীবে এমন স্থৈর্য আনতে হবে যাতে দেহ নিজেই ধ্যানে পবিণত হয। আপনাবা ভাববেন না যে কেবল মনেই ধ্যান হয। অনেক যোগাচার্য, অনেক বিদ্বান লোক কেবল মানসিক ক্রিযাকে ধ্যান মনে কবেন। কিন্তু জৈন আচার্যদেব মত অন্য বকম। তাঁবা তিন প্রকাব ধ্যানেব কথা বলেছেন— কাযিক ধ্যান, বাচনিক ধ্যান ও মানসিক ধ্যান। যেমন স্থিব মন ধ্যানে পবিণত হয তেমন স্থিব দেহও ধ্যান

হতে পাবে। শবীবেব স্থিবীকবণও ধ্যান।

ধ্যানেব আক্ষবিক অর্থ—চিন্তা কবা। 'ধ্যৈ' ধাতুব মৌলিক অর্থ চিন্তা কবা। এই ধাতু থেকে 'ধ্যান' শব্দটি নিষ্পন্ন হযেছে। এটি শাব্দিক সংজ্ঞা মাত্র। শব্দেব অর্থেব বিস্তাব হয। সঙ্কোচন হয। শব্দেব অর্থেব যখন বিস্তাব হয তখন শব্দ মূল অর্থেব সঙ্গে বাঁধা থাকে না। 'ধ্যান' এই শব্দও তাব মূল 'চিন্তা কবা' এই অর্থেব সঙ্গে আবদ্ধ থাকে না। তাব অর্থ প্রসাব লাভ কবেছে। এব অর্থ হযেছে স্থিবীকবণ বা স্থিব কবা। ধ্যানেব অর্থ—শবীবকে স্থিব কবা, বচনকে স্থিব কবা, মনকে স্থিব কবা। মন স্থিব হলে মানসিক ধ্যান হয। বচন স্থিব হলে বাচনিক ধ্যান হয। শবীব স্থিব হলে কাযিক ধ্যান হয। কাযিক ধ্যান সব ধ্যানেব মূল। যতক্ষণ কাযিক ধ্যান না হয ততক্ষণ বাচনিক বা মানসিক ধ্যান সম্ভব হয না। শবীবেব স্থিবতা ছাডা শ্বাসেব স্থিবতা হয না, শ্বাসেব স্থিবতা না হলে মনেব স্থিবতা আনা সম্ভব নয। মনকে স্থিব কবতে হলে শ্বাসেব স্থিবতা আনতে হবে, আব শ্বাসকে স্থিব কবতে হলে কাযাব স্থিবতা আনতে হবে। সেই জন্য বলা যেতে পাবে ধ্যানেব আধাবভূত তত্ত্বসমূহেব মধ্যে সবচেযে বড তত্ত্ব কাযাব স্থিবতা, অর্থাৎ কাযোৎসর্গ বা কাযগুপ্তি।

মানসিক ধ্যান পর্যন্ত পৌঁছনো অত্যন্ত কঠিন কাজ, কাযিক ধ্যান পর্যন্ত পৌঁছনো অপেক্ষাকৃত সহজ। সাধকেব পক্ষে সাধনাব প্রাবম্ভিক পথ কাযিক স্থিবতা বা শিথিলীকবণ অভ্যাস কবা। যে লোক কাযিক স্থিবতা অভ্যাস কবেছে সে মানসিক স্থিবতা পর্যন্ত পৌঁছবাব ক্ষমতা প্রাপ্ত হযেছে। যে শবীবেব স্থিবতা সাধন কবতে পাবে না সে মানসিক ধ্যান পর্যন্ত যেতেই পাবে না। সবাব আগে শবীবেব স্থিতি আনা প্রযোজন। তা কবতে পাবলে মস্তিষ্ক অস্থিবতা থেকে মুক্ত থাকবে, তাব কোনও বকম উত্তেজনা থাকবে না। জ্ঞানবাহী স্নাযু সম্পূর্ণ স্থিব হযে যাবে, তাতে আব উত্তেজনা থাকবে না। মাংসপেশীসমূহ শিথিল হযে যাবে, ঢিলে হযে যাবে। দৃঢ মাংসপেশী অববোধ সৃষ্টি কবে, সেইজন্য তাদেব

শিথিল কবা অত্যন্ত আবশ্যক। মেরুদণ্ডেব হাড় শিথিল হওয়া প্রযোজন যাতে তাব ভেতবে কোনও উত্তেজনা না আসে। শবীবেব প্রত্যেক অবযব যেন উত্তেজনা থেকে মুক্ত থাকে, কোনও বকম বক্রতা বা ক্ষোভ না থাকে। এই হল প্রাবম্ভিক সাধনা। সবাব আগে আমাদেব এমন নিপুণতা লাভ কবতে হবে যে আমবা ইচ্ছা কবলেই আমাদেব শবীবকে শিথিল কবতে পাবি। সাধাবণ সাধকেব পক্ষে এই প্রক্রিযা অত্যন্ত উপযোগী। আমি স্বীকাব কবছি যে কিছু লোকেব মানসিক ধ্যানেব ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছবাব ক্ষমতা আসতে পাবে। সবাই ঐ ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছতে পাবে না। যদি কেউ এই ভূমিকা পর্যন্ত যেতে পাবে তবে সেটা তাব পক্ষে অত্যন্ত আনন্দেব বিষয। কিন্তু কাজটা বড়ই কঠিন। শাবীবিক স্থিবতা, কাযিক ধ্যান, কাযোৎসর্গ বা কাযগুপ্তি সকলেব *পক্ষেই* সম্ভব হতে পাবে। যদি এই ভূমি প্রাপ্ত হওযা যায তবে জীবন সফল হবে।

কেউ কেউ মনে কবেন, অবধানেব ভূমিকা যদি বা পাওযা যায, ধ্যানেব ভূমিকা অনেক দূবে। আমি বলতে চাই যে অভ্যাস কবতে কবতে আমবা যদি অবধানেব ভূমি পর্যন্ত পৌঁছতে পাবি তবে তা কি ধ্যানেব ভূমিব দিকেই এগোনো নয? এ কি কম কথা? মনেব যে অবধান চাবদিকে এলোমেলোভাবে ঘুবে বেড়ায তাকে যদি এক বিষযেব ওপবে কেন্দ্রিত কবতে আমবা সফলকাম হই তবে সেটা খুব সামান্য উপলব্ধি বলে মনে কববেন না। ভাবনা পর্যন্ত পৌঁছতে পাবা আবও বড় কথা। আমি বলতে চাই আপনাবা হযতো অবধানেব ভূমিকাতেও পৌঁছবেন না, ভাবনা পর্যন্তও পৌঁছবেন না। কিন্তু আপনাবা যদি কাযোৎসর্গেব ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছতে পাবেন, যদি কাযিক স্থিবতা এবং শিথিলীকবণেব স্থিতি পর্যন্ত আসতে পাবেন তবে আপনি ধ্যান সাধনাব দিকে অগ্রসব হচ্ছেন, সেই দিকেই এগিযে যাচ্ছেন।

আজকালকাব সবচেযে বড় সমস্যা—শাবীবিক উত্তেজনা। বর্তমান যুগ অতিবিক্ত সক্রিযতা এবং দৌড়ঝাঁপেব যুগ। শক্তিক্ষযেব তথা

জীবনীশক্তিব অপব্যযেব সবচেযে বড কাবণ অতিবিক্ত সক্রিযতা। অতিবিক্ত সক্রিযতাব ফলে শ্বাসেব অত্যধিক তীব্রতা এসে যায এবং তাব ফলে অনেক শক্তিব অপচয হয। শবীব স্থিব কবা এবং দীর্ঘ শ্বাস নেওযা এই দুটি কৌশল যদি আজকালকাব লোকে শিখে নেয তাহলে তাবা অনেক কঠিন সঙ্কট থেকে বাঁচতে পাবে। বর্তমান প্রবৃত্তিবহুল যুগেব পক্ষে কাযোৎসর্গ বা কাযগুপ্তি মহৌষধেব কাজ কবতে পাবে। এব দ্বাবা লোকে বহু কঠিন সঙ্কট থেকে আত্মবক্ষা কবতে পাবে। প্রবৃত্তিবহুলতা এবং অতিব্যস্ততাব ফলে মানুষ অনেক বকম মানসিক বিকৃতি ও শাবীবিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। ঐ সব বোগ থেকে বাঁচাব একমাত্র উপায শবীবকে স্থিব কবা, শিথিল কবা। এ মস্ত বড উপলব্ধি। শান্ত শ্বাস এবং শান্ত শবীব, সাধনাব দুটি মহত্ত্বপূর্ণ উপায। এই কথাকে খুবই মহৎ তত্ত্ব বলে স্বীকাব কবতেই হবে। শাবীবিক মূল্যেব দিক থেকে আমি এই তত্ত্বেব আলোচনা কবলাম। এব আধ্যাত্মিক মূল্যও কম নয।

সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপন কবা হযেছে—কে কর্মেব ক্ষয কবতে পাবে? আমাদেব সঞ্চিত সংস্কাব কি কবে নিঃশেষে ক্ষয পেতে পাবে? এই প্রশ্নেব উত্তবে বলা হযেছে—

ন কম্মুণা কম্ম খবেংতিবালা
অকম্মুণা কম্ম খবেংতি ধীবা।

অর্থাৎ কর্মেব দ্বাবা কর্মক্ষয হয না। জ্ঞানীগণ অকর্মেব দ্বাবা কর্ম ক্ষয কবেন।

অজ্ঞানী লোক মনে কবে তাবা প্রবৃত্তিব দ্বাবা প্রবৃত্তিব ক্ষয কববে, সংস্কাব দ্বাবা সংস্কাব নষ্ট কববে। তাবা ভ্রান্ত, অজ্ঞান, তমসাচ্ছন্ন। তাবা সত্যকে জানে, কিন্তু বাস্তবিকতাকে জানে না। প্রবৃত্তি দ্বাবা প্রবৃত্তিকে নিঃশেষ কবা যায না, সংস্কাব দ্বাবা সংস্কাবেব সমাপ্তি ঘটানো যায না। মাঝে মাঝেই প্রবৃত্তিব পুনবাবৃত্তি হয। প্রবৃত্তি অনেক সমযেই গোপন থেকে যায। প্রত্যেক প্রবৃত্তি সংস্কাব চালনা কবে। ঐ

সংস্কার অন্য প্রবৃত্তির আশ্রয় নেওয়ার প্ররোচনা দেয়। আমরা অপর প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করলে সেই প্রবৃত্তি তার সংস্কার চালনা করে। সেই সংস্কার তৃতীয় প্রবৃত্তির প্রেরণা দেয়। এই রকম চক্রাকারে প্রবৃত্তি ও সংস্কার চলতে থাকে। তার কোনও শেষ নেই। প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তির চক্রব্যূহ ভেদ করা যায় না। এই প্রবৃত্তির পালা অন্তহীন ভাবে প্রলম্বিত শৃঙ্খল। কেউ তাকে অতিক্রম করতে পারে না, তার শেষের নাগাল পায় না। তাহলে এই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, এই প্রবৃত্তির পালাকে কি ভাবে ভেঙ্গে দেওয়া যায়। এই সব সংস্কারের কি করে সমাপ্তি ঘটানো যায়? যে সব সংস্কার আমাদের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংলগ্ন করে রেখেছি, একের পর এক যে সব সংস্কার নির্মিত হচ্ছে, আর যা বহু বিভিন্ন প্রবৃত্তির প্রেরণাদাতা, তাদের কি করে নির্মূল করা সম্ভব হতে পারে? তার উত্তরে বলা হয়েছে, 'অকর্ম্মুণা কর্ম্ম খয়েন্তি ধীরা।' যে জ্ঞানী, যার সত্যের বোধ হয়েছে, অন্ধকার ভেদ করে যে আলোতে পৌঁছেছে, যার বাস্তবিকতার বোধ এসেছে, সে জানে অকর্মের দ্বারা কর্মকে ক্ষীণ করা যায়। অকর্ম অর্থাৎ নিবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তির সমাপ্তি ঘটানো যায়।

প্রবৃত্তির অবসান হলে পুরানো সংস্কার জেগে থাকলেও তার বৃদ্ধি বা পুনরাবৃত্তি হয় না, ফলে সংস্কার শিথিল হয়ে যায়। আবার জাগলে যদি তার পুনরাচরণ না হয় তবে তা আরও শিথিল হয়ে যায়। সংস্কার মাথা উঁচু করলে যদি তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তবে তার বিলোপ হয়, বিনাশ হয়।

অতিথি এসেছে। তার সংস্কার করা হয়েছে। সে যদি আবার আসে এবং সে যদি আবার আতিথ্য পায় তো সে আবার আসবে। সে মনে করবে—এ তো বেশ ভাল ব্যাপার, আতিথ্যও মিলছে, পরিচর্যাও মিলছে। সে আসতেই থাকবে।

অতিথি এল। সে সৎকার পেল না। সে উপবাসে রইল। যদি সে নির্লজ্জ বেহায়া হয় তবে দ্বিতীয়বার আসবে। আবার উপেক্ষা পেলে আর তৃতীয়বার আসবে না। সে ভাবে—যেখানে শুধু তিরস্কার পাওয়া

যায় সেখানে কেন যাব? সে আর যায় না।

এই হল প্রবৃত্তির রীতি। সংস্কার জেগে উঠলে তার যদি থাকার জায়গা মেলে তবে তা জমতে আরম্ভ করবে। সে আর তখন অতিথি থাকতে চায় না, পরিবারের সদস্য হতে চায়। তখন তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে। যে সংস্কার এসেছে তার যদি থাকার জায়গা না মেলে, যদি সে শুধু উপেক্ষা পায়, তবে তার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। তিরস্কৃত হলে সংস্কার ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে যায়। একবার তিরস্কার কটু বলে অনুভূত হয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও যদি একই অনুভূতি হয় তবে সেই সংস্কার আর আসতে পারে না, তা ক্ষীণ হয়ে যাবে, বিনাশপ্রাপ্ত হবে। এ রকম হতে হতে অবশেষে সংস্কার শেষ হয়ে যাবে। সে আর পরিবারের সভ্য হতে পারে না, আবার অতিথির ভূমিকা নিয়েও ঘরে প্রবেশ করতে পারে না।

এই জন্যই বলা হয়েছে—'অকম্মণা কম্ম খরেন্তি ধীরা।' যে লোক গম্ভীর, যার ধৃতি ও ধৈর্য আছে, যে ঘটনাকাণ্ডে ভীত হয় না, বিচলিত হয় না, যা ঘটে তা জানে, দেখে, কিন্তু বিচলিত হয় না, সে অকর্ম দ্বারা, অপ্রবৃত্তি দ্বারা কর্মকে ক্ষীণ করে। সে সংস্কারকে নিঃশেষ করে, বিলীন করে।

অকর্ম দ্বারা কর্মকে ক্ষীণ করার, নিবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তিকে ক্ষীণ করার, তথা নিবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তির দোষসমূহ ক্ষীণ করার তত্ত্ব আজকাল আমাদের কাছে গৌণ এবং অনেক দূরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল একটা রব উঠেছে, 'কর', 'কর', আরও 'কর'। তার পরিণাম হিসেবে আজকালকার লোক শারীরিক ক্লান্তি, স্নায়বিক শ্রান্তি এবং মানসিক অবসাদে পীড়িত হচ্ছে। এই সমস্ত অবসাদ বা ক্লান্তি থেকে বিরক্তি, চিত্তবিক্ষেপ, অসহিষ্ণুতা, বিভ্রান্তি, আকুলতা, ব্যাকুলতা, লোভ প্রভৃতি নানা প্রকার দোষ সমুদ্ভূত হয়। তার পরিণাম কোথাও লড়াই, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও সংঘর্ষ, কোথাও বিরোধ, কোথাও বা বিবাদ। সবাইকে এ সব অপ্রিয় পরিণাম ভোগ করতে হচ্ছে। এত দুঃখ, এত

ক্লেশ সত্ত্বেও কেন আমরা এই বিষয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করি না ?

উদ্যোগপতিরা এবং রাজনীতির নেতারা বারবার প্রগতির কথা বলতে ক্লান্তি বোধ করেন না। তাঁরা সদা সর্বদা প্রগতির কথা বলে চলেছেন। প্রগতির জন্যই প্রবৃত্তি অনিবার্য। ভৌতিক প্রগতি বা পদার্থতান্ত্রিক প্রগতির জন্য প্রয়োজন বিরামবিহীন কঠোর পরিশ্রম, আর নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি। প্রগতির জন্যই প্রবৃত্তি অনিবার্য হয়েছে। এ কথা সত্য, কিন্তু এর পরিণামের কথা যেন আমরা ভাবি। পরিণাম বিবেচনা করলে আমরা জানতে পারব যে নিরঙ্কুশ ঔদ্যোগিক এবং ভৌতিক প্রগতি মানুষকে অন্য আর এক দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষ শুধু এলোমেলো ভাবে ঘুরে মরে। পরিণাম সুখকর হয় না। মানুষ নিজেই প্রবৃত্তির গ্রাস হয়ে পড়েছে, প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। আধুনিক রাজনীতির নেতারা এবং উদ্যোগপতিরা যদি আপন আপন স্বার্থকে গৌণ করতে পারে এবং এই তথ্য বুঝতে পারে যে প্রবৃত্তিকে সীমাবদ্ধ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্তির যে মূল্যায়ন করা উচিত, আমি স্বীকার করি যে তাহলে মানুষের চেতনা ঠিক দিকে প্রবাহিত হতে থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং সত্যের দিকে বিকশিত হবে।

আজকালকার সংঘর্ষ চেতনা ও পদার্থের সংঘর্ষ। বর্তমান কালে পদার্থই প্রধান হয়ে পড়েছে। পদার্থের আবরণে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা না হয়ে চেতনার বিকশিত হওয়া এবং পদার্থের চেতনার অনুগামী হওয়া উচিত। যদি তা নাও হয় তবে অন্তত তাদের একটা ভারসাম্য নিয়ে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আজকাল সব বিপরীত ঘটনা ঘটছে। সমস্ত বিশ্ব আজ তার দুঃখময় পরিণাম ভোগ করছে।

এই জন্য আমাদের কায়গুপ্তির মূল্য বোঝা প্রয়োজন। তার মূল্য অতি মহৎ। সাধনারও মূল্য অনেক মহৎ।

লোকে শিবিরে আসে দশ, বিশ কিংবা খুব বেশি হলে ত্রিশ দিনের জন্য। তারা মনে করে তারা নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছে। কোনও কাজ

করতে হচ্ছে না। বিনা কাজে সময় কেটে যাচ্ছে। শিবির আলস্য শিক্ষা দিচ্ছে, এই রকম অনুভব হয়। যে বহু কাজ করতে অভ্যস্ত এবং প্রবৃত্তিতে অতিশয় বিশ্বাসী, তার মনে হবে শিবিরে নিতান্ত কর্মহীন ভাবে দিন কাটাচ্ছে। এতে অলস লোকের সমাজ তৈরি হবে। আমি বুঝি, ঐ চিন্তা যথার্থ নয়। ঐ রকম চিন্তা করা উচিত নয়। আমরা তো প্রবৃত্তিময় জীবন যাপন করছি। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন নিবৃত্তি কি তা বোঝা, নিবৃত্তির মূল্য নিরূপণ করা এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে একটা ভারসাম্য স্থাপন করা। এই অভিমুখে যদি আমাদের গতি হয় তবে শিবিরের মস্ত বড় সার্থকতা হবে। যদি শিবিরে অকর্মের বাস্তবিক অভ্যাস হয়ে থাকে এবং তার যথার্থতার মূল্য আমরা বুঝতে পেরে থাকি তবে আমি মনে করব শিবিরের বিরাট সার্থকতা লাভ হয়েছে, ব্যর্থতার অনুভূতি আসবে না। অকর্মের ক্ষণেই আমাদের জীবনের বিকাশ হয়। যে লোক সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকে তার পক্ষে এই জ্ঞান যথেষ্ট উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যদিও শারীরিক দৃষ্টিতে প্রবৃত্তির এই ব্যবস্থা যে, লোকে দিনের বেলায় জেগে থাকবে এবং রাতে ঘুমোবে, যতটা কাজ করবে ততটা বিশ্রাম করবে, লোকে এই নিয়মও লঙ্ঘন করছে। যে সময়টা নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট সেটাও তারা কেড়ে নিচ্ছে। আগেকার দিনে যারা এই নিয়ম লঙ্ঘন করত তাদের নিশাচর বলত। নিশাচরের অর্থ রাক্ষস। তারা রাত্রিকালে পরিভ্রমণ করে। আজকালকার মানুষ সেই নিশাচরে পরিণত হয়েছে। তারা রাতে খাওয়াদাওয়া করে, রাতে কাজ করে, রাতে যাতায়াত করে। জীবনযাত্রার ধারা একেবারে উলটে গিয়েছে। কিন্তু শারীরিক এবং স্নায়বিক ব্যবস্থার তথা আপেক্ষিক বিশ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং নিবৃত্তিজাত প্রবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা এ কথা অস্বীকার করতে পারব না যে প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির, কর্মের সঙ্গে অকর্মের সামঞ্জস্য হওয়া প্রয়োজন। কর্মের পরিমাণ এত হওয়া উচিত নয় যে তাতে অকর্ম লোপ পেয়ে যাবে। কর্মের বোঝ এত গুরুভার না হয় যে তাতে মানবচেতনা একেবারে

আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আচারাঙ্গ সূত্রে বলা হয়েছে—'অকম্মে জানই।' যে অকর্মা সেই জানবে, দেখবে। আপনারা হয়ত পড়েছেন যে বৈজ্ঞানিকদের গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধিগুলি তাঁদের নিশ্চিন্ত এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থানের সময়ে হয়। খুব কম লোকের কাজ করতে করতে মহত্ত্বপূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে। যে লোকের ইনটুইশন অর্থাৎ আন্তরিক বোধ তথা আন্তরিক শক্তি বিকশিত হয়েছে, কোনও মহৎ তত্ত্বের অনুভূতি হয়েছে, তার সেই উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে চিন্তাশূন্য এবং নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান-কালে। নিষ্ক্রিয়তা নিজেই একটি মহৎ উপলব্ধি। নিষ্ক্রিয়তার অর্থ, বাইরে কর্মহীনতা আর ভেতরে সক্রিয়তা। নিষ্ক্রিয়তার অর্থ আলস্য নয়। কোন লোক বাইরে সক্রিয় এবং ভেতরে নিষ্ক্রিয় হতে পারে। আবার, অন্য কোনও লোক বাইরে নিষ্ক্রিয় এবং ভেতরে সক্রিয় হতে পারে। যারা চেতনার জগতে সক্রিয় কিন্তু বাইরের জগতে নিষ্ক্রিয়, তাদের আমরা অলস মনে করে থাকি। এটা আমাদের মস্ত বড় ভুল। যে লোক বাইরেও নিষ্ক্রিয় ভেতরেও নিষ্ক্রিয়, সেই লোকই প্রকৃতপক্ষে আলস্যপরায়ণ। সে লোক মূর্চ্ছাগ্রস্ত, মোহগ্রস্ত, প্রমাদগ্রস্ত। সেই ব্যক্তি অকর্মণ্য, আলস্যপরায়ণ। কিন্তু যে ব্যক্তি বাইরে নিষ্ক্রিয় থেকে থেকে অন্তরে চেতনার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, যার ভেতরে আগুন নিরন্তর জ্বলছে, চেতনার বহ্নিশিখা যার ভেতরে দেদীপ্যমান, সে ব্যক্তি অকর্মণ্য এবং অলস নয়। পরন্তু সে লোক সক্রিয়, সে এক অতি মহৎ শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে ব্যস্ত। পদার্থজগতেও ঐ শক্তির উপযোগিতা অনেক।

গীতায় বলা হয়েছে—

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্ত কৃৎস্ন কর্মকৃৎ॥

যে কর্মের ভেতরে অকর্ম দেখে এবং অকর্মের ভেতরে কর্ম দেখে, সে যোগী পুরুষ, সে-ই সম্পূর্ণ কর্ম করতে সমর্থ।

আমরা অকর্মের ভেতরে কর্ম দেখার তত্ত্ব ভুলে গিয়েছি। অকর্মের

অন্তরে মহৎ কর্ম হয়ে থাকে। অকর্ম থেকে সম্ভূত কর্ম বাস্তবে অনেক বেশি নির্দোষ কর্ম। কর্ম থেকে উদ্ভূত কর্মে সমূহ দোষ থাকে। অকর্মের এই মহত্ত্ব আমরা বুঝতে পারি। কায়াগুপ্তি, কায়া শিথিলীকরণ, কায়াবিসর্জন—এ সব যেন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি। আজ আমি বিধির আলোচনা করব না। বিধি প্রয়োগের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে। প্রয়োগের দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত কিভাবে সমস্ত শরীর স্থির করা যায় সে বিষয়ে চর্চা করা যায়। শরীর এতটা স্থির করা সম্ভব যে তাতে চপলতা থাকবে না, প্রকম্পন থাকবে না, সমস্ত শরীর স্থিরতা লাভ করবে। স্থিরতার জন্য যদি একবার মানসিক উত্তেজনা উৎপন্ন করা প্রয়োজন হয় তবে তাই করুন। এতে শিথিলীকরণ অনেক তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে।

আপনি মাটির ওপরে শুয়ে পা ছড়িয়ে দিন, হাত ওপর দিকে তুলুন, যতই পারেন হাত পায়ের দিকে টান করুন। একবার এইভাবে শরীর টান করতে পারলে পরম স্থিরত্ব অনুভূত হবে। শরীরের টান অবস্থা শিথিল করে দিন, শরীর সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে যাবে। শিথিলীকরণের এই এক প্রক্রিয়া।

শিথিলীকরণের অন্য একটি প্রক্রিয়া আছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গে সঙ্কল্প করুন যে, সে অঙ্গ শিথিল হোক। আবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এই সঙ্কল্পের পুনরাবৃত্তি করুন। শরীর শিথিল হয়ে যাবে। কেবলমাত্র শুলেই শরীর শিথিল হয় না। সঙ্কল্প করতে হবে, শরীরকে প্রেরণা দিতে হবে। এই হল শিথিলীকরণের দ্বিতীয় বিধি বা প্রক্রিয়া।

সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে শিথিলীকরণের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। এর মূল্য অনেক। আমি চাই প্রত্যেক সাধক সে মূল্য অনুভব করুন।

৬

মৌনতার মূল্য

কথা বলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। কথা বলার কি মূল্য তা আমরা ভালভাবেই জানি। আমাদের সমস্ত ব্যবহার, অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান, কথার মাধ্যমেই চলে। কিন্তু কথা না বলারও একটি নিজস্ব মূল্য আছে। ভাষণের যতটা মূল্য, অ-ভাষণের মূল্য ততটাই, বরং সম্ভবস্থলে বাক-সংযমের মূল্য বেশি। ঐ মূল্য আমাদের বুঝতে হবে। যে প্রাণী বিকশিত হয়ে ওঠে তার কথা বলার ওপরে নির্ভর করতে হয় না। দেবতাদের পর্যাপ্তি পঞ্চবিধ। তার মধ্যে ভাষাপর্যাপ্তি এবং মনপর্যাপ্তি নামে দু রকম হলেও প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। সাধারণ মানুষের, সাধারণ প্রাণীর পর্যাপ্তি ছয়, কিন্তু দেবতাদের পর্যাপ্তি পাঁচ। একথা স্বীকার করা হয় যে চক্রবর্তীদের পর্যাপ্তি পাঁচ। যে মনের দ্বারা নিজের কথা বলে তার কথা বলার প্রয়োজন হয় না। যখন আমরা আমাদের কথা মনের দ্বারা বলতে পারি না তখন এবং সেই জন্য আমাদের কথা বলার দরকার পড়ে। যখন আমরা মন দ্বারা ভাষণ বুঝতে পারি না তখন আমাদের কথা বলে আলাপ করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি মনের দ্বারা ভাষণ সম্ভব হয় তখন ভাষা ব্যর্থ বা নিরর্থক হয়ে যায়। তার আর কোনও সার্থকতা থাকে না। তখন

ভাষণেব ওপবে নির্ভব কবতে হয না। মানুষ যেমন যেমন জ্ঞানেব ভূমিব দিকে অগ্রসব হবে তেমন তেমন ভাষণেব ওপবে নির্ভব কমে যাবে। তবুও এবকম প্রশ্ন ওঠে, তীর্থঙ্কব কথা বলেন কেন? কেবল জ্ঞানী কেন কথা বলেন? তাঁবা যখন কৃতকৃত্য হযেছেন, যখন তাঁদেব সমস্ত কার্য সম্পন্ন হযে গিযেছে, যখন তাঁদেব সব কিছুতে সিদ্ধি হযেছে, তখন তাঁদেব কথা বলাব প্রযোজন কি? কেন তাঁবা কথা বলেন? কেন বাক্যালাপ কবেন, কেন ধর্মবিষযে ভাষণ দেন, কেন উপদেশ-কথা বলেন? তাঁদেব তো কথা বলাব, উপদেশ দেবাব কোনও প্রযোজন নেই। প্রাচীন ব্যাখ্যাকাববা এই প্রশ্নেব উত্তব দিতে গিযে বলেছেন তীর্থঙ্কব তথা কেবলী কৃতকৃত্য। তাঁদেব কথা বলাব কোনও প্রযোজন নেই। কিন্তু তীর্থঙ্কব শাস্ত্রবিহিত কর্মেব উদযস্বৰূপ, সেই জন্য তাঁবা কথা বলেন। তাঁবা নিজস্ব ভঙ্গিতে যথার্থ চিন্তা কবেছেন আব সমাধানেব এই ভাষা প্রস্তুত কবেছেন। এব অন্য বকম সমাধানও হতে পাবে। সে হল এই—জ্ঞানী লোকেবও অজ্ঞানী লোকেব জন্য কথা বলাব প্রযোজন হয। যখন কোনও লোকেব পবম জ্ঞানেব উপলব্ধি হয় তখন তিনি পবম-জ্ঞানীতে পবিণত হন। তাঁদেব মনে এক করুণা জাগে যে তাঁবা যা জেনেছেন, যা দেখেছেন, যা অনুভব কবেছেন তা অন্যেবও লাভ হোক। তাঁদেব মনে পবম করুণা, পবম অনুকম্পা, পবম সৌহার্দ্য আব মৈত্রীব ভাবনা জাগে। ঐ ভাব থেকে যাবা পবম বসেব আস্বাদ পায নি, পবম জ্ঞান প্রাপ্ত হয নি তাদেব তাঁবা এমন কিছু বলতে চান যা তাবা জানে না। তাঁবা এক ইশাবা কবতে চান, এক ইঙ্গিত কবতে চান, আব কিছু দিতে চান। তাঁবা করুণাপববশ হযে বাণী দিযে থাকেন। যদি দুই কেবলজ্ঞানী মিলিত হন তাঁদেব কথা বলাব প্রযোজন হয না। তাঁদেব মধ্যে বাক্যেব বিনিময হয না। তাঁদেব আত্মাব সঙ্গে আত্মাব আলাপ হয। সেখানে ভাষা নিবর্থক, তাব কোনও উপযোগিতা নেই। দুই বিশিষ্ট জ্ঞানীব সাক্ষাৎ হলে তাঁদেব বাক্যবিনিমযেব কোনও প্রযোজন হয না। যদি একজন জ্ঞানী

এবং আর একজন অজ্ঞানী হয় তবে কথা বলার কিছুটা প্রয়োজন হয়। দুই জ্ঞানীর মিলন হলে কথাবার্তার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কথা বলবেন না। ইনিও মূক, উনিও মূক। দুজনে বোবার মত একে অন্যের দিকে চেয়ে থাকেন, কেউ কথা বলেন না।

এক ঘটনা ঘটেছিল। ফরীদ বহু শিষ্যসহ পদযাত্রা করেন। যখন তিনি কাশীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বলল, খুব সুন্দর সুযোগ মিলেছে। পাশেই কবীরের আশ্রম। সেখানে চলুন এবং দুদিন বিশ্রাম করুন। বিশ্রামও হবে এবং দুই জ্ঞানী পুরুষের মধ্যে আলাপও হবে। আমরা জানার, বিশেষতঃ শোনার, সুযোগ পাব। শিষ্যরা ফরীদকে অনুরোধ করল। ফরীদও অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন।

এদিকে কবীরের শিষ্যরা সংবাদ পেল যে ফরীদ কাশীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সাথে শিষ্যরাও আছে। তাদের মনেও ভাবনা জাগল। তারা কবীরকে বলল, 'ফরীদ এই দিক দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা তাঁকে এখানে আটকাই। আপনাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হবে। দুই জ্ঞানী লোকের সাক্ষাৎ হবে। কবীর এবং ফরীদ পরস্পরের সাথে মিলিত হবেন। দুজনে জ্ঞানী পুরুষ। খুব জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্তা হবে। আমাদের শোনার এবং জানার সুযোগ মিলবে। খুব ভাল হবে।' কবীর বললেন, 'খুব ভাল কথা।' কবীর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে চললেন। ফরীদও আসছিলেন। তাঁদের দেখা হতে দুজনে দুজনের গলা জড়িয়ে ধরলেন। কবীর ফরীদকে থাকতে বললেন। ফরীদ তাঁর অনুরোধ মেনে নিলেন। তাঁরা দুজনে এলেন। আশ্রমে রইলেন। আশ্রম কবীরের। সেখানে কবীর এবং ফরীদ দুজনেই রইলেন। তাঁদের শিষ্যরাও ছিল। দুজনেরই শিষ্যরা খুব উৎকণ্ঠিত বোধ করছিলেন। এক দিকে ফরীদ এবং তাঁর শিষ্যরা বসেছিলেন। আর একদিকে সশিষ্য কবীর বসেছিলেন। সব শিষ্যই দুজনের কথাবার্তা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে ছিল। শিষ্যরা ভাবছিল কে আগে কথা বলবেন—কবীর, না ফরীদ। সবাই বসে প্রতীক্ষা

করতে লাগল। এক ঘণ্টা গেল, দু ঘণ্টা গেল। সবাই মৌন। দুই জ্ঞানীও মৌন। কবীর ফরীদের এবং ফরীদ কবীরের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। দু জনের চোখে চোখে মিলন হচ্ছিল। কিন্তু তাঁদের মুখের তালা খোলে নি। মৌন, মৌন, কেবল মৌন। কেউ কথা বলছেন না। না কবীর কথা বলছেন, না ফরীদ কথা বলছেন। শিষ্যরা প্রতীক্ষা করে ধোঁকা খেয়ে গেল। এই ভাবে সময় চলে যেতে লাগল, প্রতীক্ষার কাল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল, সবাই প্রতীক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এই ভাবে প্রতীক্ষার কাল বেড়ে চলল, আর সবার মনে গভীর আকাঙ্ক্ষা আর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হল। প্রতি ক্ষণ তাদের অতি দীর্ঘ মনে হতে লাগল। এক এক ক্ষণ এক এক ঘণ্টার মত দীর্ঘ বোধ হল। সব শিষ্য প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত এবং বিরক্ত হল। তারা ভাবতে লাগল— ফরীদ কি বোবা, না কবীরই বোবা। দুজনেই নীরব। দুজনের কেউই কথা বলছেন না। শেষ পর্যন্ত কি হল? আরও কিছুটা সময় কেটে গেল। তার পরে কবীর উঠে দাঁড়ালেন। ফরীদও উঠলেন। দুজনেই সেখান থেকে চলে গেলেন। নিজ নিজ কাজে রত হলেন। ভোজনের সময় এল। ভোজন করলেন। বিশ্রাম করলেন। মধ্যাহ্নে দুজনে আবার মিলিত হলেন। তাঁরা দুজনে বসে রইলেন, আর একে অন্যের দিকে চেয়ে রইলেন। দুজনের চোখে চোখে মিলন হল, দুজনে মৌন। শিষ্যরা প্রতীক্ষা করে রইল। পুরো দিন কেটে গেল। সূর্যাস্ত হল। সভা শেষ হল। শিষ্যরা ভাবল, হয়তো তাঁরা রাতে কথা বলবেন। রাতে আবার তাঁরা একত্র হলেন। আবার সেই নীরবতার পালা। শিষ্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আবার দিন এল। সারা দিন গেল। শুধু নীরবতা। কোনও কথাবার্তা নেই। রাতে দেখা, তবুও কোন কথা নেই। শিষ্যদের মন বিরক্তিতে ভরে গেল। তৃতীয় দিন এল। ফরীদ চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কবীর তাঁকে এগিয়ে দিতে সাথে সাথে চললেন। দুজনেই নীরবে চলতে লাগলেন। অবশেষে দুজনের ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় এল। দুজনে দুজনের গলা জড়িয়ে

ধবলেন। ফবীদ এগিযে গেলেন। কবীব নিজেব আশ্রমে ফিবে এলেন। আশ্রমে পৌছে শিষ্যবা কবীবকে বলল, 'এ কেমন ব্যাপাব ? আমাদেব শুধু ধোঁকা দিলেন কেন ? আপনাবা কেউ কথা বলবেন না, এ কথা আমাদেব আগে বলতে পাবতেন। আমবা তাহলে এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা কবতাম না। আমবা আটচল্লিশ ঘণ্টা প্রতীক্ষা কবেছি। আমাদেব কি গভীব উৎকণ্ঠা হযেছিল। আকাঙ্ক্ষা হযেছিল, ভাবনা হযেছিল। আমবা ভেবেছিলাম—দুই জ্ঞানী মিলবেন। এক কবীব, আব এক ফবীদ। দুজনেব কথাবার্তা হবে। আমবা শুনব, আমাদেব জ্ঞান বাড়বে।'

কবীব বললেন—কাব সঙ্গে বাক্যালাপ কবব ? কাব সঙ্গে কথা বলব ? ফবীদ সামনে বসে ছিলেন। ফবীদ এত জ্ঞানী যে মনেব কথা বুঝতে পাবেন, তাঁব সামনে কথা বলে কি নিজেব অজ্ঞতা প্রকাশ কবব ? কথা বললে শুধু নিজেব অজ্ঞতা প্রকাশ পেত। আমি কাব সঙ্গে কথা বলব ? তোমবাই বল। আমাব সামনে যদি কোনও অজ্ঞানী লোক বসে থাকত তবে অবশ্যই তাব সঙ্গে কথা বলতাম। কিন্তু তিনি তো মহাজ্ঞানী, তাঁব সঙ্গে কি কথা বলব ? তিনি আমাব মনেব সমস্ত কথাই জানতে পেবেছেন।

ফবীদেব শিষ্যবাও ফবীদকে ঐ প্রশ্ন কবেছিল এবং তিনিও তাদেব ঐ উত্তবই দিযেছিলেন। আমি কাব সঙ্গে কথা বলব ? কবীবেব মত জ্ঞানী ব্যক্তি সামনে ছিলেন, তিনি আমাব মনেব সমস্ত কথা জেনেছিলেন। তাব পবে আমি আব কি বলব ? আমি যা বলতে চেযেছিলাম সে সব কিছুই তিনি জানতে পেবেছিলেন। ঐ বকম পবিস্থিতিতে তাঁব সামনে আমি কিছু বললে শুধু নিজেব মূর্খতাই প্রকাশ কবতাম। আমাব সামনে কথা বলাব কোনও প্রশ্নই ছিল না। যেখানে সামনে অজ্ঞানী উপস্থিত থাকে সেখানেই কথা বলাব দবকাব হয। দুজনেই যদি অজ্ঞানী হয তবে তাদেব কথা কখনই শেষ হয না। দীর্ঘকাল বাক্যালাপ হয। দুই পণ্ডিতেব সাক্ষাৎ হলে শাস্ত্রার্থ আলোচনা কখনও শেষ হয না। বিবাদ

কখনও সমাপ্ত হয় না। এই রকম পরিস্থিতির কথা মনে রেখে ভগবান মহাবীর বলেছেন—যদি কোন পণ্ডিত, কোনও অর্থশাস্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাকে বোঝাও, আবার বোঝাও। যদি বোঝাবার পরেও সে স্বীকার না করে তবে বাকগুপ্তি কর, বচন গোপন কর, অর্থাৎ মৌনাবলম্বন কর। একেবারে মৌন হয়ে যাও। সেটিই সবচেয়ে সুন্দর সমাধান।

বাদশাহ বীরবলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'মুর্খের পাল্লায় পড়লে কি করা উচিত?' বীরবল বলেছিলেন—'জাঁহাপনা, মৌন হয়ে যাওয়া উচিত। মৌন থাকাই সবচেয়ে ভাল সমাধান।' বিবাদ শেষ করার এর চেয়ে ভাল উপায় আর হতে পারে না।

মহাবীরও বলেছেন, যদি কোনও পণ্ডিত বা ভাষাশাস্ত্রী উপস্থিত হয় এবং কেবল তর্কের কথা বলে বিবাদ বাড়াতে চায়, শাস্ত্রার্থ করতে চায় তবে মৌন হয়ে যাও, বাকগুপ্তি কর। ঐ তার সমাধান বটে।

দুই জ্ঞানী মিলিত হলে তাঁরা বাক্যালাপ করেন না। যেখানে এক জন অতিশয় জ্ঞানী আর একজন তাঁর চেয়ে কম জ্ঞানী, সেখানে ভাষার প্রয়োগ হয়। যেখানে দুজনেই জ্ঞানী, দুজনেই সমান বোদ্ধা, সেখানে ভাষার প্রয়োগ নিরর্থক।

মৌন থাকার এই বড় সুবিধে যে তাতে আমাদের জ্ঞান বাড়ে। যখন ভাষার ব্যবহার কম হবে তখন আমাদের জ্ঞান বাড়বে। যত বেশি ভাষার প্রয়োগ হবে, আমরা যত বেশি কথা বলব ততই আমাদের অন্তর্জ্ঞানে বাধা ঘটবে। চঞ্চলতা বাধা সৃষ্টি করে। ভাষার প্রথম কাজ চঞ্চলতা সৃষ্টি করা। পূজ্যপাদ লিখেছেন—জনেভ্যো বাক্ ততঃ স্পন্দঃ—যখন সম্পর্ক হয় তখনই বাক্য আসে। একলা একলা তো কোনও কথাবার্তা হয় না। একাকী কেউ কথা বলে না। একলা থাকলে কথা বলার কোনও প্রয়োজন থাকে না। দ্বিতীয় কেউ থাকলে সম্পর্ক হয় এবং বাক্যালাপ হয়। আর, কথার পরে আসে চঞ্চলতা। কথা বলার আগেও চঞ্চলতা, আর পরেও চঞ্চলতা। আমাদের কথা বলতে হলে সবার আগে আমাদের মনকে চঞ্চল করতে হয়। মনকে চঞ্চল না করলে

কোনও লোক কথা বলতে পারে না। লোকে কোনও কিছু বলতে চাইলে প্রথমে চিন্তা করে, তার পরে বলে। বলার মতলব থাকলে প্রথমে মনকে চঞ্চল কর, তারপরে বল। বলার আগে চঞ্চলতা, আবার পরেও চঞ্চলতা। কথা বলা নিজেই চঞ্চলতা বিশেষ। বলার পরে ঐ বিষয়ে আবার যে চিন্তা হতে থাকে তা স্বয়ং চঞ্চলতা উৎপাদন করে। ভাষণের আগে চাঞ্চল্য, ভাষণের সময়ে চাঞ্চল্য। ভাষণের পরেও চাঞ্চল্য। এ সমস্তই চঞ্চলতার ব্যবহার, আর এই ব্যবহার অন্তর্জ্ঞানের পথে বাধা উপস্থিত করে। যে লোক অন্তর্জ্ঞানের সঠিক মর্ম বোঝেন তিনি খুবই কম কথা বলে থাকেন। তিনি বেশির ভাগ সময় মৌন থাকেন।

ভগবান মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—'ভগবন, বচনের গুপ্তি অর্থাৎ মৌন দ্বারা লোকে কি পায়?' ভগবান উত্তরে বলেছিলেন যে বচনগুপ্তি থেকে মানুষ নির্বিচারতা প্রাপ্ত হয়। 'নিব্যিযারত্তং' কথাটি প্রাকৃত ভাষার শব্দ। সংস্কৃতে তার দুটি রূপ হতে পারে—নির্বিচারত্ব বা নির্বিকারত্ব অর্থাৎ নির্বিচারতা বা নির্বিকারতা। বচনগুপ্তি দ্বারা নির্বিচারতা বা নির্বিকারতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিকৃতির অর্থ পরিণতি। নির্বিকৃতির অর্থ স্থিরতা, যার কোনও পরিণতি নেই। স্থিরতা স্থায়ী। ভাষা থেকে যে বিকৃতি সম্ভূত হয় তার সমাপ্তি আছে।

বচনগুপ্তির এক পরিণাম—নির্বিচারতা। আমরা এই জন্য চিন্তা করি যে আমরা বলব, অন্য লোককে বলব। আমাদের মনে যখন বলার কথা আসে তখন আমরা চিন্তা করি। যখন আমরা মৌন থাকি তখন নির্বিচারতার স্থিতি উৎপন্ন হয়। বচনগুপ্তি থেকে মহৎ লাভ নির্বিচারতা। অভাষণের মূল্য নির্বিচারতা। সেখানে বিচারের স্থিতির শেষ।

ভাষা ব্যবহার না করার আর একটি মূল্য—বিবাদমুক্তি। বিবাদ থেকে ছুটি মিলে যায়। মৌন হয়ে যাও, বিবাদ আপনা থেকে শেষ হয়ে যাবে। হামেশাই কথা বলার ফলে বিবাদ তথা লড়াই হয়। যখন একজন বলতে থাকে তখন অপর জন যদি মৌন থাকে তবে বিবাদ সমাপ্ত হয়ে যায়। 'অতৃণে পতিতো বহ্নিঃ স্বয়মেব বিনশ্যতি।' আগুন

জ্বলছে। তার ইন্ধন স্বরূপ ঘাস না মিললে, ভোজন না মিললে সে নিবে যাবে, আর জ্বলবে না। সেই রকম দুই ব্যক্তি যদি কথা বলে চলে তবে লড়াইয়ের আগুন লকলক করে জ্বলে ওঠে, নেবে না, শান্ত হয না। লড়াইয়ের আগুনের ইন্ধন মিলে যায়, খাদ্য মিলে যায়, আর আগুন জ্বলতেই থাকে। যখন একজন কথা বলে তখন আর একজন যদি চুপ করে থাকে, কোনও কথা না বলে তাহলে আগুনের খাদ্য মেলে না, ফলে তা আপনা থেকে শান্ত হয়ে যায়, নিবে যায়। মৌনের দ্বিতীয় লাভ—বিবাদমুক্তি।

মৌনের তৃতীয় লাভ—অহংমুক্তি। কথা না বললে অহঙ্কার শেষ হয়ে যায়। কথায় অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়। 'আমি বেশ বলেছি'—এ অহঙ্কার। 'ভাষার উপরে আমার প্রভুত্ব আছে'—এও অহঙ্কার। এতে অহং উৎসাহিত হয়। ভাষার জ্ঞান যতটা হয় ততটাই অহং বোধ বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই ভগবান মহাবীর বলেছেন, 'ন চিন্তা তাযযে ভাসা কযো বিজ্জাণুসাসনং'—ভাষা আমাদের ত্রাণ করে না। নানা প্রকার ভাষা ত্রাণস্বরূপ হয় না। আমি সংস্কৃত জানি, হিন্দি জানি, প্রাকৃত জানি—এই রকম ভাবে ভাষার অহঙ্কার বেড়ে যায়। ভাষা বাক্যের মাধ্যম, বিচার ব্যক্ত করার মাধ্যম, তা আমাদের অহঙ্কারের মাধ্যমে পরিণত হয়।

স্বামী রামতীর্থ আমেরিকা গিয়েছিলেন। আমেরিকার রাষ্ট্রাধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'স্বামীজি, আপনি নিজেকে বাদশাহ বলে থাকেন, এ কেন করেন? আপনার তো কিছুই নেই। যা আছে তা সামান্য। তবে আপনি বাদশাহ কিভাবে হলেন তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' রামতীর্থ বলেছিলেন—'আমার কিছু নেই বলেই তো আমি বাদশাহ। যে বস্তুকে আঁকড়ে ধরে সে তো গরীব। যে গরীব সে সব কিছু সংগ্রহ করতে চায়, সব কিছু সঞ্চয় করতে চায়। আমি গরীব নই, আমি বাদশাহ। আমার কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই। সারা দুনিয়া আমার। আমি

কেন সংগ্রহ কবব, কেন সঞ্চয কবব, কোথায সঞ্চয কবব ? সাবা দুনিযা তো আমাব। গবীব সংগ্রহ কবাব চেষ্টা কবে। আপনাবা সবাই সংগ্রাহকেব দল, আপনাবা সবাই তো গবীব। আমিই প্রকৃত বাদশাহ, যে কিছুই সংগ্রহ কবে না বা সঞ্চয কবে না। আমাব কিছুই নেই, এই জন্য আমি বাদশাহ।'

বস্তুত এই কথা অতিশয তাৎপর্যপূর্ণ। তা বাষ্ট্রাধ্যক্ষেব মনে বোধ জাগিযেছিল। একজন অকিঞ্চন লোকেব কথা কার্যকব হতে দেখে সন্ন্যাসীও সন্তোষ লাভ কবেছিলেন। তিনি ভাবতে ফিবে এলেন। তিনি ভাবলেন—আমি যা কিছু বলেছি, যা কিছু অনুভব কবেছি তা ভাবতেব লোকদেবও বলব। ভাবতে তিনি কাশীধামই বেছে নিলেন, কাবণ কাশী পণ্ডিতদেব নগব। পণ্ডিতবা তাঁব ঐ কথা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হবে, বেশি গুরুত্ব দেবে। তিনি কাশী এলেন। সভা আযোজিত হল। বহু লোক এল। বড বড পণ্ডিত, দিগ্‌গজ বিদ্বান লোক এলেন। বামতীর্থ তাঁব অভিজ্ঞতাব কথা শোনালেন। সে কথা শোনাব পবে এক বিদ্বান উঠে বললেন—'মহাবাজ! আপনি কি সংস্কৃত জানেন?' বামতীর্থ উত্তব দিলেন, 'আমি সংস্কৃত জানি না।' তখন সেই পণ্ডিত বললেন, 'তবে আপনি জ্ঞানেব কথা কি বলছেন? যে সংস্কৃত জানে না সে ব্রহ্মজ্ঞানেব কথা কি বুঝবে। সে আবাব ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কি আলোচনা কববে, কেমন কবেই বা কববে? সে লোকেব ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা কবাব অধিকাব নেই।'

আলোচনা সেখানেই শেষ হযে গেল, মনে হল সংস্কৃত যেন ব্রহ্মজ্ঞান অধিকাব কবে নিযেছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে অন্য ভাষাবও অধিকাব আছে। যে ব্রহ্মজ্ঞান আত্মাব নির্মলতা, পবিত্রতা তথা বিশুদ্ধি থেকে উদ্ভূত হয, যে ব্রহ্মজ্ঞান অন্তঃকবণেব পবিত্রতা থেকে সঞ্জাত, তাকে ভাষায বন্দী কবা হযেছে, এ কত বিডম্বনা। যে সংস্কৃত জানে সে-ই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকাবী। যে সংস্কৃত জানে না সে ব্রহ্মজ্ঞানেব অধিকাব প্রাপ্ত হয না। অন্তবেব জ্ঞান, আত্মাব সহজভাবে উৎপন্ন জ্ঞানকে

-ভাষাব বাঁধনে বেঁধে আমবা অহংকে বর্ধিত কবাব বাস্তা প্রস্তুত কবেছি। এই জন্যই ভগবান মহাবীব বলেছেন—'ন চিত্তা তাযযে ভাসা।' নানা প্রকাব ভাষা আপনাকে মুক্তি দিতে সক্ষম হবে না, দুঃখ থেকে ত্রাণ কবতে পাবে না, আত্মিক জ্ঞান উৎপন্ন কবতে সমর্থ হবে না। 'কযো বিজ্জাণুসাসনং'। এই বিদ্যাব অনুশাসন, যা সমস্ত হয বচনেব মাধ্যমে, ভাষাব মাধ্যমে, তা আপনাকে সুবক্ষিত কবতে পাবে না। আপনাব নিজেব সুবক্ষা আপনাব জ্ঞানে, আপনাব নিজেব মধ্যেই নিহিত আছে। ঐ জ্ঞান কথাব দ্বাবা পাওযা যায না, কিন্তু অভাষণেব দ্বাবা অবশ্যই পাওযা যায। ঐ জ্ঞানেব কথা নিজেব বলাব প্রযোজন নাই, কোনও ভাষাবও প্রযোজন নাই।

দুনিযাতে অনেক আত্মজ্ঞানী লোক এসেছেন। ইংবেজি, ফবাসী, তথা হিন্দি ভাষা জানা লোকও আত্মজ্ঞানী হযেছেন। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত জানা লোকও আত্মজ্ঞান লাভ কবেছেন। এ ছাড়া কোনও ভাষাই ভালভাবে জানেন না বা বুঝতে পাবেন না, এমন লোকও আত্মজ্ঞানী হযেছেন। আবাব এমন লোকও আত্মজ্ঞানী হযেছেন যিনি নিজেব বিচাব ভাষায প্রকাশ কবতে পাবেন না, ভাষণ দিতে জানেন না, নিজেব কথাও সম্পূর্ণ বলতে পাবেন না। ভাষাব সঙ্গে আত্মজ্ঞানেব কোনও সম্বন্ধ নেই। ভাষা বাইবে থেকে আসে, আব আত্মজ্ঞানেব স্রোত ভেতব থেকে প্রবাহিত হয। ভাষা কথা বলাব একটি উপায বা যন্ত্র মাত্র, ব্যবহাবেব মাধ্যম মাত্র। সেই ভাষাকেও আমবা অহঙ্কাবেব সাধনযন্ত্রে পবিণত কবেছি। আমি বুঝতে পাবি না—বলা থেকে একটা মস্ত বড লাভ হয। সেটা অহংমুক্তি বটে। অহঙ্কাব থেকে আমবা মুক্ত হযে যেতে পাবি, ছাডা পেতে পাবি, আব যাব মাধ্যমে অহঙ্কাব এত বর্ধিত হয তা থেকে বেঁচে যেতে পাবি।

আমি একথা মানি সাধাবণ মানুষেব কথাব প্রযোজন আছে, কথা ছাডা তাব ব্যবহাব চলতে পাবে না। বাক্যেব ব্যবহাব ছাডা তাব জীবনচর্যা অচল হযে যেতে পাবে। বলতেই হয, এ এক বকম কথা।

আব বলা আবশ্যক, বলাকে আমবা অনিবার্য বলে মেনে নিযেছি, বলাতে আমবা প্রাথমিকতা আবোপ কবেছি, এ সব অন্য বকম কথা। এই দু বকম কথাব মধ্যে অনেক তফাৎ। কেননা যখন বলাকে আমবা প্রাথমিকতাব গুরুত্ব দিই, তাকে অনিবার্য বলে মেনে নিই, তখন আমাদেব মানসিক ক্ষমতা কমে যায, ক্ষীণ হযে যায। যে কথা মনেব দ্বাবা বলা যায সে কথা বলতে আমবা অসমর্থ হযে পডি। মনেব শক্তিব বড অন্তবায এসে যায।

আধুনিক প্যাবাসাইকোলজিস্টবা টেলিপ্যাথিব প্রযোগ কবছেন। টেলিপ্যাথিব অর্থ বিচাবসংপ্রেষণ। একটি লোক হাজাব ক্রোশ দূবে আছে। তাব সঙ্গে কথা বলতে হবে। কি ভাবে তা সম্ভব হতে পাবে? আজ তো টেলিফোন এবং বেতাব যন্ত্র হযেছে। ঘবে বসে লোকে হাজাব ক্রোশ দূবে থাকা নিজেব লোকেব সঙ্গে কথা বলছে। প্রাচীনকালে এসব যন্ত্র ছিল না, তখন লোকে দূবে অবস্থিত মানুষেব সঙ্গে কথা বলত কি কবে? তাবা টেলিপ্যাথি বা বিচাব-সংপ্রেষণ দ্বাবা আলাপ কবত। প্রাচীনকালে টেলিপ্যাথি বলে কোনও কথা ছিল না। ঐ কথাটি ইংবেজি কথা। সে সমযে প্রচলিত শব্দ ছিল বিচাব-সংপ্রেষণ। তাব অর্থ—এক জাযগায বসে নিজেব বিচাব হাজাব ক্রোশ দূবে প্রেষণ কবা। যথা—এক যোগী ছিলেন। তাঁব শিষ্য পাঁচ হাজাব মাইল দূবে ছিল। যোগী তাকে কিছু বলতে চেযেছিলেন, তাব সঙ্গে আলাপ কবতে চেযেছিলেন। এখন তিনি কি কবে বাক্যালাপ কবলেন? তখনকাব দিনে আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। কিন্তু তখন বিচাব-সংপ্রেষণেব সাধনা কবা হত। এই সাধনায সুদক্ষ ব্যক্তি ধ্যান মুদ্রায স্থিত হযে আপন বিচাবেব তবঙ্গ অভীষ্ট স্থানে সংপ্রেষিত কবতেন। বিচাবেব তবঙ্গ শক্তিশালী হযে যে সুদূব স্থানে সাধক তাঁব চেতনা পৌঁছতে চান সেখানে পৌঁছে যেত। সেখানে কোনও ব্যক্তিব মস্তিষ্ক চেতনা-প্রাপকেব কাজ কবত। সেই ব্যক্তি সেই বিচাব তবঙ্গকে ধাবণ কবত আব তাব মাধ্যমে জানতে পাবত

কে কি কথা বলছে। আবাব যদি তাব উত্তব দেওযাব প্রযোজন হতো তবে সে নিজে ধ্যানস্থ হযে যেত এবং ধ্যানযোগে বিচাবতবঙ্গ গুরু বা ইষ্ট ব্যক্তিকে পৌছে দিত। এই ভাবে বিচাব জানানো হতো। এই ছিল বাক্যালাপ কবাব পদ্ধতি। এই ছিল বিচাব সংপ্রেষণেব মাধ্যম, আব তাব জন্যই মানসিক ক্ষমতাব বিকাশেব প্রযোজন হতো। সাধকবা মানসিক ক্ষমতা বাড়ানোব চেষ্টা কবতেন।

আমবা অতিবিক্ত কথা বলাব অভ্যাস কবে ফেলে মানসিক ক্ষমতাকে ক্ষীণ কবে ফেলি, হাবিযে ফেলি। আজকাল মানসিক ক্ষমতা বিকশিত কবাব কোনও চেষ্টা নেই। তাবও দুটি কাবণ আছে। এক কাবণ, আমবা বলাকেই প্রাথমিক অধিকাব বা প্রাধান্য দিযেছি। পত্র দ্বাবাও আমবা কিছু কিছু বলাব কাজ কবে থাকি। আজকাল নানা বকম যন্ত্রপাতি বা কর্মসাধনোপায উদ্ভাবিত হযেছে, তাব ফলে মানসিক ক্ষমতাব কোনও প্রযোজন অনুভূত হয না। যখন আমাদেব মানসিক ক্ষমতাব ওপবে বিশ্বাস নষ্ট হযে যায তখন আমবা ভাষা-প্রযোগেব প্রযোজন অনুভব কবি। যদি আমবা কথা না বলে আমাদেব মানসিক ক্ষমতা বিকশিত কবি তবে এ বকম হওযা সম্ভব যে, না বলা কথা আমবা বুঝতে পাবব। 'গুবোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশযাঃ।' যে গুরুব আত্মশক্তি প্রবল তিনি মৌন ভাবে সমাসীন থাকেন। নানা প্রকাব সন্দেহ নিযে শিষ্যবা আসে। গুরুব পাশে বসে, গুরুব সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয। তাব সমস্ত সংশযেব নিবসন হযে যায, তাদেব সমাধান হযে যায। তাবা আপনা-আপনি তাদেব প্রশ্নগুলিব উত্তব পেযে যায। কাবণ কি? তখন মনেব ভাষা চলতে থাকে। মন নিজেব কাজ কবে, সন্দেহ মিটে যায। কাজ সমাপ্ত হয়ে যায। দিগম্ববগণ বলেন, তীর্থঙ্কব কথা বলেন না, শ্বেতাম্ববগণ বলেন যে তীর্থঙ্কব কথা বলেন। আমি শাস্ত্রীয আলোচনাব মধ্যে যাব না। দিগম্ববগণ বলেন—তীর্থঙ্কব কথা বলেন না। কেবল ধ্বনি নির্গত হয। আমাব এ কথা বৈজ্ঞানিক মনে হয। এ কথা বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত।

তাঁরা কথা বলেন না, কিন্তু যা বলতে চান সে সব কিছু সবার কাছে পৌঁছে যায়। সেখানে কেবল ধ্বনি হয়, কিন্তু কোন ভাষার প্রয়োগ হয় না। কিন্তু যত লোক সেখানে উপস্থিত থাকে তারা ঐ ধ্বনি আপন আপন ভাষায় বুঝে নেয়। শ্বেতাম্বররা বলেন, তীর্থঙ্কর এক ভাষায় কথা বলেন। যে হিন্দি জানে সে হিন্দিতে সে কথা বোঝে, যে সংস্কৃত জানে সে সংস্কৃত ভাষায় বোঝে, যে প্রাকৃত ভাষা জানে সে প্রাকৃত ভাষায় বোঝে। যে হিন্দি জানে সে বোঝে তিনি হিন্দিতে কথা বলছেন, সংস্কৃতজ্ঞ মনে করেন তিনি সংস্কৃতে কথা বলছেন, আবার প্রাকৃতজ্ঞ মনে করেন, তিনি প্রাকৃত ভাষায় কথা বলছেন। মানুষ বোঝে তিনি মানুষের ভাষায় কথা বলছেন, পশুরা ভাবে তিনি পশুর ভাষায় কথা বলছেন। তাঁর ধ্বনি ও বাণী মানুষ বুঝতে পারে, পশুও বুঝতে পারে, আবার দেবতারাও বুঝতে পারেন। এ কেমন করে সম্ভব হয়? সেখানে কি কোন অনুবাদক বসে থাকে? না, কোনও অনুবাদক থাকে না। এটা স্বাভাবিক পরিণতি। একে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, তা ধ্বনি মাত্র এবং ঐ ধ্বনির বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তর হয়। আর শ্রোতারা তা নিজ নিজ ভাষায় গ্রহণ করে। বক্তার কথা বলার কোন প্রয়োজন হয় না। তিনি যা বলতে চান তা ঐ ধ্বনির মাধ্যমে বলেন। মনোবর্গনার পুদ্‌গল এত শক্তিশালী হয় যে তা বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে নিজের কাজ করে।

ভাষা প্রয়োগ না করার আরও একটি মূল্যের কথা আমি বলব। তা হল আমাদের অনির্বচনীয়তার সিদ্ধান্ত। ভারতের প্রায় সমস্ত দর্শন শাস্ত্রেই এই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। বেদান্তে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম অনির্বচনীয়। ব্রহ্মকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তার কোনও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বৌদ্ধ দর্শনে অনির্বচনীয়তার বহুল প্রয়োগ হয়েছে। বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—পরলোক কি? বুদ্ধ বলেছিলেন—অনির্বচনীয়, তাকে কথায় প্রকাশ করা যায় না। আত্মা কি? পুনর্জন্ম আছে, কি নেই? বুদ্ধ বলেছেন—অনির্বচনীয়, তাকে

ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কথায় প্রকাশ করা যায় না। যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়েছিল সবার উত্তরেই তিনি বলেছিলেন, অনির্বচনীয়। তিনি বলেছিলেন ঐ সব বিষয়কে কথায় ব্যাখ্যা করা যায় না। মহাবীর বলেছেন—পূর্ণ সত্য অব্যক্ত, কথায় তাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, কেননা বস্তু অনন্তধর্মা। বস্তুতে অনন্ত ধর্ম আছে। আমরা কি করে অনন্ত ধর্মের কথা বলতে সক্ষম হব? আমরা আপন ভাষায় এক ক্ষণে এক ধর্মের প্রতিপাদন করতে পারি। শেষ পর্যন্ত অনন্ত ধর্ম চাপা পড়ে। এই পরিস্থিতিতে আমরা অনন্ত ধর্ম কি করে প্রতিপাদন করতে সমর্থ হব? সেজন্য বলা হয়েছে, বস্তু অবক্তব্য অর্থাৎ ভাষার অতীত। সমস্ত বস্তুর স্বরূপ কথায় প্রকাশ করা যায় না। এক ধর্মের কথা বলা সম্ভব। অনন্ত ধর্ম অনির্বচনীয়। অনন্ত সত্য অবক্তব্য। অখণ্ড সত্য অবক্তব্য। সম্পূর্ণ সত্য অবক্তব্য। এ বেশ ভাল হয়েছে। আমরা ভ্রান্তিতে বা অসত্যেও আবদ্ধ হই না। অনন্তধর্মা বস্তুকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরাও তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। আর যখন তাঁরা ভাষা প্রয়োগ করেন তখন এক ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। কেবলজ্ঞানীই বল, সর্বজ্ঞই বল, পরমাত্মাই বল, যা কিছু বল, তাঁরা পূর্ণকে জানেন, কিন্তু তাঁরা যা কিছু বলেন তা অপূর্ণ হয়ে যায়। তাঁরা অপূর্ণ কথা বলবেন। আমরা আবার সে কথা আরও খণ্ড খণ্ড করে বলব। তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করে বিতরণ করব। আমরা একটি কথা গ্রহণ করব, আর আগ্রহ শুরু হয়ে যাবে। তার ফল এই দাঁড়াবে: আমরা যা জেনেছি তাকে আমরা সত্য বলব, আর তোমরা যা বলবে তাকে অসত্য বলব। এই ভাবে সত্য এবং অসত্যের ঝটাপটি শুরু হয়ে যায়। বিবাদ আরম্ভ হয়। তর্কাতর্কি শুরু হয়। এই পরস্পরের মত খণ্ডন এবং পরস্পর দূষণে কোনও কিছু বস্তু থাকে না। বিবাদেরও কোনও তাৎপর্য থাকে না। যে যা বলে সে শুধু আংশিক তত্ত্ব। আমরা অংশকে পূর্ণ বলে মেনে নিই। আর এই অংশকে সত্য বলে মেনে নেওয়া থেকে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। বাক্‌যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সিদ্ধান্তের লড়াই শুরু হয়ে

যায়। লড়াইয়ের একমাত্র কারণ অপূর্ণকে ভাষায় প্রকাশ করা উচিত নয়, কিন্তু আমরা তাই করে থাকি। যদি লোকে মৌন থাকে, শব্দও থেমে যায়, জ্ঞানীও মৌন থাকেন, এবং বলেন, আমি পূর্ণকে জেনেছি, কিন্তু তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না, তাহলে লড়াই থেমে যায়। কিন্তু ঐসব জ্ঞানী লোক অনুকম্পাবশত অল্প কিছু বলেন। সম্পূর্ণ বলা তাঁদের সম্ভব হয় না। তাঁরা অল্প যা কিছু বলেন তার জন্য লড়াই আরম্ভ হয়ে যায়। তাঁরা যদি পুরো বলতেন তবে লড়াই হতো না।

পাঁচটি শিশু আছে, পাঁচটি লাড্ডু আছে। সবাইকে একটি একটি করে লাড্ডু দেওয়া হল। সবাই সমান ভাগ পেল। কোনও লড়াই হবে না। পাঁচটি শিশু আছে, আর একটি লাড্ডু আছে। আপনি লাড্ডুটি টুকরো টুকরো করে সবাইকে এক একটি টুকরো দিলেন। লড়াই শুরু হয়ে যাবে। শিশুরা বলতে আরম্ভ করবে—ওকে বেশি দিয়েছেন, আমাকে কম দিয়েছেন। ওকে অনেক দিয়েছেন, আমি অতটা পাই নি। যেখানে ভাগ অনেক, আর বিভাজ্য বস্তু কম, সেখানে বিবাদ হয়, লড়াই হয়।

সেই রকম আমাদের আগ্রহ অনন্তকে জানার, সম্পূর্ণ সত্যকে জানার, অখণ্ড সত্যকে জানার। তা আমরা পুরোপুরি পাই না। আমরা জানতে পারি ছোট একটি অংশ, অনন্তের এক খণ্ড। আমরা ঐ খণ্ডকে আয়ত্ত করে, তাকে পেয়ে, অখণ্ডের জন্য লড়াই করতে শুরু করি। ঐ লড়াই কখনও শেষ হয় না। লোকে যদি কথা না বলে তবে ভাল হয়। অন্তত তারা যদি সত্য সম্বন্ধে কোনও কথা না বলে, কেবল ব্যবহারের সম্পূর্তির জন্য কথা বলে, তবে লড়াই হতে পারে না। সত্যের সম্বন্ধে কিছু না বলাই অসত্য থেকে রক্ষা পাবার সবচেয়ে ভাল উপায়। কিন্তু এ রকম হতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনুকম্পা করেন, দয়া করেন যাতে অজ্ঞ লোক সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে না পারলেও অন্তত অল্প কিছু জানুক। এই অনুকম্পা ভাব হয়ে পড়ে, কারণ সেটাই বিবাদের পথ খুলে দেয়। আজকাল পরিস্থিতি এ রকম

দাঁড়িয়েছে যে লোকে সত্যকে জানুক বা না জানুক, তারা সত্যের জন্য বিবাদ করতে প্রস্তুত হয়।

কথা না বলার একটি মহৎ উপকারিতা—সত্যকে সুরক্ষিত করা। কথা না বললে সত্য সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হয়। অবক্তব্য, অনির্বচনীয় অব্যাকৃত—এই কথাগুলি সত্যকে সুরক্ষিত করে। এক জন বলে, 'অস্তি' অর্থাৎ আছে। আর একজন বলে, 'নাস্তি' অর্থাৎ নেই। দুই কথারই দুটি দিক আছে। বিবাদের পরিস্থিতি এসে যায়। মহাবীর বলেছেন, 'যে অস্তি বলে সেও ঠিক বলে না, আর যে নাস্তি বলে সেও ঠিক বলে না।' দুজনের কথাই ঠিক হতে পারে যদি দুজনেই আপন আপন বক্তব্যের সঙ্গে অপেক্ষা যোগ করে দেয় আর বলে যে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হয় আর অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হয় না। স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি। যখন স্যাদস্তি বললেও কাজ হয় না আবার স্যান্নাস্তি বললেও কাজ হয় না। তখন স্যাদ্ অবক্তব্য বলা হয়। আমরা যেন একথা মেনে চলি যে সত্যের সম্পূর্ণ সত্যের স্বরূপ কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সত্যের প্রকৃতি এরকম, সত্যের স্বভাব এরকম, এ কথা বলা চলে না। আমরা যা করছি সেটি সত্যের অংশ মাত্র। এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে, আমরা আমাদের দৃষ্ট অংশ মাত্র সত্য ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে অখণ্ড সত্যের প্রতি কখনও কখনও অন্যায় করে বসি। এ কথা মানা প্রয়োজন, তুমি শুধু বলবে যে পূর্ণ সত্যকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তা বোবার কণ্ঠস্বরের মত গূঢ় অপ্রকাশ্য। তার স্বাদ অবর্ণনীয়।

আমি এই বুঝি যে ভাষা প্রয়োগ না করা, মৌন থাকা সত্যের সুরক্ষার সবচেয়ে সুদৃঢ় এবং প্রবল উপায়। আমি মৌনের মূল্যই কিছুটা বর্ণনা করলাম। আমরা যেন মৌনের মূল্য বুঝি, যেন শুধু ভাষা প্রয়োগের মূল্যই না বুঝি। না বলারও যে মহৎ মূল্য আছে সেটা অনুভব করি, এবং বলা ও না বলার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করি। ভাষাপ্রয়োগবর্জন সন্নিহিত মহত্ত্ব বোঝার সঙ্গে সঙ্গে

যেন বাক্‌গুপ্তির তাৎপর্যও অনুভব করি। এই দুটি দিক সমভাবে বুঝতে পারলে এই সাধনার মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং নিজের আন্তরিক জ্ঞানকে প্রকটিত করা সম্ভব হবে।

৭

চিন্তাশূন্যতার মূল্য

জলাশযেব ধাবে গিযে কলসী ভবতি কবে জল নিযে আসে এমন বহু লোক পাওযা সম্ভব। নদী বা পুকুবেব পাডে গিযে তাবা যত খুশি জল নিযে আসে। কিন্তু নদীব গভীবে ডুব দিতে পাবে এমন লোক খুবই কম পাওযা যায। পুকুব বা সাগবেব গভীবতায ডুব দিতে পাবে এমন লোকেব সংখ্যা খুব কম। তীবে দাঁডিযে থাকাব লোকই মেলে অনেক বেশি।

চিন্তাব ঘডা হাতে এমন লোক বহু পাওযা যায। তাবা চেতনাব সামান্য পবিমাণ অংশ পেযেছে, এবং চিন্তা কবে, দেখে ও জেনে তা মনেব আধাবে সঞ্চয কবেছে। কিন্তু চেতনা-রূপ সমুদ্রে অবগাহনকাবী লোক মেলে খুবই কম। কাবও ডুব দেবাব সাহস হয না। তাদেব ভয হয পাছে তাবা তলিযে যায। ডুব দিতে বা তলদেশে নেমে যেতে তাদেব সাহসে কুলায না। কেউ সে সাহসই কবে না। যেখানে অনন্ত গভীবতা সেখানে যেতে তাবা ভয পায। আত্মাব অন্তহীন গভীবতায তথা অখণ্ড চেতনা-রূপ সাগবে ডুব দিতে সাহস কবে এমন লোক খুব কমই আছে। কিন্তু এ কথা নিছক সত্য যে তাতে ডুব না দিলে বাঞ্ছিত বস্তু পাওযা যায না। যে লোক সমুদ্রেব তীবে দাঁডিযে থাকে

সে পাড়ে বা আশপাশে যা পড়ে থাকে তাই পায়। নদী বা পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে অল্পবিস্তর জল পেতে পারে। সাগরতীরে যে দাঁড়িয়ে থাকে সে হয়তো কিছু ঝিনুক পেতে পারে, কিন্তু তার গভীরতর কোনও অনুভূতি সম্ভবপর নয়। সমুদ্রের তলদেশে যে সব মণিমুক্তা পড়ে আছে ডুব না দিলে তা পাওয়া যায় না। যার ডুব দেবার সাহস আছে, গভীর তলদেশে যাবার ধৈর্য আছে সে সত্যিসত্যিই কিছু না কিছু পেয়েছে। আমরা চিন্তার অর্থ বুঝি, চিন্তার কি মূল্য তাও বুঝি, আর চিন্তার ঘড়া হাতে নিয়ে নিজের কাজে চালিয়ে যাই। আমরা এক সীমা বেঁধে নিয়েছি যে যা কিছু সেই কলসীতে ধরে তাই সব কিছু। তারপরেও যে কিছু থাকতে পারে সে কথা আমাদের কল্পনাতেই আসে না। প্রকৃতপক্ষে কল্পনা করা সম্ভবও নয়। যে মানুষ সীমার ভেতরে আবদ্ধ সে অসীমের নাগাল পায় না। সীমাই সীমা বেঁধে দেয় এবং অসীমের দিকে যেতে দেয় না। আমাদের বুদ্ধির এক সীমা আছে, তথা মনেরও এক সীমা আছে। কাজেই তারা আমাদের অসীমের দিকে নিয়ে যেতেপারে না। মনের দ্বারা যা জানা গিয়েছে, বুদ্ধির দ্বারা আমরা শুধু তাই জানতে পারি। যা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা গিয়েছে তাই মন দিয়ে জানতে পারি। যা স্থূল, ইন্দ্রিয় শুধু তাই জানতে পারে। শব্দ, রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ এই সব স্থূল বস্তুকে ইন্দ্রিয় জানতে পারে। এই সমস্ত বস্তুর আধারে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আধারে মন কিছুটা এগিয়ে যায়। ঐ সমস্ত কাঁচা মাল বা র-মেটিরিয়াল নিয়ে ইন্দ্রিয় কিছু কিছু তৈরি করে, বুদ্ধি তাতে কিছুটা সংযোগ করে, আর বিবেকও কিছুটা করে এবং নির্ণয়ও করে। এইখানেই আমাদের সীমানা সমাপ্ত, আমাদের গ্রহণ করার সীমানা সমাপ্ত। এই সব জ্ঞান কোন মতেই কোরা জ্ঞান নয়। আমরা কখন 'কোরা' জ্ঞান লাভ করতে পারি? 'কোরা' জ্ঞান কি করে লাভ করতে হয় তা আমরা জানিই না, কেননা, ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধির সীমার মধ্যে বিশুদ্ধ বলে কোন বস্তুই নেই। সব কিছুই মিশাল, সব কিছুই ভেজাল। যখনই কোন কিছু তাদের আওতায়

আসে অমনি মিশ্রণ শুরু হয়ে যায়। রাগের জল এসে তাতে মেলে, দ্বেষের জল এসে তাতে মেলে, আরও নানা রকম ময়লা এসে তাতে মেশে। কোথার প্রিয়তার প্রভাব এসে সংযুক্ত হয়, কোথাও বা অপ্রিয়তার ভাব জড়িত হয়। কোথাও ইচ্ছা সংযুক্ত হয়, কোথাও বা ঘৃণা এসে মেশে। এই চিন্তার সীমার মধ্যে আমরা চিন্তাকে খুবই মূল্য দিয়ে থাকি। কিন্তু তাকে আমরা যতটা মূল্যবান মনে করি আসলে তা ততটা মূল্যবান নয়। অচিন্তনের মূল্য বুঝতে পারি না বলে আমরা চিন্তাকে এত মূল্য দিয়ে থাকি। চিন্তা না করা এবং বিচার না করার মূল্য আমরা জানি না বলেই আমরা চিন্তা ও বিচারের অধিক মূল্য দিই, তাতে অধিক মহত্ত্ব আরোপ করি। যেদিন আমরা অতল গভীরতার মধ্যে ডুব দিতে পারব সেদিন আমরা না চিন্তা করব, না বিচার করবার অর্থাৎ অচিন্তনের মূল্য বুঝতে পারব, মহত্ত্ব অনুভব করতে পারব, সেদিন আমাদের জীবনে বিরাট ঘটনা। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সীমানা অতিক্রম করে, পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণকে অতিক্রম করে যদি আমরা আকাশপথে এগিয়ে যাই তবে আমরা এক বিচিত্র ভারহীনতার অনুভূতি পাই। সেখানে ভার নেই, উদ্বেগ নেই, সময়ের বন্ধনও নেই। সময়ের গতি সেখানে মন্থর হয়ে যায়। আমরা এই রকম অবস্থিতির মধ্যে চলে যাই। এই রকম অবস্থায় আমরা অনুভব করতে পারি পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণে আবদ্ধ মানুষের চেয়ে ঐ আকর্ষণের বন্ধন থেকে মুক্ত মানুষের তফাৎ কত বেশি হতে পারে।

আমরা যদি জীবনে অচিন্তনের ক্ষণগুলি উপলব্ধি করতে পারি তবে বিচারের স্থিতি ও নির্বিচারের স্থিতির, তথা চিন্তনের ক্ষণ ও অচিন্তনের ক্ষণগুলির মধ্যে ব্যবধান কতটা তা বুঝতে পারব। চিন্তনের গুরুত্বাকর্ষণের সীমা অতিক্রম না করলে অচিন্তনের মহত্ত্ব বোঝা সম্ভবপর হয় না।

এই বন্ধন কিভাবে ছিন্ন করা যায়? এ এক মস্ত বড় প্রশ্ন। আমরা গুরুত্বাকর্ষণের পরিধি অতিক্রম করে কিভাবে যেতে পারি? কেননা আমরা শব্দ, রূপ ও শরীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছি। আমাদের

চাবদিকে যা কিছু আছে সব শব্দময়, রূপময় বা আকাবময়। আমবা শব্দেব দ্বাবা এমনভাবে বেষ্টিত হযে আছি যে শব্দেব কাবাগাবেব প্রাচীব আমবা ভাঙ্গতে পাবি না। আমবা রূপেব দ্বাবা এমনভাবে পবিবৃত যে তাব পিঞ্জব থেকে আমবা কোন মতেই মুক্তি পেতে পাবি না। বাঁধন এত কঠিনভাবে গেড়ে বসেছে যে বেবিযে আসাব কোনও পথই খোলা নেই বা তাব কোনও সুযোগও নেই। আমাদেব চাবপাশে শব্দ আব শব্দ, কোলাহল আব কোলাহল, আকাবেব জটিলতাব পব জটিলতা, আকৃতিব পব আকৃতি কেবল ঘুবে ফিবে বেড়াচ্ছে। এই সব শব্দ, রূপ আব আকৃতি আমাদেব এমন অতল গহ্ববে ডুবিযে দিযেছে যে শবীব ছাড়া আব কোনও কিছু আমাদেব চোখেই পড়ে না। শবীব স্বযং এক আকাব। আমবা তাব মধ্যে আবদ্ধ হযে আছি। আমবা শুধু শবীবই দেখতে পাই। তাব বাইবে কোনও কিছুই আমবা দেখতে পাই না। শবীবেব সঙ্গে প্রাণ, প্রাণেব সঙ্গে মন, আব মনেব সঙ্গে বুদ্ধি সংযুক্ত হযে আছে। তাব ফলে এমন এক বলয বা বৃত্ত তৈবি হযেছে যাব বাইবে যাবাব কোনও পথই আমাদেব নেই। সুতবাং আমবা ঐ বলযেব মধ্যেই ঘুবতে ফিবতে থাকি। কখনও বুদ্ধি থেকে মনে চলে আসি, কখনও বা মন থেকে ইন্দ্রিযে চলে আসি, কখনও ইন্দ্রিয থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে শবীবে যাই। আবাব উল্টো পথে আমাদেব যাত্রা শুরু হয। শবীব থেকে প্রাণে পৌছই, প্রাণ থেকে ইন্দ্রিযে, ইন্দ্রিয থেকে মনে, মন থেকে বুদ্ধিতে ফিবে আসি। এই ভাবে বলযেব সঙ্গে সঙ্গে আমবা ঘুবতে ফিবতে থাকি, আব এই বলয়েব কোন আদিও নেই, অন্তও নেই। তাব কোনও বেবোনব পথ নেই, কোথাও ফাঁক নেই। কেবল চক্কব দিতে থাকে, বন বন কবে পাক খেতে থাকে। কলুব বলদেব মত ঘানিব চাব দিকে পাক খেতে থাকাই আমাদেব কাজ হযে পড়ে। এই চক্র ভেদ না কবা পর্যন্ত অচিন্তন্ সম্বন্ধে কোনও কথাই আমাদেব বোধগম্য হতে পাবে না। অচিন্তনেব কথা বোধগম্য না হলে শুদ্ধ চেতনাব গূঢ় অর্থ বোধ হব না, আত্মাকে জানা বা তাব

পবিচয পাওয়া সম্ভবপব হয় না। আত্মাকে ঘিবে হাজাব হাজাব তর্ক বচিত হযেছে। আস্তিকগণ তাব অস্তিত্ব সমর্থনে বহু যুক্তি উপস্থিত কবে, আবাব নাস্তিকবাও ঐ সব যুক্তিব খণ্ডনে বহু তর্কেব অবতাবণা কবে। মনে হয় উভয পক্ষই নিজ নিজ প্রচেষ্টায অসফল হযেছে। অস্তিকও তাব তর্ক দ্বাবা আত্মাব অস্তিত্ব প্রমাণ কবতে পাবে নি, আবাব নাস্তিকও তার তর্ক দ্বাবা আত্মাব অনস্তিত্ব প্রমাণ কবতে সক্ষম হয নি। ঐ বেচাবাবা চিন্তাব চক্রেব মধ্যেই পাক খাচ্ছে। তাবা সেই চিন্তাব বলয়েব মধ্যে ঘুবতে থাকে, যেখানে কখনও আত্মাব উপলব্ধি হয় না। যেখানে যা নেই সেখানে তা খোঁজা বৃথা। সেখানে তাকে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ প্রমাণ কবাব প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয। সেখানে তাকে স্থাপিত কবাও সম্ভব নয, উত্থাপন কবাও সম্ভব নয। যদি কোনও ব্যক্তি ঐ চিন্তনেব উর্ধ্বে, ঐ শব্দজালেব, তর্কেব তথা চিন্তনেব উর্ধ্বে উঠে আত্মাকে সিদ্ধ কবাব প্রযত্ন কবতে চায তবে সে কখনও অসফল হয না। সত্যি সত্যিই আত্মাব স্থাপনা ও উত্থাপনা সেই সব ব্যক্তিবই ঘোষণা, যাঁবা শব্দ আব রূপ থেকে ওপবে উঠতে পেবেছেন, যাঁবা ঐ বলযকে বিদীর্ণ কবে বেবিযে আসতে পেবেছেন। যে লোক শব্দ আব রূপেব জালে আবদ্ধ থাকে সে লোক কখনও আত্মাকে জানতে পাবে না বা তাব পবিচয পায না। সে তাব স্থাপনাও কবতে পাবে না, উত্থাপনাও কবতে সক্ষম হয না।।

কথাটি খুব জটিলতাপূর্ণ। আমাদেব সামনে যা কিছু আছে সে সবই সাকাব। যাব আকাব নেই তাকে আমবা দেখতে পাই না। যা মূর্ত বা মূর্তিবিশিষ্ট তাই আমাদেব চোখেব সামনে আছে। যা অমূর্ত তা আমাদেব দেখাই দেয না। আমবা কি কবে জানব অমূর্ত কি, অনাকাব কি? সে কি অখণ্ড চেতনা? সে কি আত্মা? কেমন কবে তা জানব? তা জানাব কি উপায আমাব কাছে আছে? উপায আছে। এই দুনিযাতে কোন কিছুই নিরুপায নয। নিরুপায বলে কোনও কিছু হতেই পাবে না। দইয়েব মধ্যে ঘি থাকে। মাণুষ

উপায বেব কবেছে। তাতে ঘোল আলাদা হযে যায, আব মাখনও আলাদা হযে যায। ফুলে সুগন্ধ আছে। মানুষ উপায বেব কবেছে। তাতে সুগন্ধ আলাদা হযে যায, ফুলও আলাদা থেকে যায। আতব তৈবি হয, সুগন্ধি পদার্থ তৈবি হয। মানুষ আলাদা কবতে, বিশ্লেষণ কবতে জানে। মানুষ এও জানে যে আত্মাকে শবীব থেকে আলাদা কবা যেতে পাবে, শবীবকে চেতনা থেকে আলাদা কবা যেতে পাবে। এই নশ্বব থেকে অনশ্বব বা পবম তত্ত্বকে আলাদা কবা যায। তাব উপায আছে। উপাযেব কথা বলাও হযেছে। নিজেকে দেখাবও উপায আছে। মানুষ নিজেব মুখ দেখতে পায না। তাব উপায বেব হযেছে। তাব সামনে আযনা এসেছে। তাতে প্রতিবিম্ব দেখা যায। আযনাতে মানুষ নিজেব মুখ দেখে না, শুধু তাব প্রতিবিম্ব দেখে। মানুষ আযনাও দেখে না, নিজের মুখও দেখে না। সে কেবল প্রতিবিম্ব দেখে। প্রতিবিম্ব তাকে বিশ্বাস কবায যে তাব মুখ দেখতে ঐ বকম। প্রতিবিম্ব থেকে সে তাব মুখেব পবিচয পায। প্রতিবিম্ব দ্বাবাই তাব আত্মাকে জানা সম্ভব হতে পাবে। আমবা আকাশ দেখতে পাই না, কাবণ আকাশ অমূর্ত। কিন্তু তাকে দেখাবও উপায আছে। যে লোক ছাযা-পুকষেব সাধনা কবে সে সূর্যেব সামনে দাঁড়িযে নিজেব ছাযাকে দেখে থাকে। নিজেব ছাযা দেখতে দেখতে তাব এমন অভ্যাস হযে যায যে কিছুক্ষণ পবে যেমনই সে নিজেব ছাযাব ওপবে ধ্যান কেন্দ্রিত কবে এবং চোখ বন্ধ কবে, আব তাব পবে আকাশেব দিকে তাকায সে আকাশপটে হুবহু নিজেব আকাব দেখতে আবম্ভ কবে। ছাযা-পুকষ এমন এক দর্পণে পবিণত হয যে আমবা ঐ প্রতিবিম্ব দ্বাবা আকাশকেও দেখতে সক্ষম হই।

আত্মাকেও দেখা সম্ভব হতে পাবে। তাকে দেখাব উপায হচ্ছে অচিন্তন, চিন্তা থেকে মুক্ত হওযা, শব্দ থেকে মুক্ত হওযা, বূপ থেকে মুক্ত হওযা। তা কেমন কবে সম্ভব হতে পাবে? হ্যাঁ, তা সম্ভব। কবাব সাধনা প্রেক্ষা ধ্যানেব দ্বাবা কবা যেতে পাবে। নিজেকে

নির্দেশ বা উপদেশে দেওয়া যায়, 'দেখ আর জান'। সুষ্ঠুভাবে দেখ আর জান। তার সঙ্গে রাগ জুড়ে দিও না, দ্বেষ জুড়ে দিও না, প্রিয়-অপ্রিয় বোধও যোগ কোর না, যে জিনিস যেমন তাকে সেই রকম দেখবে। দেখার ক্রিয়া আর জানার ক্রিয়া—এগুলি আত্মার প্রতিবিম্ব। এ হল এক দর্পণ যাতে আত্মাকে দেখা যেতে পারে। এই প্রতিবিম্ব দ্বারা মানুষ আত্মার নাগাল পেতে পারে। জানা ও দেখাই হল আত্মার স্বরূপ। কেবল জানা আর দেখা। যে শুধু জানে আর দেখে, আর কিছুই করে না সেই আত্মার নাগাল পায়। আত্মাকে লাভ করার প্রকৃষ্ট মাধ্যম জ্ঞান ও দর্শন, অর্থাৎ জানা ও দেখা। শুধু জানা আর দেখা, তার সঙ্গে আর কিছু সংযুক্ত না করা। অন্য কিছুর সংযোগ করলেই মনের পরিধির ভিতরে ময়লা জমতে থাকে।

আপনি একটি ফুল দেখছেন, তার মিষ্টি সুগন্ধে আপনার মন লুব্ধ হয়েছে। আপনার মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। আপনার জানা ও দেখা মনের সীমার অন্তর্গত হয়েছে। যে জিনিস যেমন শুধু তাই জানছেন না, তার প্রিয়তাকে জানছেন। আপনি তার আকর্ষণে আবদ্ধ হয়েছেন এবং আপনার জানা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা সব সময় জানা ও দেখার সীমার মধ্যে থাকি না, আরও অন্য জিনিসের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। যেখানেই বন্ধন তৈরি হয় সেখানেই আমরা আত্মা থেকে দূরে চলে যাই। যেখানে বিশুদ্ধ জানা ও দেখা ঘটে, সেখানেই তার সমাপ্তি ঘটে। যখন আমার শব্দের ওপরে উঠে যাই তখনই আমাদের আত্মার ঝলক বা জ্যোতির দর্শন ঘটে, আর ঐ ঝলক আমাদের নির্বিচারতার দিকে প্রেরণা দেয়। আত্মার ঝলক দর্শন না হলে নির্বিচারতার স্থিতি হতে পারে না। আত্মদর্শন ছাড়া তা হওয়া সম্ভব নয়।

পিণ্ডস্থ ধ্যানে শরীর ধ্যেয় হয়ে থাকে। পদস্থ ধ্যানে শব্দ ধ্যেয়, রূপস্থ ধ্যানে আকার ধ্যেয়। এই সব ধ্যানের ধ্যেয় আছে। চতুর্থ ধ্যান হল রূপাতীত ধ্যান। যেখানে রূপাতীত, ভাবাতীত স্থিতি লাভ ঘটে

সেখানে কোনও ধ্যেয় থাকে না। চিন্তনের ধ্যানই হচ্ছে ধ্যান, আর নির্বিচারতাই বাস্তবে সমাধি।

জৈন পরম্পরায় দুটি শব্দ প্রচলিত আছে—ধ্যান ও সামায়িক। সামায়িকও ধ্যান, কিন্তু তা এ ধ্যান থেকে অনেকটা ভিন্ন। কেননা, ধ্যানে দ্বিতীয় কারও সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে। যখনই আমি বলি ধ্যান কর, তখনই প্রশ্ন হয়, কার ধ্যান করব? কিভাবে করব? কোথায় করব? কে করবে? ধ্যাতা আর ধ্যেয় আলাদা হয়ে যায়, ধ্যান পদ্ধতিও আলাদা হয়ে যায় এবং ধ্যানের সাধনাও ভিন্ন হয়ে যায়। ঐ সব কর্তা কর্ম আধার সংই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে। আপনি হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন, কার ধ্যান করব? তখন বলতে হবে, এর ধ্যান করুন বা অমুক আকৃতির ধ্যান করুন, অথবা অমুক শব্দের ধ্যান করুন। ধ্যেয় বলে দিতে হয়। কোনও ধ্যেয়ের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপনি ধ্যান করতে পারবেন না। কিন্তু নির্বিচারতায় স্থিতি হলে এই সমস্ত প্রশ্নের সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয়ের সমাপ্তি হয়ে যায়। দ্বিতীয় পক্ষ বলে আর কিছু থাকে না। তখন ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয় আর আলাদা থাকে না। যে ধ্যাতা, সেই ধ্যান, সেই ধ্যেয়, সেই ধ্যানের সাধনা, আবার সেই ধ্যানের আধার হয়ে থাকে। সব কারক এক হয়ে যায়। সব কারকের সমাপ্তি ঘটে। ভেদের অবসান হয়, অভেদ প্রাপ্তি হয়।

নির্বিচারতার স্থিতিতে কেবল সামায়িক হয়ে থাকে। সামায়িকের অর্থ, সময়ের মধ্যে হওয়া। সময়ের এক অর্থ আত্মা। আত্মাতে স্থিত হওয়াই সামায়িক। যে অবস্থা হলে এই স্থিতি হয় সে অবস্থা উপস্থিত হলে সব স্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটে।

ভগবান মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'ভন্তে, কে সামাই-এ? কে সামাইয়স্স অটঠে?' [সামায়িক কি? সামায়িকের অর্থ কি?]

ভগবান বলেছিলেন—'আয়া খলু সামাই-ত্র। আয়া সামাইয়স্স অটঠে।' ['গৌতম! আত্মাই সামায়িক। আত্মাই সামায়িকের অর্থ।']

সামায়িকের অর্থ আত্মায় স্থিত হওয়া। তথা নিজের মধ্যে স্থিত

হওয়া। যেখানে নিজের মধ্যে স্থিত হওয়ার কথা সেখানে ধ্যান করার কথা গৌণ হয়ে যায়। সামায়িকে আমরা কারও ধ্যান করি না, কেবল নিজের অস্তিত্বের মধ্যে নিমগ্ন থাকি। আর তাই হল নির্বিচারতার স্থিতি। যতক্ষণ আমরা নিজের মধ্যে না হই ততক্ষণ আমরা নির্বিচারতার কল্পনা করতে সমর্থ হই না, নির্বিচার হতে পারি না। প্রকারান্তরে বলতে হয়, কোনও না কোনও বিচার আমাদের ঘিরে থাকে, বিচারের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যে আত্মায় স্থিতি থাকে সে শুধু জানা ও দেখার কাজ করে, আর কিছুই করে না। ঐ স্থিতিতে সামায়িক হয় আর নির্বিচারতা আসে। আমরা যদি নির্বিচার ধ্যানকে সামায়িক বলি তবে খুব ভাল হয়। শব্দের এই প্রয়োগ অতিশয় সুষ্ঠু। ভগবানই এ শব্দের প্রয়োগ করে গিয়েছেন। তাই 'সামায়িক' কথাটির ব্যবহার ন্যায্য।

এক ব্যক্তি মুনির কাছে এসে বলল, 'সংসারে অনেক রকম দুঃখ আছে। সে সব দুঃখ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। আপনি তার উপায় বলে দিন।' সাধু বললেন, 'দেখ, এ প্রশ্ন বড় কঠিন। তুমি যখন জিজ্ঞাসা করেই ফেলেছ তখন উত্তর দিতেই হবে। তা না হলে উত্তর দিতাম না। এ প্রশ্ন খুবই জটিল। তোমাকে একটি উপায় বাতলে দিচ্ছি। যাও, এমন একজন লোকের অঙ্গরাখা নিয়ে এস যাকে জীবনে কখনও দুঃখ স্পর্শ করে নি। তার সেই অঙ্গরাখা গায়ে দাও, তোমার সব দুঃখ দূর হবে।'

সেই লোকটি বলল, 'আপনি খুব সোজা উপায় বলে দিলেন। আমি ঘুরে ঘুরে অঙ্গরাখা যোগাড় করব। কোনও দিন দুঃখ অনুভব করে নি এমন লোক মিলবেই।'

সে নিজের বাড়ি থেকে বের হল। সবার আগে সে পাশের বাড়িতে গেল। গৃহস্বামীকে বলল, 'আমি তোমার জামা নিতে এসেছি। কিন্তু জামা দেওয়ার আগে তুমি আমাকে বল, তোমার জীবনে কখনও দুঃখ এসেছে কিনা।' গৃহস্বামী বলল—'এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকব অথচ

দুঃখ হবে না—এ কি বকম কথা বলছ? এই দুনিযাতে এমন কোন লোক বেঁচে আছে যে জীবনে কোন দুঃখ অনুভব কবে নি? আমি তো খুব দুঃখী। আমাব অনেক টাকা আছে কিন্তু ছেলে নেই। এ কি দুঃখ নয়? এ তো খুবই বড দুঃখ।'

সেই লোকটি বলল, 'তোমাব জামা আমি চাই না।' সে আব একটি বাডিতে গেল। জিজ্ঞাসা কবল, 'তোমাব তো কোনও দুঃখ নেই।' গৃহস্বামী বলল, 'তুমি দুঃখেব কথা জিজ্ঞাসা কবছ? এই ভাঙ্গা চোবা বাডি, ফুটো বাসনপত্র। এই ফাটাছেঁডা কাপডচোপড। এব পবেও জিজ্ঞাসা কবছ আমাব দুঃখ আছে কিনা? আমি অত্যন্ত দুঃখী।'

সেই লোকটি বলল, 'বড বাডি দেখে গেলাম সেখানেও দুঃখ, আবাব ছোট বাডি দেখে গেলাম সেখানেও দুঃখ।'

সে আব এক বাডিতে গেল। জিজ্ঞাসা কবল, 'তোমাব কোন দুঃখ নেই তো?' সে বলল, 'সংসাবে থাকব আব দুঃখ থাকবে, না তাও কি সম্ভব? বোজ বোজ আমাব স্ত্রীব সঙ্গে ঝগডা, কলহ হয। আমি দুঃখী।'

সে সেখান থেকেও ফিবে আসে। সে ঘুবতেই থাকে। অনেক দিন, অনেক মাস সে ঘুবে বেডায। গাঁযে গাঁযে ঘুবে বেডায। তাব সঙ্কল্প ছিল যে সেই অঙ্গবাখা পেতেই হবে এবং দুঃখ থেকে মুক্তি পেতেই হবে। ঘুবতে ঘুবতে সে ক্লান্ত হযে পডল। তাব মন নিবাশায ভবে গেল। 'আমি দুঃখী নই' এ কথা বলতে পাবে এমন লোক সে একটিও খুঁজে পেল না। ধনবান লোকও দুঃখী, গবীব লোকও দুঃখী। যাব সন্তান আছে সেও দুঃখী, যাব সন্তান নেই সেও দুঃখী। সে ক্লান্ত হল, হযবাণ হল। অসফল হযে সে গুরুব কাছে গেল এবং বলল, 'মহাবাজ, ঐ অঙ্গবাখা তো পাওযা গেল না। আমি তো মনে কবেছিলাম একদিন না একদিন আমি সফলকাম হবই। কিন্তু আমি মাসেব পব মাস বৃথাই চেষ্টা কবলাম। শেষ পর্যন্ত অসফল হযে আপনাব কাছে ফিবে এলাম। এমন লোক পেলাম না যে বলতে পাবে সে সুখী আব

যাব জামা পবে আমি দুঃখ থেকে মুক্তি পাব।'

গুরু বললেন, 'কত বড মুর্খ তুমি। তুমি এই সত্য জান না যে এই দুনিযায় যে জন্মেছে সে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পাবে না।'

সে তখন বলল, 'গুরুদেব। আপনি যখন এ সত্য জানতেন তখন কেন শুধু শুধু ঘুবিযে হযবাণ কবলেন? প্রথম দিনই তো এ কথা বলতে পাবতেন। আপনিই তো আমাকে মাসেব পব মাস ঘুবিযে মাবলেন। কেন এ বকম কবলেন?'

গুরু বললেন, 'সত্য দুষ্পাচ্য। কঠিন পবিশ্রম ছাডা সত্য পবিপাক হয না। আমি যদি প্রথমেই বলতাম যে এই দুনিযায যে-ই জন্মেছে সে-ই দুঃখ থেকে বাঁচতে পাবে না, দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পাবে না, তাহলে সেই সত্য তোমাব বোধগম্য হতো না। এখন তুমি অনেক জাযগায ঘুবে এসেছ, অনেক কষ্ট কবেই ঘুবেছ। এবা। তুমি এই সত্য সহজেই বুঝতে পাববে যে এই দুনিযাতে কোনও লোকই দুঃখেব স্পর্শ থেকে বাঁচতে পাবে না। ঐ সত্য এতই অপাচ্য, এতই দুষ্পাচ্য যে প্রথম ক্ষণেই তা পবিপাক কবা সম্ভব হতো না।'

অনেক লোক জিজ্ঞাসা কবে—'নির্বিচাব কিভাবে হবে?' আমি যদি প্রথম দিনেই বলে দিতাম যে এইভাবে নির্বিচাব হতে পাবে তবে ঐ সত্য তোমাব পবিপাক হতো না। তোমাব বোধগম্য হতো না। প্রথমে তো তোমাকে জামাব খোঁজ কবতে হতো। ঘুবে ঘুবে বেডাতে হতো, বাডিতে বাডিতে গ্রামে গ্রামে যেতে হতো। সব কিছু দেখতে হতো। সব কিছু দেখে, চিন্তনেব সম্পুর্ণ প্রক্রিযাব পবে, বিচাবেব পথ সম্পুর্ণ অতিক্রম কবে, বিচাবেব ক্রিযা সম্পুর্ণ হলে এ কথা বুঝতে পাববে যে নির্বিচাবতাবও মূল্য আছে, আব এই ভাবেই নির্বিচাব হওযা যায। যত দিন পর্যন্ত এই বকম না হবে, যত দিন পর্যন্ত চিন্তনেব পবিক্রমা সম্পুর্ণ না হবে, যত দিন বিচাবেব পথে যাত্রা সম্পুর্ণ না হবে, ততদিন অচিন্তনেব কথা, চিন্তা না কবাব কথা তোমাব বোধগম্য হবে না, আব তাব মূল্যও তুমি বুঝতে পাববে না।

এই দুনিয়ায় যারা বাস করে, যারা শরীর, প্রাণ, মন আর বুদ্ধির সীমার মধ্যে বাস করে তারা কেউ নির্বিচার হতে পারে না। কারণ মোহ, মায়া ও মমতার সীমার মধ্যে যারা জীবন ধারণ করে তারা দুঃখ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয় না। সেই রকম বুদ্ধির ও শরীরের গণ্ডির মধ্যে যারা বাস করে তারা কেউ বিচার থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই হল পরম সত্য। এই সত্য তখনই আমরা উপলব্ধি করতে পারব যখন আমরা অঙ্গরাখার সন্ধানে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াব, বিচারের যাত্রা সম্পূর্ণ করব, আর চিন্তনের সম্পূর্ণ সম্পর্ক বুঝতে পারব। তখনই এই কথা আমাদের বোধগম্য হবে, তখনই আমরা এই সত্য জানতে পারব, পরিচয় করতে পারব, পরিপাক করতে পারব।

অচিন্তন ও নির্বিচারতার কথা বড়ই চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়, কেন না আমরা সর্বদাই চিন্তনের মধ্যে বেঁচে থাকি, আর তার মধ্যেই জীবনকে অনুভব করি। কিন্তু যখন আমাদের সামনে অচিন্তনের কথা, চিন্তা না করার কথা, বিচারশূন্যতার কথা হতে থাকে তখন সহজেই একটি আকর্ষণ সৃষ্ট হয় এবং আমাদের মনে হয় ঐ ভাবে জীবন যাপনই শ্রেয়। এ এক অভিনব ব্যাপার। এও কি সম্ভব ? লোকে চিন্তা আর বিচার বাদ দিয়ে জীবন যাপন করতে পারে, এ আবার কি রকম কথা ? বিচারের প্রবাহ এত প্রবল আর তার শৃঙ্খল এত দীর্ঘ যে কেউ তা ভাঙ্গতে বা ছিঁড়তে পারে না। একের পর এক বিচার আসে যায়। কখনও তার প্রবাহ রুদ্ধ হয় না। সে সদা সর্বদা গতিশীল। তার কোনও শেষ নেই। এই রকম পরিস্থিতিতে এটা কি সম্ভব, এই নির্বিচারতার কথা লোকে চিন্তা করতে পারে এবং সেই অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে ? এ প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ। এ রকম প্রশ্নও হয় এবং আকর্ষণও সৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণের আধারে এ দিকে যত্নবান হই।

চিন্তনের চেয়ে অচিন্তনের মূল্য অনেক বেশি। এ কথাটি খুবই অর্থপূর্ণ। আমরা এ কথা জানি যে বেশি ভাবা বা চিন্তা করা শুধু শক্তি ক্ষয় করা। প্রত্যেক কর্ম ও প্রবৃত্তি শক্তিকে ক্ষীণ করে।

শরীরের কর্ম, বাণীর কর্ম, মনের কর্ম, চিন্তনের কর্ম ইত্যাদি প্রত্যেকে কর্মশক্তি হ্রাস করে। শরীরশাস্ত্রী বলেন যে, প্রত্যেক প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহে বিষ উৎপাদিত হয়, শক্তি ক্ষীণ হয়। যে লোক বেশি চিন্তা করে তার রোগ হয়, মানসিক বিকৃতি ঘটে। বুদ্ধিজীবীদের শরীর বেশি পরিমাণে খারাপ হয়। তারা পেটের রোগে আক্রান্ত হয়। তার কারণ তারা অধিক ভাবে, অধিক চিন্তা করে। চিন্তা শরীরের ধর্ম হতে পারে। কিন্তু শরীরের ধর্ম হলেও তার একটা সীমা আছে। সীমার অধিক চেষ্টাও হানিকারক হয়ে থাকে।

অচিন্তন শরীরের ধর্ম নয়। অচিন্তন শব্দ ও রূপের কার্যও নয়। তা আত্মার ধর্ম, তার স্বভাব। যা স্বভাব তার দ্বারা শক্তি ক্ষয় হয় না। অচিন্তন আমাদের স্বভাব। আমরা অচিন্তনের অবস্থায় যখনই উপনীত হই বা থাকি তাতে আমাদের শক্তি ক্ষয় হতে পারে না। তাতে শক্তি বৃদ্ধি পাবে। চিন্তাতে ওজঃশক্তি নিঃশেষিত হয়, কারণ চিন্তার জন্য ওজঃশক্তির প্রয়োজন, ইন্ধনের প্রয়োজন। যাতে ইন্ধনের প্রয়োজন হয় তাতে ইন্ধন নিঃশেষিত হয়। অচিন্তনের জন্য প্রাণীজ ওজঃশক্তির কোন প্রয়োজন নেই। তার কারণ তা আত্মার স্বভাব, অখণ্ড চেতনার সহজ ধর্ম। এই কারণে তাকে জানা ও দেখার মধ্যে স্থিতি আছে। তার জন্য কোনও শক্তির অপব্যয় হয় না। ঐ সময় আমরা আপন মূল স্বভাবে অবস্থান করি।

চিন্তনের কাজ হল শক্তি ব্যয় করা। অচিন্তনের অবস্থার স্থিতিতে আমাদের শক্তি বাড়ে, কমে না। অচিন্তনে শক্তির বিস্ফোরণ হয়। আমাদের জানার শক্তি এত বেড়ে যায় যে চিন্তনের দ্বারা অতটা জানার ক্ষমতাও হয় না, জানতেও পারি না। আমাদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। চিন্তনের দ্বারা সেইটুকু জানতে পারি যা আমাদের জানার সীমার মধ্যে আবদ্ধ। সীমার মধ্যে জানা সম্ভব হয়। জানার সীমার মধ্যে অবস্থিত নয় এমন বস্তুও অচিন্তনের দ্বারা আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়। তার দ্বারা দূরবর্তী বা ব্যবস্থিত বস্তুকেও জানা সম্ভব হয়, আবার

সূক্ষ্ম বস্তুকেও জানা সম্ভব হয়। এ সবই অচিন্তনের দ্বারা সম্ভব হয়। বস্তুত অচিন্তন খুবই মূল্যবান। তার মহত্ত্ব বুঝতে পারি। আমরা তার মূল্য নিরূপণও করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমরা কি করে অচিন্তনের স্থিতিতে পৌঁছতে পারি। এখনই আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না। এখনই নির্বিচারের কথা ভাববেন না। প্রথমে অভ্যাস করতে আরম্ভ করুন। ধ্যেয় নির্বাচন করুন এবং ঐ ধ্যেয়ের সঙ্গে চলতে থাকুন। এই ভাবে আপনার মনকে এক অভ্যাস দিন। ঐ প্রক্রিয়া দ্বারা আপনি উত্তীর্ণ হতে পারবেন, চলতে পারবেন। চলতে চলতে এমন অবস্থা আসবে যখন আপনার একাগ্রতা সাধিত হবে। আপনার অভ্যাস পরিপক্কতা লাভ করবে, আর আপনি অপ্রিয়তা ও প্রিয়তার মঞ্জিল খানিকটা পার হয়ে যাবেন। আপনি কেবল জানা এবং দেখার ক্ষমতা আয়ত্ত করবেন। এই অবস্থায় নির্বিচারতার কথা সহজে বোধগম্য হবে।

আমি শুরুতেই বলেছিলাম, লোকে যা দেখে তা ভাবে না, যা ভাবে তা দেখে না। দেখা ও ভাবা—এ দুটি একই সঙ্গে চলতে পারে না। যে জানে সে বিচার করে না। আর যে বিচার করে সে জানে না। ভাবা, দেখা, বিচার করা—এ সবই যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, মস্তিষ্কের ক্রিয়া। এ সবই মস্তিষ্কের মাধ্যমে ঘটে।

দেখা ও জানা—এ যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়। এ অখণ্ড চেতনার ক্রিয়া এবং স্বভাবত স্ফূর্ত হয়। এর উৎস বা উদগমস্থল অখণ্ড চেতনা, আত্মা। এ যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়, মস্তিষ্কের ক্রিয়া নয়, এমন কি মনোদৈহিক ক্রিয়াও নয়। এর ফলে আমরা অখণ্ড চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি, তাতে ডুব দিই। এতে বিপদ হতে পারে। যার বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এসে যায় এবং যে মরতে সাহস সংগ্রহ করতে পারে সে-ই এ পথে অগ্রসর হতে পারে। যে মানুষ নিজের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে চায় তাকে সবার আগে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে হবে। মরণের জন্য তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অচিন্তনের কথা উঠতেই পারে না।

কোন কোন লোক ভয় পেযে যায। ধ্যানেব গভীবতায যায, তখন এক প্রকার বিচিত্র অনুভূতি হতে থাকে। তাবা ভয পেযে ধ্যান ছেড়ে দেয়। জিজ্ঞাসা কবলে বলে, 'ধ্যানেব গভীবতাব মধ্যে গিযেছিলাম। মনে হল যেন হৃদপিণ্ডেব স্পন্দন বন্ধ হযে গিযেছে।' এমন লোক অচিন্তনেব মধ্যে ডুব দিতে পাবে না।

আচার্য ভিক্ষু মহান সাধক ছিলেন। তাঁব সামনে এক লক্ষ্য ছিল। তিনি সর্বপ্রথম মৃত্যুব জন্য প্রস্তুত হলেন। শ্রীমজ্জযাচার্য লিখেছেন, 'মবণেব ধাব শোধ চেযে নাও।' আচার্য ভিক্ষু মৃত্যুব জন্য' প্রস্তুত হযে শুদ্ধ মার্গ প্রাপ্ত হলেন। মবণেব কথা না ভাবলে কোন লোক শুদ্ধ মার্গ প্রাপ্ত হতে পাবেন না। শুদ্ধ মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হওযাব মার্গ অনেক পাওযা যায়। যে ব্যক্তি মৃত্যুব জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হযেছে সে-ই শুধু শুদ্ধ মার্গে পৌছনোব পথ খুঁজে পায। সে এত সাহস সঞ্চয কবেছে যে তাব বেঁচে থাকাব আকাঙ্ক্ষাও নেই, মবণেব ভযও নেই। ঐ লোক নির্বিচাবতাব স্থিতিতে পৌছতে আব চেতনাব অতল গভীবতায ডুব দিতে সক্ষম। ঐ ব্যক্তিব অখণ্ড চেতনাব রূপসাগবে ডুব দেওযাব অধিকাব আছে, তাব জন্য আমবা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হযে না যেন ভাবাব ভূমিকায যাই, অচিন্তনেব ভূমিকায যাই। রূপ এবং আকৃতিব সীমা অতিক্রম কবে সেই স্থিতিতে চলে যাই যেখানে কোন শব্দ আমাদেব প্রভাবিত কবে না।

ধ্যান শব্দকে প্রভাবিত কবে। বাজর্ষি প্রসন্নচন্দ্র ধ্যানস্থ অবস্থায দণ্ডাযমান ছিলেন। একটি লোক এল। তাকে একটি কথা বলে রাজর্ষি বাজ্য ছেড়ে বনে গেলেন। বাজ্যেব ভাব ছেলেকে দিলেন। ছেলে খুবই ছোট ছিল। এই ছোট ছেলেব কাঁধে বাজ্যেব বিবাট ভাব পড়ল। শত্রুবা বাজ্য আক্রমণ কবল। তাবা বাজ্য ধ্বংস কবতে শুরু কবল। তাতে অনেক শব্দ হল। কোনও ঘটনাই ঘটে নি। বাজর্ষি শুনলেন। শব্দ তাঁকে এতই প্রভাবিত কবল যে ধ্যানে দণ্ডায়মান হযেই তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। যুদ্ধ আবম্ভ হযে গেল, তিনি

শত্রুকে পরাস্ত করতে লাগলেন। এই সময়ে এক লোক এল এবং ধ্যানস্থ রাজর্ষিকে দেখে বলল, 'কত বড ধ্যানী। কত বড় ধ্যানী! কত বড সাধক! অচল ধ্যানমুদ্রায় দাঁডিয়ে আছেন।' রাজর্ষি এ কথা শুনলেন, তাঁর চেতনা মোড নিল। যুদ্ধভূমি থেকে ধ্যানভূমিতে ফিরে এলেন। আবার ধ্যানের ধারা অখণ্ড প্রবাহে বইতে লাগল।

শব্দের পরিধির মধ্যে গতিশীল ধ্যান শব্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ধ্যাতা কখনও লডাই করতে লেগে যায়, কখনও বা আত্মসাধনার কথা ভাবতে লেগে যায়। সে রূপের দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

অচিন্তনের স্থিতিতে যে প্রতিষ্ঠিত, সামায়িকে যে অবস্থান করে, যে আপন আত্মায় স্থিত, সে কখনও শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কখনও রূপের প্রভাবাধীন হয় না। তার শরীরের অভ্যাস হয় না, জীবনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, মৃত্যুর ভয় থাকে না। সে সব কিছুর অতীত হয়। পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণ অতিক্রম করে তার আত্মা অন্তরীক্ষে চলে যায়। সেখানে তার ভাবের কোনও অনুভূতি হয় না।

লাড়নু শিবির

(২ মার্চ, ১৯৭৬ থেকে ১১ মার্চ, ১৯৭৬)

রাজলদেসের শিবির

(১ জানুয়ারি, ১৯৭৭ থেকে ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৭)

৮

শরীর পরিচয়

সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে মস্তিকের জ্ঞান আবশ্যক। মস্তিষ্কের জ্ঞান না থাকলে অনেক সাধনা সত্ত্বেও সাধক যথেষ্ট সফলতা লাভ করতে পারেন না।

মস্তিষ্ক তিন ভাগে বিভক্ত—বৃহৎ মস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক ও লঘু মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের গঠন অত্যন্ত জটিল। তা অসংখ্য প্রকোষ্ঠ দ্বারা রচিত এবং তার যন্ত্রপ্রণালী এত জটিল ও দুরূহ যে আজ পর্যন্ত তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় নি। বহুদিন ধরে এ বিষয়ে গবেষণা চলছে। হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু আজও এর কার্যপ্রণালী রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। মস্তিষ্ক মানুষের সকল মনোবৃত্তি ও সংস্কারের মূল কেন্দ্র। শরীরশাস্ত্রীগণ অনেক কেন্দ্রের সন্ধান পেয়েছেন। সংবেদন, জ্ঞান, বাসনা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই সমস্ত কেন্দ্রের সূক্ষ্মতাও এখন আমাদের বিদিত। তাদের চিকিৎসা, এমন কি তাদের পরিবর্তনও করা হয়।

আমাদের মস্তিষ্কে দুই প্রকার পদার্থ ও বর্ণ পাওয়া যায়। এক রকম দ্রব্য ধূসর বা হালকা হলুদ বর্ণের। তা বুদ্ধির ধারক। যে লোকের

ধূসব বস্তু অধিক পবিমাণে থাকে তাব জ্ঞানবাহী তন্তু সবল হয এবং বুদ্ধি প্রখব বা সতেজ হয। মস্তিষ্কেব অপব পদার্থটি শ্বেত বর্ণ, তা কর্ম-প্রেবণাব সূচক। মস্তিষ্কেব শ্বেত অংশ দ্বাবা ক্রিযা এবং ধূসব অংশ দ্বাবা বুদ্ধি নিযন্ত্রিত হয।

আমাদেব বৃহৎ মস্তিষ্ক থেকে অসংখ্য তাব বা সুতোব মত বস্তু বেবিযেছে। সেগুলি জ্ঞানবাহী ও গতিবাহীও বটে। ঐ তন্তুগুলি বৃহৎ মস্তিষ্ক থেকে বেবিযে লঘু মস্তিষ্কেব ভেতব দিযে সুষুম্নাশীর্ষ পাব হযে পৃষ্ঠবজ্জু বা মেরুদণ্ডেব মধ্যে যে সুষুম্না আছে সেখানে গিযেছে এবং সেখান থেকে সমস্ত শবীবে ছডিযে পডেছে। এক দৃষ্টিতে বলা যায মস্তিষ্ক শবীবেব নিযামক বা নিযন্ত্রণকর্তা। বৃহৎ মস্তিষ্ক, লঘু মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাশীর্ষ—এই তিনটিই শবীবেব নিযামকতত্ত্ব।

মস্তিষ্ক জ্ঞানকেন্দ্র। তা চৈতন্যেব সবচেযে বড কেন্দ্র। সূক্ষ্ম শবীবেব মুখ্য প্রকাশ মস্তিষ্কেব মাধ্যমেই আমাদেব স্থূল শবীবে নেমে আসে। মস্তিষ্ক এক প্রকাব মধ্য-সেতু। স্থূল শবীব ও সূক্ষ্ম শবীবেব মধ্যে তা সেতুব কাজ কবে। সূক্ষ্ম শবীব থেকে অববোহী শক্তি বা চৈতন্য মস্তিকেব মাধ্যমে স্থূল শবীব বা জাগ্রত মনে নেমে আসে। অবচেতন মন ও চেতন মনেব কাজও তাব মাধ্যমে হয। এই কাবণে সাধকেব পক্ষে মস্তিষ্কেব জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। যদি আমি মস্তিষ্কেব ক্রিয়া ঠিকমত বুঝতে পাবি তবে আমাব পক্ষে জ্ঞানকেন্দ্রকে বিকশিত কবা সম্ভবপব। এব আধাবেই সাধকগণ সহস্রাবেব পবিকল্পনা কবেছেন। তাঁদেব কল্পনা অনুযাযী আমাদেব মস্তিষ্কে সহস্রাব নামে এক চক্র বা চৈতন্যকেন্দ্র আছে। আমবা আমাদেব খুশিমত তাকে চক্র, বুদ্ধি বা অন্য কোনও নাম দিতে পাবি। তা একটি অতি বৃহৎ জ্ঞানকেন্দ্র বটে। তাকে বিকশিত কবতে পাবলে অতিবিক্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি সম্ভবপব হতে পাবে। এ সামান্য কথা, তেমন বড ব্যাপাব কিছু নয। প্রত্যেক লোকই তা পবীক্ষা কবে দেখতে পাবে। যদি কোন লোকেব মনে হয তাব বুদ্ধি সঙ্কুচিত হযে যাচ্ছে, জ্ঞান মন্দীভূত হচ্ছে তবে সে দশ মিনিট

কাল নিজেব মস্তিষ্কেব তালুতে হলুদ বঙের ওপবে ধ্যান কেন্দ্রিত কবুক। ধীবে ধীবে তাব অনুভব হবে জ্ঞানেব বিকাশ হচ্ছে, বুদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি এই উপায প্রযোগ কবুন, তখন নিজেবই বিশ্বাস হবে। এই প্রয়োগ দ্বাবা বুদ্ধি প্রবল হতে পাবে, চৈতন্যশক্তি পুষ্টি ও দৃঢ়তা লাভ কবতে পাবে, বিকশিত হতে পাবে। একে সমগ্রভাবে উপাসনা কবলে মানুষেব মধ্যে অতিবিক্ত জ্ঞানেব অবতবণ সম্ভব হতে পাবে।

দুটি মুখ্য কেন্দ্র আছে—জ্ঞানকেন্দ্র ও কামকেন্দ্র। মস্তিষ্ক জ্ঞান-কেন্দ্র আব কটিদেশেব আশপাশেব স্থান কামকেন্দ্র।

মানুষ কামেব উত্তেজনা দ্বাবা অতিশয অভিভূত। তাব মধ্যে বিচিত্র প্রকাব কামনা উৎপন্ন হয, তাব উত্তেজনা হয এবং তাব উত্তেজনা দীর্ঘকাল থাকে। ক্রোধ থেকেও উত্তেজনা হয, কিন্তু তা মাঝে মাঝে হয। অভিমান, লোভ ও মাযা থেকেও উত্তেজনা হয, কিন্তু তাও সর্বদা হয না। কিন্তু কামনাব উত্তেজনা দীর্ঘকাল ধবে চলতে থাকে। এই উত্তেজনাই সবচেযে প্রবল ও তীব্র।

আমাদেব শবীবেব ওজঃ বা শবীবেব বিদ্যুৎ কামকেন্দ্রেব দিকে অধিক প্রবাহিত হলে কামকেন্দ্র পুষ্ট হয এবং জ্ঞানকেন্দ্র ক্ষীণ হয। আমাদেব শবীবেব সাবাংশ ওজঃ বা বিদ্যুৎ যদি জ্ঞানকেন্দ্রেব দিকে প্রবাহিত হয় তবে জ্ঞানকেন্দ্র পুষ্ট হয এবং কামকেন্দ্র ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয। এই দুটিব মধ্যে সম্বন্ধ অতিশয নিবিড।

সাধনাব অর্থ, কামকেন্দ্রস্থিত ওজঃশক্তিকে ওপবেব দিকে প্রবাহিত কবে জ্ঞানকেন্দ্রে নিযে যাওযা যাতে জ্ঞানকেন্দ্রেব সিঞ্চন, পোষণ ও পুষ্টি হতে পাবে। সাধাবণত মানুষ নিজেব কামনা দ্বাবা ধ্যানকেন্দ্রকে নিচেব দিকে নিযে যায এবং কামকেন্দ্রকে পুষ্ট কবে। শবীবেব গঠন সম্বন্ধে বোধ হবাব পবে কামকেন্দ্রগত ওজঃশক্তিকে জ্ঞানকেন্দ্রে নিযে যাওযা সম্ভব হয। সাধনাব দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেব এ বিষযে যত্নবান হওযা উচিত। তাব সবচেযে প্রশস্ত পথ—সুষুম্না।

আমাদের শবীবে তিনটি প্রধান প্রধান পথ আছে—ডানে, বাঁযে

আব মাঝখানে। এই তিনেব মহত্ত্বেব কাবণ, তাদেব ভেতব দিযে প্রাণ-তবঙ্গ ওপবের দিকে যায। এগুলি প্রাণধাবা বা প্রাণতবঙ্গেব প্রবাহ-কক্ষ। তাই তাব মহত্ত্ব। তিনটিব মধ্যেই সুষুম্না আছে। তা সবচেযে বড এবং মহত্ত্বপূর্ণ প্রাণধাবাব প্রবাহকক্ষ। তাব ভেতব দিযে প্রচুব মাত্রায প্রাণধাবা ওপব দিকে যায। যোগেব ভাবায বাঁ দিকেব পথকে ইডা আব ডানদিকেব পথকে পিঙ্গলা বলে। মাঝখানকাব পথকে সুষুম্না বলা হয। পৃষ্ঠবজ্জু ছত্রিশটি হাড় দিযে গঠিত। তাব ভেতবকাব কোমল অংশ হল সুষুম্না কক্ষ। এব ভেতব দিযে প্রাণতবঙ্গ আসে ও যায। বাঁযেব পথ পৃষ্ঠবজ্জুব বাইবে নিচু থেকে আবম্ভ হযে ওপবেব দিকে যায এবং বাঁ দিকেব নাসাছিদ্রে এসে তাব শেষ হয। ঐ হল ইড়াব পথ। ডান দিককাব পথ পিঙ্গলাব পথ। পৃষ্ঠবজ্জু নিচে তাব আবম্ভ এবং ওপবে গিযে ডান দিকেব নাসাছিদ্রে তাব সমাপ্তি। মাঝখানকাব পথ সুষুম্নাব পথ। পৃষ্ঠবজ্জুব নিচ থেকে তাব আবম্ভ, আব মাস্তষ্কে এসে তাব সমাপ্তি। এই তিন পথ আছে। দুটি যায নাসাছিদ্রে, আব একটি যায মাস্তষ্কে। আমাদেব প্রাণধাবাকে বাম ও দক্ষিণেব পথে যেতে না দিযে মধ্যপথ দিযে চালনা কবাব চেষ্টা কবা উচিত। প্রাণেব তবঙ্গকে বেশি মাত্রায় প্রবাহিত কবতে হবে যাতে তা মাস্তষ্ক পর্যন্ত পৌছতে পাবে। দুটি পথ দিযে প্রবাহিত প্রাণধাবা মাস্তষ্ক পর্যন্ত পৌছয না। কেবল মাঝখানকাব পথ দিয়ে অর্থাৎ সুষুম্না দিযে প্রবাহমান প্রাণধাবা মাস্তষ্ক পর্যন্ত পৌছতে পাবে। মস্তিষ্কে প্রাণ-ধাবা নিযে যাওযাব অর্থ, জ্ঞানকেন্দ্রকে প্রাণধাবা দিযে পবিপূর্ণ কবা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুষুম্নাকে জানা, ঐ পথে প্রাণধাবাকে প্রবাহিত কবা, তাকে প্রাণ দিযে পবিপূর্ণ কবা, সাধনাব জন্য প্রযোজন। এই প্রযোজন মেটাবাব জন্য আমবা অনেক ক্রিযা কবে থাকি।

আমবা দীর্ঘশ্বাসেব অভ্যাস কবি। তাতে শাবীবিক লাভ হয। ফুসফুসে নির্মলতা আনা সম্ভব হয। প্রাণবাযু পূর্ণ মাত্রায ভেতবে চলে যায। কার্বন ডাই-অক্সাইড সম্পূর্ণভাবে তা থেকে বেব হযে যায।

আমাশযেবও নিবাময হয। সম্পূর্ণ উদব যন্ত্র শোধিত হয। এ সব শাবীবিক লাভ। কিন্তু লাভ হবে, কেবল এই উদ্দেশ্যে আমবা দীর্ঘশ্বাস অভ্যাস কবি না। যদি শুধু তাই উদ্দেশ্য হতো তবে তা আমাদেব স্বাস্থ্য নিকেতন হতো, সাধনা-নিকেতন হতো না। কিন্তু তা সাধনা-নিকেতন হলেও স্বাস্থ্যনিকেতন নয। আমবা আধ্যাত্মিক লাভেব জন্য দীর্ঘশ্বাসেব অভ্যাস কবি। দীর্ঘশ্বাসেব দ্বাবা সুষুম্নাব পথ উন্মুক্ত হয, বিদ্যুৎ তবঙ্গ প্রবল হয। কামাব হাপব চালনা কবে, তাব ফলে আগুন প্রবলভাবে জ্বলে ওঠে। দীর্ঘশ্বাসেব কাজও এই। তাব এমন ক্ষমতা যে তা সুষুম্নাব পথ খুলে দেয এবং তাব ভেতব দিযে প্রাণধাবাকে প্রবাহিত কবে। প্রাণধাবা ঐ পথে প্রবাহিত হযে মস্তিষ্কেব কেন্দ্রে পৌছে জ্ঞানকেন্দ্রকে পুষ্ট কবে। দীর্ঘশ্বাস অভ্যাস কবাব এই প্রযোজন। সেখানে পৌছতে পাবলে আমাদেব প্রত্যেক কাজেবই আধ্যাত্মিক প্রযোজন থাকে এবং তাব দ্বাবা অনুপ্রেবিত হযে আমবা ঐ সব কাজ কবে থাকি।

যে সাধক পূর্ণ একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং তন্ময়তাব সঙ্গে দীর্ঘশ্বাসেব প্রযোগ অভ্যাস কবে তাব প্রথম প্রথম অনুভূতি হয তাব পৃষ্ঠবজ্জুব তাব ঝনঝন কবছে। তাব ভেতবে কাঁপনও শুরু হবে। একটু গভীবতায গিযে সে যদি অনুভব কবতে চেষ্টা কবে তবে তাব মনে হবে তাব পেছনে কিছু নডাচডা কবছে।

দ্বিতীয কথা—যখন সুষুম্নাব পথ খুলে যায তখন এক বিচিত্র শান্তি ও তন্ময়তাব অনুভূতি হয এবং সমস্ত শবীবে শীতলতা ব্যাপ্ত হয। মনে হয যেন গ্রীষ্মেব প্রখব তাপে উৎপীডিত কোনও পথশ্রান্ত পথিক গভীব ছাযাচ্ছন্ন কোন জাযগায এসে বসেছে।

তৃতীয কথা—দীর্ঘশ্বাসেব অভ্যাস পবিপক্ব হলে দশ-পনব মিনিট কাল অভ্যাস কবাব পব এক নির্বিচাব স্থিতি সঞ্জাত হয এবং সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্প বন্ধ হযে যায।

এ সবে কি হয? এ একটি প্রশ্ন বটে। এব উত্তব এই যে,

সুষুম্নাতে প্রাণধারা প্রবেশ করার ফলে এই সব ঘটে। যদি আমাদের শ্বাস ডান দিকের পথে প্রবাহিত হয় তবুও চঞ্চলতা আসবে। যখন আমাদের শ্বাস সুষুম্না বা মধ্যের পথ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে তখন সমস্ত চঞ্চলতা আপনা থেকেই শেষ হয়ে যাবে। ঐ চঞ্চলতা শেষ হওয়ার একটি প্রবল কারণ আছে। যদি আমরা শরীরশাস্ত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব দেখতে না পাই, তবে যোগসাধনার তথা আভ্যাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকেও এর দ্বারা লাভবান হতে সক্ষম হব না। এই কারণে শরীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা একজন শরীরশাস্ত্রীর পক্ষে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, একজন যোগী বা সাধকের পক্ষেও ততটা গুরুত্বপূর্ণ।

এখন আমরা অন্যান্য চৈতন্যকেন্দ্রের আলোচনা করব।

মস্তিষ্কের একটু আগে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। ওটাও চৈতন্যের অতি বৃহৎ কেন্দ্র। এর ক্ষমতা প্রভূত। কোনও কোনও শরীরশাস্ত্রী তথা পরামনোবিজ্ঞানী একে এক রকম সর্বজ্ঞতার কেন্দ্র বলেছেন। একে আজ্ঞাচক্রও বলা হয়, আবার তৃতীয় নেত্রও বলা হয়। তা মস্তিষ্ক এবং তালুর নিচে, ভ্রূর নিকটে গভীরতায় অবস্থিত। পাশ্চাত্য দেশের সাধকরা একে 'থার্ড আই' নাম দিয়ে এর সম্বন্ধে অনেক চর্চা করেছেন এবং এ বিষয়ে অনেক বইও লেখা হয়েছে। এটিও চৈতন্যের এক কেন্দ্র। আমাদের শরীরের অনেক জায়গায় চৈতন্যকেন্দ্র আছে। আমাদের শরীরে যেখানে যেখানে চৈতন্যকেন্দ্র আছে, সেখানে সেখানে স্নায়ুগুলি বড় জালের মত তৈরি হয়েছে। ঐ স্নায়ুজালকে আমরা গ্রন্থি বলি, চক্র বলি বা অন্য কোন নামে অভিহিত করি। কিন্তু এ কথা সত্য যে আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় চৈতন্যকেন্দ্র আছে। ঐ সব চৈতন্যকেন্দ্র স্থূল শরীরের অন্তর্ভুক্ত নয়। স্থূল শরীরে কেবল তাদের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু এই সমস্ত কেন্দ্র অতিশয় গভীরতায় সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিত আছে। এ রকম হওয়া সম্ভব যে আমাদের শরীর-পর্যাপ্তিতে ঐ সব চৈতন্যকেন্দ্র আছে। সূক্ষ্ম শরীরে তো ঐ কেন্দ্রগুলি নিশ্চিতভাবে অবস্থিত। শরীরের প্রতিবিম্ব শরীর পর্যাপ্তিতে পড়ে,

এবং শবীব পর্যাপ্তিব ছায়া স্থূল শবীবে পড়ে—এই বকম এক চিন্তাধাবা প্রচলিত আছে।

আজ্ঞাচক্র এক শক্তিশালী চৈতন্যকেন্দ্র। কোনও লোক জিজ্ঞাসা কবে, চেতনাকে জাগিযে তোলাব কোনও পথ পাওযা যায কিনা। বাস্তবে কোন পথ আছে, কিংবা তা কল্পনা মাত্র? পথ অবশ্যই আছে, কিন্তু খুঁজে বেব কববে কে? আমাদেব অধ্যবসায এবং প্রযাসেব ওপবে এই পথ পাওযা নির্ভব কবছে। পথ কঠিন নয। নিশ্চযই পথ আছে —অবশ্যই আছে। তাব অস্তিত্ব অনুভূত সত্য। তা কল্পনা মাত্র নয। আমি মনে কবি, কোনও সাধক যদি তিন ঘণ্টা ধবে আজ্ঞাচক্রে মন কেন্দ্রিত কবে বাখতে পাবে, যদি সে একাগ্র হযে থাকতে পাবে, তবে দশ দিন বাদে সেই সাধক কখনই বলবে না যে চেতনাব জাগবণেব কোন পথ নেই। দেখতে হবে তিন ঘণ্টাব মধ্যে কোনও বিকল্প না আসে। এটি অবশ্য কঠিন কথা। সাধাবণত এক-দুই মিনিট বা পাঁচ-দশ মিনিট কালও মনকে এক ধাবায চালিত কবা কঠিন, একই স্থানে এক নাগাড়ে তিন ঘণ্টা মনঃসংযোগ কবে বাখা অত্যন্ত দুষ্কব বটে। যে সাধক দশ-পনব মিনিট পর্যন্ত একাগ্রভাবে অবস্থানেব অভ্যাসে পৌঁছে যায সে অনুভব কবতে পাবে যে, যদি কোনও লোক তিন ঘণ্টা ধবে একাগ্রতায অবস্থিত থাকতে পাবে সে অবশ্যই পথেব সন্ধান পেযেছে এবং বৃথা ইতস্তত ভ্রমণ থেকে মুক্তি পেযেছে। তাব আব গুরু বা উপদেশকেব প্রযোজন হয না। কিন্তু তাঁব এতটা শ্রদ্ধা, তন্ময়তা ও সামর্থ্য থাকা প্রযোজন যাতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে তিনি সাধনায সিদ্ধি লাভ কবতে পাবেন।

অনেকে মনে কবে যাবা ধ্যান কবে তাবা কর্মহীন ভাবে থাকে, এবং অকর্মণ্য হযে যায। তাদেব নিষ্কর্মা বলা হয। ধ্যানকালে এত পবিমাণ শক্তি প্রযোগ কবতে হয যে ধ্যানভাসী অনেক সমযে নিজ শবীবেব ওপবে বলপ্রযোগ কবে। ফলে শবীবে কঠিন ব্যাধি উৎপন্ন হতে পাবে। ধ্যানকালে ওজঃ বা শাবীব-বিদ্যুৎ ব্যযিত হয। তাব

ফলে মস্তিষ্কের এতটুকু শ্রম হলে মনে হয় মাথা গরম হয়ে গিয়েছে। এরকম অনুভূতির কারণ মস্তিষ্কের ওজঃ বা বিদ্যুৎশক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যয় হয়। এ রকম অবস্থায় কেন মাথা গরম হয়? তার কারণ, যতটা ওজঃশক্তি বা বিদ্যুৎ আছে তার উপযোগিতা আমরা অধিক মাত্রায় ব্যয় করি। তার ফলে তা এত বেশি জ্বলতে আরম্ভ করে যে আমাদের মাথা গরম হয়ে যায়, চুল্লির মত জ্বলতে থাকে। যে অবয়বের ওজঃ আমরা উপযোগ হিসাবে ব্যয় করি তাতে উত্তাপ উৎপন্ন হয়।

ধ্যানকালে ওজঃশক্তির অধিক ব্যয় হয়। মনকে একাগ্র করার জন্য বহু চেষ্টা করতে হয়। এ প্রয়াস প্রবল হলে ওজঃশক্তির ব্যয় বৃদ্ধি পায়। প্রয়াস না করলে নির্বিকার স্থিতি পাওয়া সম্ভবপর নয়। যদি আমাদের প্রযত্ন সফল হয়, ওজঃশক্তি সম্পুর্ণভাবে প্রয়োগ করি, তবে লক্ষ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় চৈতন্যকেন্দ্র—কণ্ঠ। যোগের ভাষায় একে বিশুদ্ধিচক্র বলে। একে বিকশিত করলে বাসনাসমূহের ওপরে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা পাওয়া যেতে পারে। নিয়ন্ত্রণ নয়, আমি ভুল করছি। নিয়ন্ত্রণক্ষমতা পাওয়া তেমন বড় কথা নয়। প্রযত্ন ব্যতীত আমরা নির্বিচার হতে পারি না। বড় কথা হল, বাসনাকে নির্মল ও উদাত্ত করা। বিশুদ্ধিচক্র বিকশিত হলে আমাদের বৃত্তিগুলি স্বাভাবিকভাবে শান্ত হয়ে যায়।

চতুর্থ চৈতন্যকেন্দ্র—নাভিচক্র। এটি হল অগ্নির স্থান। এখানে অনেক তাপ, অনেক তেজস্বিতা অবস্থিত। যেখানেই উত্তাপ সেখান থেকেই তা অন্য সমস্ত বস্তুতে তেজ সংক্রমিত করে। এই চক্রে যদি একাগ্রভাবে ধ্যান কেন্দ্রিত করা যায় তবে বৃত্তিগুলি, তথা বাসনাগুলির তেজ বৃদ্ধি হয়। তেজস্বিতার ফলে সমস্ত বস্তু প্রবল হয়ে উঠে।

বিশুদ্ধিচক্র ও নাভি চক্র—এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। কোন লোক নাভিচক্রকে জাগ্রত করে যদি বিশুদ্ধিচক্রকে জাগ্রত না করে তবে তার কঠিন পীড়া উৎপন্ন হয়। দুই চক্রকেই এক সঙ্গে জাগ্রত করতে হয়। যদি তা করা যায় তবে তেজস্বিতা

বৃদ্ধি পায়, শক্তি সঞ্চিত হয়, বৃত্তিসমূহ শান্ত হয়।

এক মস্ত বড় চৈতন্যকেন্দ্র হল—হৃদয়। মস্তিষ্কের স্থান প্রথম, আর হৃদয়ের স্থান দ্বিতীয়। এ একটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ স্থান। এ সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত পুরনো বিবাদ আছে—আত্মা মস্তিষ্কে, না হৃদয়ে অবস্থিত। আয়ুর্বেদ গ্রন্থ লিখেছে, 'হৃদয়ং চেতনাধিষ্ঠানং'—হৃদয়ে চেতনার অধিষ্ঠান। 'চৈত্য পুরুষ', 'হৃদয় পুরুষ' এই সমস্ত কথা হৃদয় সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'থারে ঘট মে রাম বিরাজে'—এই ঘট রামের বাসস্থান বটে। রাম, আত্মা বা প্রভুর অবস্থান ঘটে হৃদয়ে। হৃদয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। জীবনের দিক থেকেও হৃদয়ের স্থান মহৎ বা প্রধান। হৃদয় থাকলে জীবন থাকে, হৃদয় না থাকলে জীবনও থাকে না। হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হলে জীবন শেষ হয়ে যায়। শরীর-তন্ত্রের সঞ্চালক রক্ত। রক্তই জীবন। রক্ত থাকলে জীবন থাকে। রক্তের সঞ্চালক হৃদয়। হৃদয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়। ফুসফুসে তার শুদ্ধি হয়, তারপর সেখান থেকে তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। রক্তই জীবন, আর তাকে সমস্ত শরীরে প্রসারিত করে হৃদয়। এই হল হৃদয়ের গুরুত্বের কারণ। ওটা আমাদের ভাবপক্ষও বটে। যদি মস্তিষ্ক জ্ঞান-পক্ষ হয় তবে হৃদয় ভাবপক্ষ।

হৃদয় চেতনার অতিশয় বৃহৎ কেন্দ্র। সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে তা অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। যে সাধক এই চক্রের উদ্‌ঘাটন করে এবং তাকে জাগ্রত করে, সে বাহ্য জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভেতরের জগতে প্রবেশাধিকার পায়।

আমাদের শরীরে এই রকম অনেক চৈতন্যকেন্দ্র আছে। কোন কোন যোগী বলেছেন চৈতন্যকেন্দ্র ছটি, কেউ বলেছেন সাতটি, আবার কেউ বলেছেন নটি। আমি মনে করি চৈতন্যকেন্দ্রের সংখ্যা এই সংখ্যাগুলির চেয়ে বেশি। প্রধান প্রধান কেন্দ্রের নামগুলি গোনা হয়েছে। সেগুলি ছাড়া আর যে সব ছোটখাটো চৈতন্যকেন্দ্র আছে সেগুলি গোনা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে তাদের সংখ্যা অনেক।

চৈতন্যকেন্দ্রের অর্থ—মর্মস্থান। ভারতীয় আয়ুর্বেদের পুরস্কর্তাগণ (অগ্রণীরা) সত্তরটি মর্মস্থানের কথা বলেছেন। চীন দেশে প্রচলিত আকুপাংচার নামক চিকিৎসাপদ্ধতিতে সাতশ' মর্মস্থানের কথা স্বীকৃত হয়েছে। শরীরে এই রকম সাত শ' বিন্দু বা মর্মস্থান আছে যেখানে চৈতন্যের প্রবাহ সমধিক। এই সমস্ত মর্মস্থানকে উত্তেজিত করে অনেক রকম রোগ নিরাময় করা যায়। এভাবে অসাধ্য রোগের চিকিৎসা হচ্ছে।

'মর্ম' কথাটির অর্থ রহস্য বা গোপন। মর্মস্থান কথাটির অর্থ গূঢ়তার বা গোপনতার স্থান। এই সব মর্মস্থানে চেতনার বিশেষ ধরনের অভিব্যক্তি হয়। প্রয়োজন বোধ করলে যে কেউ এক, দুই, তিন বা চারটি মর্মস্থান স্পর্শ করে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তাহলে বিশেষ উপলব্ধি হবে। চীন দেশে চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ থেকে মর্মস্থানের সন্ধান করা হয়েছে। সাধনার দিক থেকে তার অনেক মহত্ত্ব আছে। মর্মস্থান ও চৈতন্যকেন্দ্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। ঐ প্রকার মর্মস্থান আরও থাকতে পারে।

আরও এক চৈতন্যকেন্দ্রের কথা আলোচনা করব। পৃষ্ঠরজ্জুর নিচের স্থানকে মূলাধার বলা হয়। তা চৈতন্যের কেন্দ্র বিশেষ। সাধনার দিক থেকে তার তাৎপর্য অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ এবং তা বিদ্যুৎ কেন্দ্রও বটে। আমাদের সমস্ত শারীরিক ওজঃশক্তির তা সঞ্চয়গৃহ। সেখান থেকে ওজঃশক্তির প্রসারণ ঘটে। এখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং সেখান থেকেই তার বিস্তার ঘটে।

আপনারা জানতে চান যে ধ্যানকালে আপনাদের মন একাগ্র হয়েছে কিনা। এ বিষয়ে পরীক্ষা করার একটি কষ্টিপাথর আছে। যখনই মন একাগ্র হবে নিচের স্নায়ু ওপর দিকে উঠতে থাকবে। ঊর্ধ্বাকর্ষণের অনুভূতি আপনার সহজভাবেই হতে থাকবে। যদি এ রকম অনুভূতি হতে থাকে তবে জানবেন আপনার মন একাগ্র হয়েছে বা হচ্ছে। যদি এ রকম অনুভূতি না হয় তবে আপনার মন একাগ্র হয় নি বা হচ্ছে না। তা চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনের একাগ্রতার সঙ্গে নিচেকার

স্নায়ুসমূহেব নিবিড় সম্বন্ধ আছে। মন একাগ্র হতে বা কেন্দ্রিত হতে থাকলে নিচেব স্নায়ু আপনা আপনি ওপব দিকে উঠতে আবম্ভ কববে। যেমন যেমন একাগ্রতা বাড়তে থাকবে তেমনি সঙ্কুচিত হতে থাকবে। সব কিছু সঙ্কুচিত হতে থাকবে। তাব অর্থ, যে বিদ্যুৎ সঞ্চিত আছে তা ওপব দিকে উঠছে। বিদ্যুতেব ধাবা ওপবেব দিকে প্রবাহিত হতে আবম্ভ কবেছে, ওপবেব দিকে যাবাব জন্য তা পথ খুঁজতে আবম্ভ কবেছে।

এই এক কষ্টিপাথব। প্রত্যেক সাধক একে কাজে লাগাতে পাবেন, নিজেই পবখ কবে দেখতে পাবেন। কোন উপাযে মন একাগ্র হতে আবম্ভ কবলে নিচেব স্নায়ু সঙ্কুচিত হতে শুরু কবে। এই সঙ্কোচন একাগ্রতাব বিন্দুব সূচনা কবে। সাধনাব দিক এ কথা মানতে হবে যে, সাধক যে কোনও বকম সাধনা করুন না কেন নিচেকাব স্নায়ুব সঙ্কোচ বা সঙ্কুচিত করা অবশ্য প্রযোজন। স্নাযু যতটা সঙ্কুচিত থাকবে ওপব দিকে ততটা বিকাশ ঘটবে। ঊর্ধ্বীকবণ তথা উদাত্তকবণ ঘটবে। বিদ্যুতেব যে ধাবা নিচেব দিকে প্রবাহমান ছিল তাকে রুদ্ধ কবে ওপরেব দিকে প্রবাহিত কবা হযেছে। এব নাম সাধনা। এ এক বকম বিদ্যুতেব ধাবা বদলানো, তাব মোড় ঘোবানোব উদ্যোগ। এই জন্য একে মূলবন্ধ বলা হয। মূল যতটা দৃঢ় হয ওপবকাব সমস্ত অবযব ততটা দৃঢ় হবে। বৃক্ষেব মূল দৃঢ় এবং সুস্থ হলে তাতে পাতা, ফুল ও ফল ধরতে থাকবে। তাকে কেউ আব বাধা দিতে পাববে না। মূল যদি বিকৃত এবং অসুস্থ হয তবে বৃক্ষটি দীর্ঘকাল জীবিত থাকতে পাববে না, ধবাশাযী হবে।

সাধনাব দিক থেকে এই হল মূল স্থান। এ যদি সুস্থ হয তো সমস্ত বিকাশ সহজ সবল হযে যাবে। যদি আমবা এই কথাগুলি ঠিক মত বুঝে থাকি, যদি তাব তাৎপর্য হৃদযঙ্গম কবে থাকি, তবে ওপবকাব কেন্দ্রগুলিকে বিকশিত কবা আমাদেব পক্ষে সহজ হবে। ঐ সব কেন্দ্রেব বিদ্যুৎধাবা উপযুক্ত সিঞ্চন ও পোষণ পাবে। এই জন্য ঐ স্থানেব ওপবে ধ্যান কেন্দ্রিত কবা অতিশয আবশ্যক।

এই বার আমরা স্থূল শরীরের প্রসঙ্গ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম শরীরের আলোচনা করব। সাধনার সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীরের বিরাট সম্বন্ধ। দৃশ্য শরীর বা স্থূল শরীর পর্যাপ্ত নয়। তার সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীর সংযুক্ত আছে। আমার বৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি সব কিছু স্থূল শরীরে প্রকট হয়, জাগ্রত মনে প্রকাশিত হয়। এ সব কোথা থেকে এল? এর স্রোতই বা কি? আমাকে তার খোঁজ করতে হবে। স্রোত কি, কোথা থেকে এল, এ সব খুঁজে বের করতে হবে। এই স্থূল শরীরে যদি এই স্রোতের উৎস না থাকে তবে এ সব কোথা থেকে আসছে? কার মাধ্যমে আসছে? মাধ্যম সম্বন্ধে আমি এর আগে আলোচনা করেছি। এর মাধ্যম হল মস্তিষ্ক। ঐ সমস্তই মস্তিষ্কের সাহায্যে নেমে আসে, কিন্তু তাদের মূল উৎপত্তিস্থল কোথায়? এই প্রশ্ন এখনও অবশিষ্ট আছে।

এর স্রোত হল—সূক্ষ্ম শরীর। আমরা তাকে দেখতে পাই না। বহু আবরণ আছে। আমরা শুধু স্থূল শরীরকেই দেখতে পাই। সাধকদের সূক্ষ্ম শরীর দর্শন করার জন্য প্রযত্ন করা আবশ্যক। সূক্ষ্ম শরীর দেখতে পাওয়া সম্ভব, তাকে অনুভব করা সম্ভব। আপনি নিজের সূক্ষ্ম শরীর দেখতে পেতে পারেন, আবার অন্যের সূক্ষ্ম শরীরও দেখতে পারেন। আপনার শরীরের চারদিকে প্রভামণ্ডল দেখা যেতে পারে, অন্য লোকেরও প্রভামণ্ডল দেখা যেতে পারে।

একটি ছোটখাটো প্রয়োগের আলোচনা করব। আপনারা একাগ্রতা অভ্যাস করেছেন। আপনার কাছে কোন লোক গেল। আপনি অনিমেষ দৃষ্টিতে এক মিনিট ধরে তার দিকে চেয়ে থাকলেন। তাকে দেখার পরে আপনি চোখ বন্ধ করলেন। আপনার চোখ দুটি বন্ধই থাকল। তার প্রতিমূর্তি আপনার সামনে থেকেই গেল। তার শরীর আপনি দেখছেন না। তার আকৃতি দেখছেন না। কিন্তু যে ব্যক্তিকে আপনি দেখছেন তার শরীর প্রমাণ প্রতিরূপ আপনার চোখের সামনে আসবে। আপনি সেই প্রকাশমূর্তির চারদিকে নীল, কালো বা সাদা রঙের যে বলয় আছে তা আপনি দেখতে পারেন। এই প্রকার

একাগ্রতার সাধনা দ্বারা অন্য লোকের সূক্ষ্ম শরীর ও তার আভাবলয় দেখতে পাওয়া সম্ভব। নিজের শরীরও দেখা সম্ভব হয়। ঐ ধ্যান এক বিশেষ বিন্দুতে কেন্দ্রিত হয়, তাতে এক বিশেষ ধরনের স্থিতি উৎপন্ন হয়। তখন সাধকের সামনে তাঁর শরীরের এক বিশেষ তৈজস-প্রকৃতিও প্রকটিত হয়। তিনি চোখ বুঁজে থাকলেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তিনি তা দেখতে পান।

সূক্ষ্ম শরীর আর স্থূল শরীরের কি সম্বন্ধ তা জানা বিশেষ প্রয়োজন। সূক্ষ্ম শরীর কিভাবে স্থূল শরীরকে প্রভাবিত করে এবং স্থূল শরীর ও স্থূল মন কিভাবে জাগ্রত মনের সাধনার দ্বারা সূক্ষ্ম মনের প্রকম্পনের নাগাল পেতে পারে, এ সব বিষয় জানা অত্যন্ত আবশ্যক।

৯

প্রেক্ষা প্রয়োগ

দুটি তত্ত্ব কাজ করে—দেখা এবং জাগা। আমরা একই সময়ে দেখি ও জেগে থাকি। আমরা গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাব যে দেখা ও জাগা দুটি পৃথক কাজ নয়, দুটি একই কাজ। এ দুটিই প্রেক্ষাধ্যানে কাজ করতে থাকে। জাগা অর্থাৎ অপ্রমত্ত থাকা। এ মস্ত বড় কথা। 'সুত্তেসু যাবি পডিবুদ্ধজীবী।' ঘুমন্ত লোকের মধ্যে জেগে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি যদি আর একটু গভীরে যাই তবে এই বচনের এই অর্থ হবে যে, ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে আমাদের জেগে থাকতে হবে। অর্থাৎ চেতনার এমন এক শিখা জ্বালাতে হবে যাতে বাতাসের ঝাপটা তাকে নেভাতে না পারে। হাওয়া বয়ে যাবে, ঝড় উঠবে, তুফান উঠবে, ঝঞ্ঝা আসবে, তবুও আমাদের অন্তরে এমন জ্যোতি, এমন শিখা জ্বেলে রাখতে হবে যাকে কোন কিছুই নেভাতে পারবে না। এর নাম সাধনা। এই হল সাধনার ফল। আমাদের ভেতরে এমন জ্যোতির্ময় শিখা প্রজ্জ্বলিত করতে হবে যাকে বিশ্বের কোনও শক্তিই নির্বাপিত করতে সমর্থ হবে না। বাইরে যাই হতে থাক ভেতরে এই জ্যোতি অনির্বাণ জ্বলতে থাকবে। এ শিখা কখনই খণ্ডিত হবে না। তারও এক সাধনা আছে। তা

প্রেক্ষাব অভ্যাস, দেখাব অভ্যাস। কেবল জানাব সাধনা হয় না, কবাব সাধনা হয। শুধু জেনে নেওয়া পর্যাপ্ত, কবাও জরুবী বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপাব। কিছু কব। প্রযোগ কব। প্রয়োগের জন্য, জাগ্রত থাকাব জন্য কোন কথা গুরুত্বপূর্ণ।

আপন অস্তিত্ব থেকে শবীবকে ভিন্ন কবে দেখতে হলে এক প্রযোগ কবতে হবে। আমবা যদি অভ্যাস কবি তবে মৃত্যুকে দেখতে পাই। মৃত্যুকে দেখতে হলে, শবীব থেকে নিজেব অস্তিত্বকে পৃথক কবে দেখতে হলে তাব জন্য প্রযোগ আবশ্যক। সে হল জাগৃতিব প্রযোগ, অপ্রমাদেব প্রযোগ।

ক্ষুধা লাগে বলে আমবা খাই। খিদে লাগে শবীবেব। আমাব খিদে লাগে না। অন্য কোনও বস্তুব ক্ষুধা লাগে। যদি প্রাণশক্তি থাকে, যদি শবীব থাকে তবে ক্ষুধা লাগবেই। চেতনাব ক্ষুধা বোধ হয না। শবীবেব খিদে পায আব চেতনা দেখতে থাকে কিসে তাব ক্ষুধা পায আব কিসে ক্ষুধা পায না। চেতনাব স্থিতি যদি অভিব্যক্ত হয, যদি তাব জ্যোতি জ্বলে ওঠে, সে ক্ষুধাকে দেখে আব সঙ্গে সঙ্গে অনুভব কবে, ক্ষুধাবোধ তাব নয, সে স্বযং তৃপ্ত, সদা তৃপ্ত, কখনও তাব অতৃপ্তি নেই, ক্ষুধাবোধ নেই। এই স্থিতিব অনুভূতিই প্রকৃতপক্ষে তপস্যা। চেতনাকে এভাবে জাগিযে তোলা যাতে সে দেখতে পাবে কাব ক্ষুধা পেযেছে—এ এক খুব বড তপস্যা।

লোকে ঘুমোয, শুযে থাকে, মূর্চ্ছিত হয। আচার্য কুন্দকুন্দন একেবাবে মর্মেব কথা লিখেছেন। সে কথা বোঝা সহজ নয। তিনি লিখেছেন, আহাব বিজয, নিদ্রাবিজয এবং আসন বিজয যে না জানে সে জৈনশাসন জানে না। সে ভগবান মহাবীবেব বাণী বুঝতে পাবে না, তাঁকে বুঝতে পাবে না। এ তুচ্ছ কথা নয, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা। যে আহাববিজয, নিদ্রাবিজয ও আসনবিজযেব তাৎপর্য বুঝতে না পাবে সে জৈন শাসন বোঝে না, জানে না।

আহাববিজয—সাধনাব দিক থেকে এ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ

কথা। শবীব শবীবই বটে। আহাব ছাড়া দেহ বাঁচতে পাবে না। এই স্থিতিতে আহাববিজয কি ভাবে? আহাববিজয় কবতে না পাবলে কেউ জৈন শাসন বুঝতে পাববে না। এ দুটি কথা পবস্পববিবোধী বলে মনে হয। বস্তুত তাবা পবস্পব-বিপবীত নয। তাদেব মধ্যে সঙ্গতি আছে। যে ব্যক্তি ক্ষুধিত, খাইযে লোক ও চৈতন্যেব প্রভেদ কবতে না পাবে সে আহাববিজয কবতে সমর্থ হয না। যে আহাববিজয কবতে সক্ষম হয না তাঁব অনববত ক্ষুধা বোধ হয। সে উপবাস কবলেও তাব নিবন্তব ক্ষুধাব অনুভূতি হতে থাকে, আব ক্ষুধাব অনুভূতি হতে থাকলে তাপেব অনুভূতি কোথা থেকে হবে? কবে হবে? কি কবে হবে? খাবেও না, না খাওযাব জন্য সর্বদাই ক্ষুধাব দ্বাবা পীড়িত বোধ কববে না, তবেই হবে আহাববিজয। যখন আমাব এই ভেদ স্পষ্ট অনুভূতিতে আসবে যে, যাব ক্ষুধা লেগেছে সে এবং আমি এক নয, দুই ভিন্ন লোক, তখনই আমাব আহাববিজয সম্পূর্ণ হবে। আমাব কখনও ক্ষুধা বোধ হতে পাবে না, আমি কখনও ক্ষুধাব দ্বাবা পীড়িত বোধ কবি না। এই তথ্য ভেদ প্রযোগ দ্বাবা স্পষ্টভাবে বোঝা যায। আমবা যেন না খাই এবং না খেযে এই প্রযোগ কবি। ভগবান মহাবীব তপস্যা এবং উপবাসেব ওপবে এত গুরুত্ব আবোপ কবেছেন যে মনে হয তপস্যাও তাঁব এক প্রযোগ। উনি এক প্রযোগ কবেছেন যে, না খেযে স্থিতিতে অধিষ্ঠিত থেকে চৈতন্যকে কতটা অনুভব কবা সম্ভব হয, এবং ক্ষুধা দ্বাবা যে সকল ব্যাধি হয, ক্ষুধা থেকে সঞ্জাত সে সকল পীড়া থেকে নিজেব অস্তিত্বকে কতটা পৃথক বা মুক্ত বাখা যায। তপস্যা তাঁব এক প্রযোগ। শুধু না খাওযা, শুধু উপবাস কবা তপস্যা নয। নিবন্তব ধ্যান ও আমি খাই না এবং না খাওযাব জন্য আমাব কোনও কষ্ট হয না, এই জাগবূকতা তাব সঙ্গে সংযুক্ত হলে তপস্যা হয। অনাহাবকষ্ট কাব হচ্ছে? এই কষ্ট কে অনুভব কবছে? এই তথ্য সুষ্ঠু-ভাবে বোঝা তপস্যাব এক প্রযোগ। এই কথা যে লোক বুঝতে পাবে সে আহাববিজয কবতে সমর্থ হয। সে জৈন শাসনেব মর্ম বুঝতে

সমর্থ হয়।

আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় নিদ্রাবিজয়। যে নিদ্রাকে জয় করতে পারে না সে জৈন শাসন বুঝতে পারে না। শরীর আছে, সুতরাং এ সম্ভব নয় যে প্রত্যেক লোকই নিদ্রাকে জয় করবে। অকপটে স্বীকার করতে হয় যে কিছু লোক আছে, যাদের নিদ্রা হয় না বা খুব অল্প নিদ্রা হয়। সবাই ঘুমোয়। যাঁরা বড় বড় তপস্বী হয়েছেন তাঁরাও ঘুমোতেন। তা হলে এটা কি করে হতে পারে যে লোক নিদ্রা জয় করতে পারে নি সে জৈন শাসন বুঝতে সক্ষম হবে না ?

'আচারাঙ্গ সূত্রে' একটি বচন আছে—'সুত্তেষু জাগরমাণে'—নিদ্রিত লোকের মাঝখানে যে জেগে থাকে অথবা যে নিদ্রিত অবস্থাতেও জেগে থাকে। মানুষ তিন প্রকার—সুপ্ত, জাগ্রত এবং সুপ্ত-জাগ্রত। সুপ্ত—যে নিদ্রিত, জাগ্রত—যে জেগে আছে, সুপ্ত-জাগ্রত—যে নিদ্রিত অবস্থাতেও জেগে আছে। মুনির এমন হওয়া উচিত যে সে নিদ্রিত হয়েও জেগে থাকবে। সে শুয়ে থাকে, ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু অনুভব করে, 'আমি জাগ্রত, আমি জেগে আছি।' এক মুহূর্তের জন্যও তার মনে হয় না যে সে ঘুমিয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তে অনুভব হতে থাকে, 'আমি জেগে আছি।' এ খুব বড় সাধনা। যে ব্যক্তি এ রকম সাধনা করে থাকে সে ছয় ঘণ্টা অনবরত ঘুমিয়ে থাকলেও তার অনুভূতি হয় 'আমি জেগে আছি,' সে এক মহৎ উপলব্ধির অধিকারী হয়। অর্থাৎ স্থূল চেতনা ঘুমোয়, শরীর ঘুমোয়, কিন্তু যে জ্যোতি অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে তা নিরন্তর জাগ্রত থাকে এবং অনুভব করে, 'আমি জেগে আছি।'

'সুত্তেসু যাবি পডিবুদ্ধজীবী'—সুপ্ত হয়েও প্রবুদ্ধ হয়ে জীবন ধারণ করুন, ঘুমিয়ে থেকেও জেগে থেকে বাঁচুন। যে এই সাধনা করেছে সে জৈন শাসনের মর্ম বুঝতে পেরেছে, সে নিদ্রাবিজয়ী হতে পারে। এরও প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন, অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োগ ও অভ্যাস ছাড়া কেউ নিদ্রাকে জয় করতে সক্ষম হয় না। আমরা

প্রতিদিন শোবার সময় সঙ্কল্প করব যে জাগ্রত থেকে ঘুমোব, নিদ্রিত অবস্থাতেও অপ্রমত্ত থাকব, সম্বিত থাকবে যে আমরা জেগে আছি।' এক দিনে কোনও নিষ্পত্তি হবে না। অনেক দিন ধরে প্রয়োগ করতে হবে। দীর্ঘ কাল অভ্যাস করতে হবে। আর দ্বিতীয় কোনও লোকের-সঙ্গে এই প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব না। কারও সঙ্গে আলোচনা করলে সে বলবে, 'লোকটা কি রকম পাগল।' ঘুমিয়ে থেকেও জেগে থাকার কথা পাগলামি নয় তো কি? আপনি ঐ প্রয়োগ করতে থাকুন। এমন হতে পারে আপনার সফলতা লাভ করতে এক মাস, দু মাস, ছয় মাস, এমন কি পুরো এক বছর লাগতে পারে। এমন এক দিন আসবে যখন আপনি স্বয়ং অনুভব করবেন যে আপনি নিদ্রিত থেকেও সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত আছেন, ঘুমিয়ে থেকেও আপনি জেগে আছেন। আমি এ কথা বলতে পারি না ছয় ঘণ্টা নিদ্রিত থাকার কালে পুরো ছয় ঘণ্টাই জাগ্রত অবস্থার স্থিতি হবে। কিন্তু আমি এটা বলতে পারি কিছু সময় এমন যাবে যে, আপনি নিদ্রিত থেকেও অনুভব করবেন আপনি জেগে আছেন।

আমি জাগ্রত থাকার বিষয়ে আলোচনা করলাম। এর পরে আমি ক্ষেত্রের, সেই সন্ধি-স্থলের কথা বলছি, যেখানে চেতন ও অচেতনের সঙ্গম হয়। চেতন এবং অচেতনের ঐ সন্ধিস্থল কি রকম হবে এটা বোঝা দরকার। কোন্ সে বিন্দু যেখানে এই দুয়ের মিলন হয়? আহার কার্যের সঙ্গে তুলনা করে এ বিষয় বোঝানো যেতে পারে। চেতনের ক্ষুধা লাগে না। চেতন আহার করে না। ভোজন চেতনের কাজ নয়। আহার প্রাণশক্তির কাজ। এ দিকে চেতনা আছে, অপর দিকে শরীর-আছে, আর আছে সেই প্রাণের ধারা যার ক্ষুধা পায়, যে খায়।

চোখ দেখে। ইন্দ্রিয়গুলি আপন আপন কাজ করে যায়। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বলে কিছু নেই। তাদের জানার শক্তি নেই। চেতনার চোখ নেই, আর তার চোখের কোন প্রয়োজনও নেই। যদি চেতনার

চোখের প্রয়োজন থাকত তাহলে বলতে হতো অশরীর একেবারে অন্ধ, কিছুই দেখতে পায় না। চেতনার কোন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নেই, আর ইন্দ্রিয়ের জানার, জ্ঞান লাভ করার কোনও ক্ষমতা নেই। কিন্তু এমন এক সন্ধিস্থল আছে যেখানে চেতনার প্রাণধারার বিন্দু এবং ইন্দ্রিয়ের প্রাণধারার বিন্দু মিলিত হয়। এই ইন্দ্রিয়ের বিন্দু এবং চেতনার বিন্দুর সন্ধিস্থলকে আয়ত্ত করার চেষ্টা কর। শ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গমস্থলকে আয়ত্ত কর। চেতনার শ্বাসের প্রয়োজন নেই। চেতনা এমন দীপ নয় যে তাতে তেল দিলে তবে জ্বলবে, তেল না ঢাললে জ্বলবে না, নিভে যাবে। চেতনা তো অখণ্ড জ্যোতি। সে আপনা আপনি জ্বলে। তার জন্য শ্বাসের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শ্বাসের প্রাণধারা আর চেতনার সঙ্গমস্থল বা সন্ধিস্থল আছে। তাদের মিলনবিন্দু আছে, তাকে আয়ত্ত কর। এই সব বিন্দু আমাদের জাগৃতির বিন্দু হতে পারে। যদি এই বিন্দুর ওপরে প্রয়োগ করা যায় তবে তা জাগৃতির একটি বিরাট বড় প্রয়োগ হবে, আর এই প্রয়োগের দ্বারা আমরা ঐ সূত্রকে সম্পর্ক করতে সমর্থ হব, আর শরীর এবং আত্মা ভিন্ন বস্তু—এই কথার অর্থ বুঝতে পারব। তা ছাড়া আমার এ কথা রটনা মাত্র থেকে যাবে। আমরা যখন চেতনা ও শরীরের মিলনবিন্দু ধরতে পারব তখনই আমরা তাদের ভিন্নতা বুঝতে পারব, তার আগে নয়।

সেই মহৎ মিলনবিন্দু হল—ভাষা। চেতনা কথা বলে না। যে কথা বলে সে চেতনা থেকে ভিন্ন। যে বিন্দুতে ভাষা এবং চেতনার সঙ্গম হয় সেটি একটি মহত্ত্বপূর্ণ বিন্দু। ভাষার মধ্যে যে শক্তি নিহিত থাকে সে শক্তি চেতনা থেকে আসে। উভয়ের সঙ্গমস্থলকে আমাদের বুঝতে হবে, তাদের মিলনবিন্দুকে আমাদের ধরতে হবে।

চেতনার সঙ্কল্প বা বিকল্পের প্রয়োজন নেই। তার ইচ্ছাও হয় না। চেতনার সঙ্কল্পও হয় না। ও সব কিছুই মনের কাজ। চেতনার মনকে প্রয়োজন নেই। কিন্তু চেতনা ব্যতীত মন নিষ্কর্মা হয়ে যায়। তার নিজস্ব এমন কোন ক্ষমতা থাকে না যে সে সংকলন করবে, ইচ্ছা

করবে, কল্পনা করবে অথবা সঙ্কল্প করবে। তারও এক মিলনবিন্দু আছে।

আহার, শ্বাস, ইন্দ্রিয়, ভাষা এবং মন—এই পাঁচ মিলনবিন্দুকে আমরা ধরব। নিদ্রা এবং জাগরণের মিলনবিন্দু আমরা আয়ত্ত করব এবং নিদ্রিত অবস্থার ভেতরে জেগে থাকব। এই দিকে আমার চেষ্টা চলতে থাকবে।

আমি পাঁচ-ছয় দিক থেকে আপনাদের প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের যদি এই সব দিকে প্রয়োগ চলতে থাকে তবে এমন একদিন আসতে পারে, এমন এক ক্ষণ আসতে পারে যখন আমি অনুভব করতে সমর্থ হব যে আমার চেতনা এবং আমার শরীর দুটি পৃথক বস্তু। আমি এবং আমার শরীর দুটি পৃথক বস্তু। আমি এবং আমার দেহ দুটি আলাদা জিনিস। তা না হলে আত্মা ও শরীরের ভিন্নতার কথা, আত্মা আর দেহের পার্থক্যের কথা শুধু আমাদের মেনে নেওয়ার ব্যাপার, আমাদের ধারণার ব্যাপার হয়ে থাকবে। তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে আমরা সক্ষম হব না। ঐ কথা আমরা বারে বারে আবৃত্তি করতে থাকব, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারব না।

এ সবই জাগৃতির সাধনা বা অপ্রমত্ত থাকার সাধনা। ভগবান মহাবীর বলেছেন—সর্বদা অপ্রমত্ত থাকবে। যার চেতনার দীপ সর্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকে সে-ই শুধু অপ্রমত্ত থাকতে পারে। যখন চেতনার ওপরে কোন আবরণ পড়ে, মূর্চ্ছা এসে যায়, তখন চেতনা অগ্রসর হতে পারে না।

এক সুফি সন্ত ছিলেন রাবেয়া। তিনি রোদন করতেন এবং হাসতেন। দুই-ই এক সাথে চলতে থাকত। লোকে বলত, এ বড় অদ্ভুত কথা। কোন মানুষ যদি হাসতে থাকে তবে সে কাঁদে না। কেউ যদি কাঁদতে থাকে তবে সে হাসে না। কোন লোকই হাসা এবং কাঁদা এই দুই কাজ এক সঙ্গে করে না। সে যদি কাঁদে তো কাঁদতেই থাকে, আর যদি হাসে তো হাসতেই থাকে। কিন্তু এই

বাবেযা একই সাথে হাসতেন ও কাঁদতেন। প্রশ্ন হল : দুই কাজ, হাসা ও কাঁদা, এক সঙ্গে কেন? বাবেযাকে প্রশ্ন কবা হযেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'তোমবা আমাকে বুঝবে না। আমি একই সঙ্গে দুই বকম কাজ কবি, কিন্তু আমি পাগল নই। আমি দেখি পবমাত্মা সব জাযগায ছড়িযে আছেন, তাঁব সত্য সব জাযগায বিস্তৃত হযে আছে। এই দৃশ্য যখন দেখি তখন হাসি। আমাব মনে হয এই জগৎ কত সুন্দব ও বহস্যময। তোমাদেব যখন দেখি তখনই কাঁদতে থাকি, ভাবি, এত স্পষ্ট ভাবে তিনি দেখা দিচ্ছেন, কিন্তু তবু তোমবা তাঁকে দেখতে পাও না। তিনি এত স্পষ্ট ভাবে দেখা দিচ্ছেন, কিন্তু তোমবা অন্ধ হযে তাঁকে দেখতে পাও না। এই দেখে আমাব কান্না পেযে যায।'

আমাদেবও একই বকম অবস্থা হযে আছে। চেতনা থেকে শবীব আলাদা। এ দুটোই স্পষ্ট। চেতনা স্পষ্ট, তাব অস্তিত্ব স্পষ্ট, তাব কাজও স্পষ্ট। আবাব শবীবও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। কিন্তু আমবা এই পার্থক্যেব বিন্দু ধবতে পাবি না। আমি বলি কি মিলনবিন্দুকে ধব, সঙ্গমস্থলকে আযত্ত কব। কত স্থূল কথা। কিন্তু তবুও ধবতে পাবি না। মিলনবিন্দু কোথায তা উপলব্ধিতে আসে না। কোথায বিচ্ছিন্নতা, এই স্থূল তথ্যও আমবা বুঝতে পাবি না। যদি চেতন আত্মা আব অচেতন শবীবেব সঙ্গমস্থল আমবা ধরতে পাবি, সন্ধিস্থল জানতে পাবি, মিলনবিন্দু বুঝতে পাবি, তবে ঐ দুযেব বিভিন্নতাও জানতে আমবা সফল হব।

যে মৃত্যুকে দেখতে পায না, সে মৃত্যুভযে অত্যন্ত ব্যাকুল হয। যখনই তাকে কেউ বলে, তোমাব মৃত্যু হবে, সত্যি সত্যি সেই মুহূর্ত থেকে তাব মৃত্যু শুরু হযে যায, তাব মনেব ওপবে মৃত্যু নামতে শুরু কবে। যখন মনে হয মৃত্যু আসছে, তাব সাবা শবীব ভযে বিকৃত হযে যায। শবীব শক্ত হযে যায। শবীব কেন শক্ত হয? সে মাবা যাচ্ছে বলে নয, মৃত্যুভয় তাব শবীবকে শক্ত কবে দেয। উদ্বেগ এনে দেয। মৃত্যুব প্রক্রিয়া এই—শবীবকে ঢিলে কবে দেয, শিথিল কবে

দেয, আব আমাদেব চেতনা এমনভাবে তৈবি কবব যে, আমাদেব আত্মা শবীব থেকে আলগা হযে গেলেও মনে হবে কিছুই হয নি। শবীব তো শিথিল হযেছে। আব আমবা তো শুরু থেকে মবাব জন্য প্রস্তুত হযেছি। শবীব শিথিল হওযাব অর্থ, মৃত্যুব জন্য তৈবি হওযা। যে সর্বদা মৃত্যুব জন্য প্রস্তুত থাকে তাব শবীবে বিকৃতি হয না, উদ্বেগ হয না, ভয হয না। কোন কিছুই হয না। এই জন্য জৈন আচার্যগণ মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। মৃত্যু সম্বন্ধে একটি বই হল, 'মৃত্যু মহোৎসব।' মৃত্যু এক মহোৎসব। তা মহোৎসব, কিন্তু তুমি তা থেকে ভীত হও, এ কি বকম ব্যাপাব। মহোৎসব হবে মঙ্গলগীত, প্রীতি, উল্লাস, আনন্দপূর্ণ আলাপ। কিন্তু ভযেব কথা তো হতে পাবে না। মৃত্যু মহোৎসব বটে। তা থেকে আবাব ভয কি ?

জগদীশ কাশ্যপ নামে মস্ত বড এক বৌদ্ধ জ্ঞানী ছিলেন। তাঁব সদ্য দেহাবসান হযেছে। একবাব তিনি এক পত্র দ্বাবা আমাদেব জানিযে-ছিলেন, 'আমি অন্তিম সমযে জৈন পদ্ধতিতে সমাধি মৃত্যুতে মবতে চাই। সেই জন্যে আপনি ঐ পদ্ধতি সম্পূর্ণ লিখে জানিযে দিন। কাবণ মৃত্যুব জন্য প্রস্তুত হওযাব যেবকম বিববণ জৈন সাধনা পদ্ধতিতে দেওযা হযেছে সম্ভবত অন্যত্র তা দুর্লভ।'

জৈন সাধনায মৃত্যুব জন্য প্রস্তুতি বাব বছব আগে থেকে আবম্ভ হযে যায। বাব বছব আগে থেকে মৃত্যুব জন্যে প্রস্তুতি। অর্থাৎ মৃত্যু এমন একটি ঘটনা যাব জন্যে প্রস্তুত হতে বাব বছব লাগা উচিত। এ কথা যথার্থ।

আপনাবা দেখে থাকবেন, ছোটখাটো অপাবেশনেব আগেও অনেক বড় প্রস্তুতি আবশ্যক হয। অপাবেশন হবে একটি অঙ্গেব, কিন্তু তাব জন্য ডাক্তাবকে বেশ বড ধবনেব প্রস্তুতি নিতে হয। এক অপাবেশনেব জন্যে কত ডাক্তাব, কত নার্স, কত উপকবণ, কত যন্ত্র, কত ওষুধ তৈবি বাখতে হয। তাব কাবণ, একটি অবযবেব অপাবেশনেব ফলে অন্যত্র কোন অবযবেব ওপবে প্রভাব পডতে পাবে। তাকে নিবাপদ বাখাব

জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

মৃত্যু সমস্ত শরীরের ওপরে অপারেশন। সমস্ত শরীর থেকে সম্পূর্ণ চেতনার নির্গমন, চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নকরণ—এ কত বড় অপারেশন। এর জন্য বার বছর ধরে প্রস্তুতি প্রত্যাশিত। একে সংলেখনা বলা হয়ে থাকে। সংলেখনার কাল—বার বছর। বার বছর আগে থেকে এভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়া হয় যাতে সাধনাপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ফলপ্রদ হয়। বার বছর ধরে অনশন করতে হয়, তারপরে সমাধি-মৃত্যু। কত মহৎ প্রস্তুতি। কত সুন্দর ক্রমবিন্যাস। এ বিষয়ে কেন এত লেখা হয়েছে? কেন এত বলা হয়েছে? এর কারণ কি? আমরা কারণ বুঝে নিতে চেষ্টা করি। কারণ এই যে, মৃত্যু সব চেয়ে বড় মূর্চ্ছা। মৃত্যু সবচেয়ে বড় বেহুঁশ অবস্থা। এই বেহুঁশ হওয়ার মুহূর্তে যাতে আমাদের চেতনার দীপ নিভে না যায়, আমরা মূর্চ্ছিত না হই, আমরা জেগে থাকতে পারি, তার জন্য এই প্রস্তুতি। মৃত্যুর ক্ষণে যে জাগ্রত থাকে সে চিরকাল জেগে থাকে। যে মৃত্যুর মুহূর্তে জেগে থাকতে পারে সে চিরকালের জন্য অপ্রমত্ত স্থিতি লাভ করে, সর্বকালে জাগ্রত থাকে। এই রকম জাগৃতির ক্ষণের জন্য আমাদের সমস্ত প্রস্তুতি চলতে থাকে।

অপারেশনের সময় রোগীকে বেহুঁশ করবার জন্য তাকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে দেওয়া হয়। আজকাল অন্য রকম উপায় অবলম্বন করা হয়। রোগীকে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করে মূর্চ্ছিত করা হয় এই জন্য যে, ঐ অপারেশনের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা তার সহ্য হবে না। এতে যন্ত্রণার অনুভূতি হয় না। বিদ্যুৎ প্রয়োগের ফলে তার চেতনা লোপ পেয়ে যায়, সে শান্ত হয়ে যায়, আর খুব বড় অপারেশনও অত্যন্ত সহজভাবে সম্পন্ন হয়।

অপারেশনের জন্য মূর্চ্ছার অবস্থা আনতে হয় যাতে তার অপারেশনের জন্য কষ্টের অনুভূতি না হয়। সম্ভবত প্রকৃতি মেনে নিয়েছে যে, মৃত্যু মস্ত বড় অপারেশন, আর মূর্চ্ছা না হলে মানুষ কি করে যন্ত্রণা সহ্য করবে। এই কারণে মৃত্যুর পূর্বে কেউ দু ঘণ্টা, কেউ বা চার ঘণ্টা আগে,

কেউ বা দুদিন কিংবা চার দিন আগে বেহুঁশ হয়ে যায়, কেননা সমস্ত শরীরের ওপরে অপারেশন হচ্ছে, মৃত্যু আসছে। কেবল যে লোক জাগৃতির সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছে সে-ই বেহুঁশ হয় না।

অপারেশনের আগে সবাইকে বেহুঁশ করা হয়। কেবল যে জাগৃতির সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে তার কোন মূর্চ্ছাকারী ওষুধের প্রয়োজন হয় না, ইনজেকশনের প্রয়োজন হয় না বা বিদ্যুৎ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয় না।

আমরা এ রকম দেখেছি। এক মস্ত বড় শ্রাবক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল চাঁদমলজী বৈদ। তিনি বাজল দেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁর শরীরের কোন গুহ্য স্থানে অপারেশনের প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি ধ্যানমুদ্রায় অবস্থিত হয়ে ডাক্তারকে বললেন, 'আপনার যা করার আছে তা করুন। যতটা করবার প্রয়োজন ততটাই করুন। আমি বসে আছি।' ডাক্তার বললেন, 'তা কেমন করে সম্ভব হবে? এত বড় অপারেশন। অচেতন না করে, মূর্চ্ছিত না করে এ কেমন করে হবে? আপনি এই কষ্ট কি করে সহ্য করবেন?' তিনি বললেন, 'আমি ধ্যানে বসে আছি। আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার যা করার তাই করুন।' তাই করা হল। তিনি ধ্যানে বসে থাকলেন আর অপারেশন করা হয়ে গেল।

আমি স্বয়ং দেখেছি। যোধপুরে শ্রীকালুগণীর চাতুর্মাস ছিল। মুনি কুন্দনমলজীর অর্শের অপারেশন হওয়ার কথা ছিল। তিনি শুয়ে পড়লেন। তাঁর বড় ভাই মুনি চৌথমলজী আর মুনি মোহনলালজী অর্শ কাটতে শুরু করলেন। মুনি কুন্দনমলজী বললেন, 'সাধু ভাইসব, দেখো, পুরো লক্ষ্য রাখবে। কাজ অর্ধসমাপ্ত না থেকে যায়। যতটা কাটা দরকার সবটাই কেটে দেবে।' এও এক স্থিতি। মূর্চ্ছিত না হয়ে, জাগ্রত থেকে এই কষ্টের ধাক্কা সহ্য করা তখনি সম্ভব হয় যখন ভেতরে কিছু জেগে যায়।

কাশীর নরেশ সম্বন্ধে একটি গল্প বলছি। তাঁর অপারেশন হচ্ছিল।

ডাক্তাররা তাঁকে বেহুঁশ করার জন্যে ওষুধ শোঁকাতে চাইলেন। নরেশ নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, 'আমার গীতা এনে দিন। আমি গীতা পড়তে থাকব আর আপনি আপনার কাজ করতে থাকবেন।' তিনি গীতা পড়তে আরম্ভ করলেন এবং এমন এক জগতে চলে গেলেন যেখানে তাঁর শরীরে কি ঘটছে তা তাঁর খেয়াল রইল না। আমরা অন্তরে এই রকম জ্যোতি জ্বেলে দিলে সেই আলো জ্বলার পরে শরীরে কি ঘটছে তা কিছুই জানতে পারি না। যা ঘটার তা ঘটে। এই জাগৃতির ক্ষণ আমাদের জীবনে এসে গেলে আমরা আর মূর্চ্ছিত হই না। মৃত্যুবিজয়ের এ এক বড় সাধনা। যে লোক মৃত্যুর মুহূর্তে মূর্চ্ছিত হয় না, যে জেগে জেগে মৃত্যুকে বরণ করে, সে সত্যিসত্যিই কিছু পেয়ে যায়।

আমাদের সঙ্ঘের একটি ঘটনার কথা বলছি। এক মুনি ছিলেন। তিনি একজন মস্ত বড় তপস্বী ছিলেন। তিনি ছাব্বিশ বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। প্রতি বছর তিনি মাসখমন করতেন। তিনি তেরাপন্থের চতুর্থ গণী শ্রীমজ্জয়াচার্যের বড় ভাই মুনি ভীমরাজের সঙ্গে থাকতেন। ভীমরাজজীর দেহাবসান হল। দাহসংস্কারের জন্য লোকে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য এল। তপস্বী মুনি অন্যান্য মুনিদের ডেকে বললেন, 'দেখ, আমি এত দিন যাঁর সাথে রইলাম তিনি আজ চলে গেলেন। তিনি যখন চলে গেলেন তখন আমার আর এখানে থাকার কি প্রয়োজন? সাধুগণ, তোমরা এই সব পুথিপত্র রক্ষা করবে। আমি চলে যাচ্ছি।' এই কথা বলে তিনি স্বর্গে গেলেন। তিনি মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। লোকে আগের দাহসংস্কার করে ফিরতে না ফিরতে আর এক মুনি চলে গেলেন। একে বলে ইচ্ছামৃত্যু, সঙ্কল্পমৃত্যু। যে সব লোক জাগ্রত অবস্থায় মারা যান তাঁদের এই রকম মরণ হয়, তাঁরা সম্পূর্ণ জাগরূক অবস্থায় মারা যান।

এক মস্ত বড় সাধক ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'লোকে বেহুঁশ হয়ে মরে। আমি বেহুঁশ হয়ে মরব না। আমি চলতে চলতে মরব।' এক দিন তিনি দেখলেন মরণ আগতপ্রায়। সেই ক্ষণ যখন নিকটে এল

তখন তিনি ঘুমোতে আরম্ভ করলেন। নিদ্রিত অবস্থায় তিনি মরলেন। অনেক লোক বেহুঁশ অবস্থায় মারা যায়, কেউ ঘুমোতে ঘুমোতে মারা যায়। বসে বসে, দাঁড়িয়ে, চলতে চলতে অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় মারা যায় এমন লোকের সংখ্যা কম। আচার্য ভিক্ষুর পদ্মাসনাবস্থায় মরণ হয়েছিল। তিনি সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিলেন। প্রমাদগ্রস্ত অবস্থায় মরেন নি। তিনি 'সুত্তেষু যারি পডিবুদ্ধজীবী' অর্থাৎ সুপ্ত লোকদের মধ্যে জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। সুপ্ত অবস্থাতেও জাগ্রত লোক ছিলেন। যে লোক জাগৃতি ও সুষুপ্তির বিন্দু ধরতে পারে সেই শুধু মরার সময়ে জাগ্রত থাকতে পারে।

আমাদের সাধনার অভ্যাস চলছে। এই সাধনার অভ্যাসকালে আমরা দেখার এবং জাগ্রত থাকার সঙ্কল্প করেছি। আমরা দেখি আর জেগে থাকি। দেখার এবং জেগে থাকার সঙ্কল্প করি। এই দেখার এবং জাগার সঙ্কল্প একদিন সেই জ্যোতিকে জাগিয়ে দেবে যাকে কোন ব্যাধি বা মরণের আগমন নিভিয়ে দিতে পারে না। তারা কখনও বেহুঁশ হবে না, প্রচণ্ড হবে না, তাদের জাগৃতি কখনও খণ্ডিত হবে না। কিন্তু আপনি সতর্ক থাকবেন, আপনার অন্তরে জ্যোতি জ্বলে ওঠার আগে আপনি ঘুমিয়ে না পড়েন। এ একটি সমস্যা। এই সমস্যা সম্বন্ধে যদি আমরা জাগরূক তা থাকি তবে ঐ স্থিতি আমরা লাভ করতে পারব না। এর জন্য খুব দৌড়ঝাঁপ করার দরকার নেই, এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়ানোর দরকার নেই। কারও কাছে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এ নিজেকেই করতে হবে। আমার নিজেরই আত্মাকে দেখতে হবে। সত্যকে আমার নিজেরই সন্ধান করতে হবে। এই হল পথ।

যে নিজেকে আত্মার কথা বলে সে আপনাকে আত্মা দেখাতে পারে না। আপনি নিজে চেষ্টা করলে আত্মার দেখা পেতে পারেন। আপনি দুনিয়ার কোন কোণে চলে যান, কেউ আপনাকে সত্য দান করতে পারবে না। সত্যের সন্ধান আপনার নিজেকেই করতে হবে। অন্য

লোক আপনাকে কোন সঙ্কেত বলে দিতে পাবে, ইশাবা কবতে পাবে। বাস্তা দেখিযে দিতে পাবে, কিন্তু তাবপবেব প্রচেষ্টা আপনাকেই কবতে হবে, আপনাকেই পথ চলতে হবে। সমস্তই আপনাব চেষ্টার ওপবে নির্ভব কবে, আপনাব নিষ্ঠাব ওপবে নির্ভব কবে, আপনাব একাগ্রতা এবং তন্ময়তাব ওপবে নির্ভব কবে। আপনি মূর্চ্ছা ভাঙ্গতে কতখানি সমর্থ হযেছেন, জাগৃতিব আলো কতখানি প্রজ্জ্বলিত কবতে পেবেছেন, আলোকে সেই বিন্দুব ওপবে কতটা নিযে যেতে পেবেছেন, যেখানে সে আলো নিবন্তব জ্বলে, কখনও নেভে না—এই সমস্ত কিছুব ওপবে নির্ভব কবে। পবিস্থিতিতেই সেই কথা সার্থক হবে—'ভাকণ্ড পক্ষী উহ্ চবপ্পমত্তো' অর্থাৎ ভাকণ্ড পাখিব মত সদা জাগৃত থাক। যদি আত্মাকে বক্ষা কবতে চান, নিজেকে বাঁচাতে চান তো জাগ্রত থাকুন।

ভগবান মহাবীবেব বাণীব সন্দর্ভ থেকে যে সত্য বুঝতে পেবেছি, অনুশীলন কবেছি, অভ্যাস কবেছি সেই সত্য মনে বাখতে হবে। আব এই অভ্যাসেব ধাবাকে সর্বদা প্রবহমান বাখতে হবে। আমাব বিশ্বাস, আমবা একদিন সেই জ্যোতিকে প্রজ্জ্বলিত কবতে পাবব যে জ্যোতিকে বোগেব ধাক্কা নেভাতে পাববে না, মৃত্যুব ভযঙ্কর ঝঞ্ঝা নেভাতে পাববে না।

১০

অনুপ্রেক্ষা

আমরা এতক্ষণ প্রেক্ষা ধ্যানের প্রযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। এই প্রেক্ষাধ্যানের পদ্ধতিতে আমরা তিনটি তত্ত্বকে অবলম্বন করে থাকি। সে তিনটি তত্ত্ব—শ্বাস, ধ্বনি ও শরীর। আমাদের শ্বাস সহজ এবং স্বাভাবিক, ধ্বনি স্বকৃত এবং কাল্পনিক, আর শরীর সহজ এবং স্বাভাবিক। আমরা স্বাভাবিককে অবলম্বন করি না, স্বকৃত এবং কল্পনাকে অবলম্বন করে থাকি। আমি মনে করি তার প্রযোজন আছে, তাকে আমি অনাবশ্যক বলতে পারি না। আমরা মাঝে মাঝে এই তিন অবলম্বনের আলোচনা করে থাকি, আর আমরা যা করে থাকি তা বোঝার জন্য চেষ্টা করি। আজ আমরা ধ্বনির বিষযে আলোচনা করব। এই আলোচনা আমি ছোট একটি গল্প দিযে আরম্ভ করতে চাই।

কোন লোক পুকুরের ধারে বেড়াতে যেত। ওটা ছিল তার প্রতিদিনের নিত্যকর্ম। পুকুরের জলে তার প্রতিবিম্ব পড়ত। পুকুরে অনেক মাছ ছিল। একটি মাছ পুকুরের জলে মানুষটির প্রতিবিম্ব দেখত। সে দেখত—মাথা নিচে, পা ওপরে। একদিন দেখল, দু দিন দেখল, দশ দিন দেখল। তার ধারণা দৃঢ় হল। সে জানল যার

মাথা নিচে, পা ওপবে, সে মানুষ। একদিন লোকটি পুকুবেব কিনাবায বেড়াচ্ছিল। মাছটি সেই সমযে জলেব ওপবে ভেসে উঠল। তখন সে দেখল লোকটাব সব উল্টো, তাব মাথা ওপবে আব পা নিচে। মাছটি ভাবল—সম্ভবত লোকটি শীর্ষাসন কবেছে। তা না হলে মানুষ ও বকম হতে পাবে না। যাব মাথা নিচে, পা ওপবে সেই মানুষ। আজ আমি দেখছি এব মাথা ওপবে, পা নিচে। এ নিশ্চযই উল্টো বা বিপবীত ক্রিযা কবছে, শীর্ষাসন কবছে। তাব ধাবণা দৃঢ় হযে গিযেছিল।

ঐ মাছটিবই কেবল ঐ অবস্থা হযেছিল তাই নয। আমাদেব সকলেরই ঐ অবস্থা। মাথা ওপবে, কিন্তু আমবা দেখি মাথা নিচে। পা নিচে, কিন্তু আমবা দেখি পা ওপবে। আমবা ধাবণা কবে থাকি যাব পা ওপবে মাথা নিচে সে-ই মানুষ, আব যাব মাথা ওপবে পা নিচে সে মানুষ নয। এ আমাদেব কল্পনাব বচনা। এ বকম কত ধাবণা আমবা উদ্ভাবন কবি তা আমি বলতে পাবব না। ঐ সবই মিথ্যা ধাবণা। মিথ্যা ধাবণা বিলোপ 'কবাব জন্য প্রেক্ষাধ্যান পদ্ধতিতে অনুপ্রেক্ষাব অভ্যাস কবা হয। দুটি কথা আছে—প্রেক্ষা এবং অনুপ্রেক্ষা। আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি, প্রেক্ষা কথাটিব আগে 'অনু' কেন প্রযোগ কবা হযেছে ? এই বিষযে চিন্তা কবতে কবতে আমি একটা কথা বুঝতে পেরেছি—যা সত্য, তাকে দেখাই অনুপ্রেক্ষা। সত্যকে দেখ। নিজেব ধাবণাব বশবর্তী হযে তাকে দেখ না। মাছের ধাবণা হযেছিল যাব মাথা নিচে পা ওপবে সে-ই মানুষ। এই ধাবণা অনুসাবে সে মানুষকে দেখত। এই বকম স্বীয ধাবণা অনুযাযী বস্তুকে দেখা অনুপ্রেক্ষা নয। নিজেব ধাবণাব বশবর্তী হযে কিছু দেখ না। সংস্কাবেব দৃষ্টিতে দেখ না। কাল্পনিক বুদ্ধিতে দেখ না। কেবল সত্যেব দৃষ্টিতে সব কিছু দেখ। বাস্তবকে দেখ, যথার্থকে দেখ। যা সত্য, যে ঘটনা বাস্তবে ঘটছে তাকে দেখ। অনুপ্রেক্ষাব অর্থ—সত্যেব প্রতি অনুপ্রেক্ষা। অর্থাৎ সত্যেব প্রতি, যথার্থেব প্রতি অনুপ্রেক্ষা, বাস্তবেব প্রতি অনুপ্রেক্ষা। ধাব কবা ধাবণাব অনুবর্তী হযে কোনও কাজ কবো না,

যা ঘটনা, যা বাস্তব, যা সত্য, তাকে দেখ। এই বকম অনুপ্রেক্ষাব তাৎপর্য, আমবা আমাদেব মনগড়া ধাবণাকে মন থেকে বহিষ্কৃত কবে দিই। আপনি পূর্বেব ধাবণা ত্যাগ করুন এবং যা সত্য ও যথার্থ তাকে দেখুন। প্রেক্ষা ধ্যান পদ্ধতিতে এই অনুপ্রেক্ষাব অভ্যাস কবা যায়। অনুপ্রেক্ষা অভ্যাস কবাব কাবণ, তদ্বাবা আমবা সংস্কাবকে, ধাবণাকে ভঙ্গ কবে যা বাস্তব সত্য তাকে দেখতে শিখি। এটা সবচেযে কঠিন সত্য। সবচেযে দুঃখেব বিষয যে, মানুষ সত্যকে দেখে না। সে সবাব আগে স্বকীয ধাবণাব চশমা মনেব চোখে লাগিযে নেয, তাব পবে দেখা শুরু কবে। যা দেখে তা যদি স্বীয ধাবণাব অনুযাযী হয নি তবে তাকে দুমড়ে মুচড়ে নিজেব মনেব মত কবে নেয।

অনুপ্রেক্ষাব সিদ্ধান্ত যথার্থভাবে সত্যকে দর্শন কবাব সিদ্ধান্ত। সত্যেব কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ কব। নিজেব কোন ধাবণাতে কোনও গুরুত্ব আবোপ কবো না। যা সত্য তাকে গ্রহণ কব, স্বীকাব কব। তাব নাম অনুপ্রেক্ষা।

সমস্ত সংসাব প্রকম্পনেব সংসাব, অর্থাৎ অত্যন্ত চাঞ্চল্যপূর্ণ। এটাই পবম সত্য। কেবল কম্পন, কেবল চঞ্চলতা, কেবল অস্থিবতা। প্রকৃতিতে এত আন্দোলন, এত চঞ্চলতা যে, তাব কথা ভাবলে বিস্মযে চমকিত হতে হয। এতই প্রচণ্ড আন্দোলন যে যদি তা দেখতে থাকি, শুনতে থাকি তা হলে আমাব শাবীবিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যথিত হবে। আমাদেব পক্ষে এটা মঙ্গল যে আমাদেব কানেব পর্দা এ ভাবে তৈবি যে সে সব প্রকম্পনেব শব্দ গ্রহণ কবতে পাবে না। যদি মানুষ তাবৎ প্রকম্পন গ্রহণ কবতে পাবে তবে এক দিনেই সে খতম হযে যাবে। সে বেঁচে থাকতেই পাববে না। এই সংসাবে এত ভয়ঙ্কব শব্দ হচ্ছে, এত ভীষণ ধ্বনি হচ্ছে যে তা শোনাব ক্ষমতা আমাদেব নেই। আমবা ঐ শব্দ শুনতে বা সহ্য কবতে পাবব না। আমরা অনেক কষ্টে কিছু ডেসিমেল পর্যন্ত শব্দ গ্রহণ কবতে পারি, শুনতে পাবি। এই দুনিযায় অনেক অনেক ধ্বনি হচ্ছে। আমবা ঐ সমুদয ধ্বনি সহ্য

কবতে অসমর্থ। আমবা যখন চিন্তা কবি তখন এক প্রকম্পনেব ধাবা প্রবাহিত কবি। আমবা কথা বললে এক প্রকম্পনেব তবঙ্গ সঞ্চাবিত হয। আমবা চললে প্রকম্পন সৃষ্ট হয। আজ যাবা জীবলোকে বর্তমান আজ তাবাই যে শুধু প্রকম্পনেব বিস্তাব কবেছে তাই নয। এই দুনিযায যত লোক ছিল, হাজাব হাজাব বছব আগে যাবা জীবিত ছিল, তাবা এই দুনিযাব ওপবে এমন এক বিশাল প্রকম্পনেব জাল বিছিযে বেখেছে, আমাদেব গুরুত্বাকর্ষণমণ্ডলেব উপবিভাগে সেই প্রাচীন লোকেবা এমন বিপুল প্রকম্পনেব জাল বিস্তাব কবে বেখেছে যে, আজ তাব কোনও লেখাজোখা কবা যায না। তাব হিসাব কবাও কঠিন। কিন্তু আজকালকাব বিজ্ঞানে লেখাজোখা কবতে পাবে না এমন কোন জিনিসই নেই। বিজ্ঞান সব গূঢ বহস্য উদ্‌ঘাটনেব চেষ্টায নিযুক্ত আছে।

আজকাল কোন কোন বৈজ্ঞানিক ঐ প্রকম্পনেব পবিমাণ নিরূপণেব জন্য অনববত চেষ্টা কবে যাচ্ছেন। তাঁবা জানেন যে পৃথিবীব মাধ্যাকর্ষণমণ্ডলেব উপবিভাগে হাজাব হাজাব বছব আগেকাব লোকেব চিন্তাসমূহেব প্রকম্পন জমা হযে আছে, তাবা যা বলেছিল তাব প্রকম্পনও পুঞ্জীভূত হযে আছে। ঐ বৈজ্ঞানিকবা এমন এক উপায অন্বেষণ কবছেন, এমন যন্ত্র নির্মাণ কবাব চেষ্টা কবছেন যাব মাধ্যমে ঐ সমুদয প্রকম্পনের পবিমাপ কবতে সক্ষম হতে পাবেন, প্রাচীন কালেব সমস্ত চিন্তা ও বিচাব বুঝতে পাবেন, পডতে পাবেন। এই এই যন্ত্রেব মাধ্যমে তাঁবা জানতে চান যে আজ মহাবীব, বুদ্ধ, যীশুখ্রস্টেব যে সব বাণী জগতে প্রচলিত আছে সেগুলি যথার্থ কিনা, তাঁদেব বাণী লোকে যে বকম উপলব্ধি কবেছে সেটাই শুদ্ধ সত্য কিনা। তাঁবা জানতে চান মহাবীব, বুদ্ধ এবং খৃস্টেব যে বাণী সাধুবা প্রচাব কবেছেন তাঁবা কি সেই সব কথাই বলেছিলেন। এই দীর্ঘ কালেব মধ্যে তাঁদেব ভক্তবা তাঁদেব বাণীতে কোন কোন্ কথা জুডে দিযেছেন, কোন্ কোন্ কথাই বা ছেডে দিযেছেন, বৈজ্ঞানিকবা এই উপাযে সে সমস্ত জানতে সমর্থ হতে পাবেন। তাঁবা পবীক্ষা কবে, যাচাই কবে

ভালভাবে দেখতে চান কোন্ কথাই বা আসল বা মূল, আব কোন্ কথাই বা মিশ্রিত বা প্রক্ষিপ্ত। এই চেষ্টা চলছে। এ শুধু কল্পনাব ফানুস আকাশে ওড়ানো নয। এসব যথার্থ তথ্য। আজ বিজ্ঞান এতদূব এগিযে গিযেছে যে তাদেব পক্ষে কিছুই কল্পনাবিলাস মাত্র নয। বিজ্ঞান আজ আমাদেব কল্পনাকে সাকাব কবতে চলেছে। তাব কাছে সূক্ষ্মতম উপকবণ, সাধনেব যন্ত্র আছে।

আমি শুধু প্রকম্পন সৃষ্টি কবি তাই নয। সাবা দুনিযাব বাযুমণ্ডলকে শুধু আমি প্রকম্পিত কবি না। অনাদি কাল থেকে বাযুমণ্ডল আন্দোলিত হচ্ছে, প্রকম্পিত হচ্ছে। আমাব দ্বাবা সৃষ্ট প্রকম্পন তাব সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, বাযুমণ্ডলে জমা হচ্ছে।

এ অনেক পুবনো কথা। আমি 'বিশেষাবশ্যক ভাষ্য' নামে এক প্রাচীন গ্রন্থ পড়েছিলাম। ঐ পুস্তকে এক জাযগায পড়েছিলাম যে, আমবা যে নিঃশ্বাস ত্যাগ কবি তা সর্বত্র ছড়িযে পড়ে। পাশে পুকুব থাকলে ঐ নিঃশ্বাস-বাযু পুকুবেব জলে ছড়িযে পড়ে আব জলচব জীবদেব পীড়া দেয, তাদেব ব্যাকুল কবে। যখন আমবা কাপড় ছিঁড়ি তখন সূক্ষ্ম বোম হাওযায সব জাযগায ছড়িযে পড়ে এবং চাবদিকে জীবকে আঘাত কবে। এ বকম লেখা আছে যে, সজীব বনস্পতিব ওপবে অনিমেষ ধ্যান কবা উচিত নয, কাবণ অনিমেষ ধ্যানেব সাথে সাথে আমাদেব দেহ থেকে যে চুম্বকীয বিদ্যুৎ নিঃসৃত হয তা সজীব চাবা গাছেব জীবনকে ক্লেশ দেয, তাব শবীবে পীড়া সৃষ্টি কবে। এই কাবণে সেই পুস্তকে সজীব বস্তুব ওপবে ধ্যান কবতে নিষেধ কবা হযেছে। নিষ্প্রাণ বস্তুব ওপবে ধ্যান কবা উচিত। জৈন আগম গ্রন্থে বলা হযেছে মুনিদেব শুধু মাটিব ওপবে বসা উচিত নয, কাবণ শবীবেব গবমে মাটিতে জীবনেব পীড়া হয। সেইজন্য সাধুদেব কখনও অনাচ্ছাদিত মৃত্তিকায উপবেশন কবা উচিত নয। কত সূক্ষ্ম নীতিবোধ বা বিবেচনাব কথা। কাপড় ছেঁড়াব সমযে যে সূক্ষ্ম বোম হাওযাতে উড়ে যায তাতে প্রাণীবা আঘাত পেতে পাবে, এই কথাব অর্থ বুঝতে পাবে এমন

লোক তখন ছিল না। কিন্তু যখন দেখি বিজ্ঞানের উপলব্ধি, গবেষণা ও অন্বেষণমূলক প্রবন্ধে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে তখন আমাদের মনে হয় যে. আমাদের আচার্যগণ যা লিখেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের ক্ষমতায় লিখেছেন। তাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন. তাঁরা অনুভব করেছিলেন, এবং তাঁদের দৃষ্ট ও অনুভূত তথ্য নিজেদের আচারের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ঐ তত্ত্ব কঠিন এবং দুর্বোধ্য থেকে গিয়েছে। বাড়ির তেতলায় দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি নিচে দাঁড়ানো একজনকে বলল, 'ওহে, বাস আসছে, গাড়ি আসছে, অমুক লোক আসছে।' নিচের লোকটি বলল, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ। কোথায় বাস? কোথায় গাড়ি? অমুক লোকই বা কোথায়? কোন কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। তুমি মিথ্যা কথা বলছ।' ওপরের লোক যা বলেছে তাও যথার্থ, আবার নিচের লোকটি যা বলেছে তাও ঠিক। এ-ও মিথ্যা কথা বলছে না, অপরজনও মিথ্যা কথা বলছে না। উভয়ের দর্শনের মধ্যে যে ভিন্নতা তা হল, শুধু পৃষ্ঠভূমির প্রভেদবশত। তেতলায় দণ্ডায়মান লোকের দৃষ্টি বহু দূর পর্যন্ত যায়, তার ফলে সে বাস দেখেছে, গাড়ি দেখেছে এবং লোককে আসতে দেখেছে। নিচে মাটির ওপরে দণ্ডায়মান লোকের দৃষ্টি দূরে যায় না, তার ফলে সে বাসও দেখতে পায় না, গাড়িও দেখতে পায় না, মানুষও দেখতে পায় না। দুজনের জানাই ঠিক। কেবল দুজনের দেখার মধ্যে পৃষ্ঠভূমির ভেদ। যে বলছে, 'আমি দেখেছি', সে-ও সত্য কথা বলছে। আবার যে বলছে, 'আমি কিছুই দেখি নি', সে-ও সত্য কথা বলছে। দুজনের একজনও মিথ্যা কথা বলছে না। কেবল পৃষ্ঠভূমির প্রভেদ।

আমাদের পশ্চাৎভূমির তফাৎ হয়। যাঁরা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের গভীরতায় প্রবেশ করে চেতনার অন্তঃস্থলে গিয়েছেন তাঁরা যে সত্য উদ্‌ঘোষিত করেছেন, যে তথ্যের অভিব্যক্তি দিয়েছেন, যে রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন, যে সত্যের আবরণ উন্মোচন করেছেন, সবই আমরা

অস্বীকার করতে পারি, বলতে পারি ঐ রকম হয় না। কেননা যে পটভূমিকায় অবস্থিত থেকে তাঁরা ঐ সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘোষিত করেছেন, ঐ সমস্ত সত্য প্রকাশিত করেছেন সেই ভূমিতে আমি পৌছতে পারি না। ঐ ভূমিকা অনেক উঁচু। আমরা নিচে ধরাতলে দাঁড়িয়ে আছি। ধরাতলে দণ্ডায়মান লোক ঐ সব সত্যকে অস্বীকার করতে পারে। বস্তুত তারা অস্বীকার করেও থাকে। ঐরূপ করাতে তার কোন ত্রুটি হয়েছে এ কথা বলা যায় না। কারণ সে যে পটভূমিতে অবস্থিত, যে ধরাতলপরে যে দাঁড়িয়ে আছে, যে মাটিতে দাঁড়িয়ে সে দেখছে, তাতে তার ঐ রকম বিচার হওয়াই সম্ভব, তা থেকে ভিন্ন কিছু দর্শন হতে পারে না। তার বিচার অন্য রকম কিছু হওয়া সম্ভব নয়। যদি আমার সামনে জানলা খোলা থাকে, আর আমি জানলায় দাঁড়িয়ে থাকি তবে আমি বাইরের সমস্ত দৃশ্য দেখতে পাব, বলতে পারব, আমি পাহাড় দেখেছি, গাছ দেখেছি, মন্দিরের ধ্বজা দেখেছি, বালুর টিলা দেখেছি। আমার ও কথা যথার্থ হবে, বাস্তবিক হবে। কিন্তু যে লোক জানলা থেকে নিচে বসে আছে, সে পাহাড় দেখতে পাবে না, গাছ দেখতে পাবে না, মন্দিরের ধ্বজা বা বালুর টিলা কিছুই দেখতে পাবে না। সে বলবে, ওসব কিছুই নেই। কোন কিছুই সে স্বীকার করবে না। তার এই অস্বীকৃতিতে তার কোন দোষ নেই।

আমরা যদি এই ভূমিকাভেদ বুঝে চলি তবে এ কথা আমাদের বোধগম্য হবে যে, সূক্ষ্ম জগৎ এবং স্থূল জগতের যে ভিন্ন ভিন্ন স্বীকৃতি এবং ধারণা তা অকারণ নয়। তার পেছনে কারণের দীর্ঘ শৃঙ্খল আছে। আমরা সেই কারণ উপলব্ধি করে অনুপ্রেক্ষার কাছে যেন নিজেকে সমর্পণ করে দিই। আমরা প্রেক্ষা ধ্যান প্রয়োগ দ্বারা, অভ্যাস দ্বারা এমন এক সংস্কার তৈরি করে নেব যে আমরা সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারব। ধারণার মধ্যে আমরা যাব না। তাকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না। যে জিনিস যেমন, যে ঘটনা যেমনভাবে ঘটছে, যে জিনিস যেমন রূপে আমাদের সামনে আসছে, তাকে যদি তেমনি রূপে আমরা

স্বীকাব কবে নিই, তবে আমাদেব সাধনামার্গ প্রশস্ত হবে, স্পষ্ট হবে। সাধনাতে বড বাধা আসে অসত্য থেকে, মিথ্যা ধাবণা থেকে, মিথ্যা কল্পনা থেকে। ঐ সবকে একেবাবে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। সব পুবনো ধাবণাকে ভেদ কবাব জন্য নতুন ধাবণা তৈবি কবতে হবে, পুবনো সংস্কাবকে দুব কবাব জন্য নূতন সংস্কাব তৈবি কবতে হবে। পুবনো কল্পনাকে দূবীভূত কবাব জন্য নতুন কল্পনা নির্মাণ কবতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, পুবনো সব কিছু ভেঙ্গে ফেললে তাদেব জাযগায নতুন সব কিছু নির্মাণ কবা কেন। এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। আমবা যেন এই কথা মেনে চলি যে আমাদেব অন্তত সব পুবনো ধাবণা, সংস্কাব ও কল্পনা বর্জন কবতে হবে। কিন্তু ভেঙ্গে ফেলাব প্রক্রিযা এত সহজ এবং সবল নয। এব চাবধাবে এক বিশাল ব্যূহ ঘিবে আছে, তাব সাথে আমাদেব মোকাবিলা কবতে হবে। এক সংস্কাব ভাঙ্গাব জন্য অন্য আব একটি নতুন সংস্কাব বচনা কবতে হবে। ক্রোধেব সংস্কাব ভাঙ্গতে হলে ক্ষমাব সংস্কাব গডতে হবে। লোভেব সংস্কাব ত্যাগ কবতে হলে সন্তোষেব সংস্কাব নির্মাণ কবতে হবে। একটি সংস্কাব ভাঙ্গতে হলে অন্য আব একটি সংস্কাবে গডা প্রবোজন।

যাতে আমবা এক সংস্কাব বর্জন কবে অন্য আব একটি সংস্কাব গডতে পাবি তাব জন্য অনুপ্রেক্ষায ধ্বনিব প্রযোগ কবা হয। এই পবিস্থিতিতে আমাদেব ধ্বনিব মহত্ত্ব নির্ণয কবা প্রযোজন। ধ্বনি প্রকম্পন বটে। যেই আমবা কথা বলতে থাকি অমনি ধ্বনিব তবঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। ঐ তবঙ্গ বাযুমণ্ডলে ছডিযে পডে। উপবে ও নিচে, ডাইনে-বামে চাবদিকে ধ্বনিব প্রকম্পন ছডিযে পডে। ঐ প্রকম্পন অন্য বস্তুসমূহকে আঘাত কবে, তাদেব প্রভাবিত কবে। আপনাব প্রভাব বিস্তাব কবে। আমবাও ঐ ভাবে প্রভাবিত হই।

এটা সংক্রমণেব জগৎ। এই দুনিযায কেউ নিজেকে সংক্রমণ থেকে বক্ষা কবতে পাবে না। বাশিযায ক্রান্তি বা বিপ্লব হযেছিল। লোকে বলে এ লেনিনেব বিপ্লব, তাঁব সাথীদেব বিপ্লব। কিন্তু বাশিযাব

বৈজ্ঞানিকবা একটি নতুন কথা বলেন। তাঁবা বলেন, এ বিপ্লব লেনিনেবও নয়, তাঁব সঙ্গীদেবও নয়। সূর্যে বিস্ফোবণ হযেছিল এবং তাবই ফলে বাশিযায এই বিপ্লব ঘটেছিল। এই বিপ্লবেব মূল কাবণ সূর্যমণ্ডলে বিস্ফোবণ, কোনও মানুষ এব কাবণ নয। মানুষ ক্রান্তিব কাবণ নয। সূর্যে যখন যখন বিস্ফোবণ ঘটে তখন মানুষেব মস্তিষ্ক বিশেষভাবে প্রভাবিত হয। যে বছব সূর্যে ভযঙ্কব বিস্ফোবণ হয সে বছব সাবা পৃথিবীতে ভযঙ্কব মহামাবী, ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝা, ভযানক ভূমিকম্প হয। জাতিসমূহেব মধ্যে ভযঙ্কব যুদ্ধ ও সংঘর্ষ হয। এইভাবে সূর্যেব বিস্ফোবণই এই সমস্ত যুদ্ধ, তুফান, মহামাবী, বিপ্লব প্রভৃতি সংঘটিত কবে, মানুষ কবে না। আমবা অনেক বস্তুব দ্বাবা প্রভাবিত হই। যা কিছু সংঘটিত হয আমবা তাব দ্বাবা প্রভাবিত হই। আমবা অন্যকে প্রভাবিত কবি এবং নিজে অন্যেব দ্বাবা প্রভাবিত হই।

এই সংক্রমণেব জগতে কেউ সংক্রমণ থেকে বাঁচতে পাবে না। কোথাও এমন কোন বক্ষাকবচ নেই যাব বলে মানুষ ঐ সংক্রমণ থেকে নিজেকে বক্ষা কবতে পাবে।

ধ্বনি এক বকম কবচেব কাজই কবে। যাতে আমবা অন্যেব দ্বাবা কম প্রভাবিত হই সেজন্য আমবা ধ্বনিব কবচ তৈবি কবে নিতে পাবি। বোজ পশ্চিমে বাত্রিব সময আসে আব আমাদেব অনিত্য অনুপ্রেক্ষাব ক্রম আবম্ভ হযে যায। সব লোক তখন বসে এবং সঙ্কল্প কবে যে, অনিত্য অনুপ্রেক্ষা কবতে হবে। সব শান্ত এবং জাগ্রত। সব শান্ত এবং সচেতন। অনিত্য অনুপ্রেক্ষা আবম্ভ হয।

আমাদেব প্রথম সূত্র—ইমং শবীবং অণিচ্চ। এই শবীব অনিত্য। এই সূত্রেব ধ্বনিব সঙ্গে আমবা অনিত্য অনুপ্রেক্ষা আবম্ভ কবি।

আমাদেব দ্বিতীয সূত্র—ইমং শবীবং চযাবচযধম্ম্যম্। এই শবীব চযাবচযধর্মা। তাব চয বা সঞ্চয হয, অপচয বা ব্যয হয। তা পুষ্ট হয, ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয।

আমাদের তৃতীয সূত্র—ইমং শবীবং বিপবিণামধম্ম্যম্। এই শবীব

বিপরিণামধর্মা। এতে বিবিধ পরিণাম সংঘটিত হয়ে থাকে, নানাপ্রকার দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। কখনও শীতলতা দ্বারা পরিবর্তন ঘটে, কখনও বা উত্তাপের দ্বারা, কখনও ভোজনের দ্বারা পরিবর্তন ঘটে। কখনও বা অন্য কোনও পুদ্গলের সন্তাপে হয়। কখনও রোগ থেকে পরিবর্তন ঘটে, কখনও বা আমার নিজের ভাবনা থেকে পরিবর্তন আসে। আমরা ধ্বনির মাধ্যমে এই বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের অনুপ্রেক্ষা করতে পারি, দেখতে পারি, প্রত্যক্ষ করতে পারি। ধ্বনির সাথে সাথে সঙ্কল্পেরও বিকাশ হওয়া আবশ্যক।

আপনারা শুনে থাকবেন হিমালয় পর্বতের বরফের ওপরে নগ্ন সাধক উপবিষ্ট থাকেন। তাঁর চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। তিনি উত্তাপের প্রয়োগ শুরু করেন। এক ঘণ্টা যায়, দু ঘণ্টা যায়, তারপরে সাধকের দেহ থেকে ঘাম ঝরতে শুরু করে। বরফের ভেতরে ঘাম ঝরতে থাকে। এ প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। যদি প্রাকৃতিক ঘটনা হতো তাহলে শুধু একজনের শরীর থেকে ঘাম চোয়াতো না, সকলের শরীর থেকেই চোয়াতো। কিন্তু একজনের শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে, আর সকলেই শীতে কাঁপতে থাকে। এ প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। এ হল ধ্বনির প্রয়োগ, সঙ্কল্পের প্রয়োগ, সাধনার প্রয়োগ। এ হল ভাবনাত্মক পরিবর্তন, প্রাকৃতিক পরিবর্তন নয়।

গরমের দিন, ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে, লু বইছে। সাধক শীতলতার ভাবনা করেন, শীতের সঙ্কল্প করেন। তাঁর শরীরে শীতলতা ব্যাপ্ত হয়ে যায়, তিনি শীতে কাঁপতে থাকেন। তিনি কম্বল গায়ে দেন, কিন্তু তবুও কাঁপুনি থামে না। এ পরিবর্তন প্রাকৃতিক নয়, ভাবনাত্মক।

অদ্যাপি জীবিত এক ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার কল্পনায় ক্রুশবিদ্ধ হতো। তখন তার দু হাতে ক্ষত হতো, তা থেকে রক্ত ঝরত। বুক থেকেও রক্ত ঝরতে থাকত। শুধু শুক্রবারেরই এ রকম হতো। এ পরিবর্তন ভাবনাত্মক। সে লোকটি ত্রাণকর্তা খৃস্টের সঙ্কল্প করত, তার ফলে ঐ রকম ঘটনা ঘটত।

পা কাটে, পীড়া হয়। এখন পা কাটার সময় নয়, তবু আপনি

ভাবনাত্মক প্রযোগ কবে দেখুন। পা কাটুক বা না কাটুক, পাযে ব্যথা হবেই। যদি ভাবনাব ফলে ব্যথা হতে পাবে, তবে ভাবনাব ফলে ব্যথা সেবেও যেতে পাবে। দু বকম ঘটনাই ঘটা সম্ভব।

শবীব বিপবিণামধর্মা বা পবিবর্তনশীল। তাব নানা প্রকাব অবস্থান্তব ঘটে। আমাদেব দেখতে হবে কি কি কাবণে এবং কি কি ভাবে শবীবেব অবস্থান্তব ঘটে।

আমাদেব চতুর্থ সূত্র—ইমং শবীবং জবামবণধর্ম্যম্। এই শবীব জবা-মবণধর্মা বটে। দেহেব জবা হয, মবণ হয। আমবা তাকে অনুভব কবি। আমবা যদি শবীবকে এত শিথিল কবে দিই যে আমাদেব মনে হয আমবা মবণকে অনুভব কবছি, তাহলে ঐ বকম অনুভূতি হয। ঐ অনুভূতি হতে আবম্ভ কববে। তা প্রাকৃতিক পবিবর্তন নয। মবণ সত্যিই ঘটছে না। ঐ পবিবর্তন ভাবনাত্মক। যে অবস্থা বহুদিন পবে ঘটাব কথা, ভাবনাত্মক পবিবর্তন দ্বাবা, ভাবনাব অতিশয তীব্রতা এবং সঘনতা দ্বাবা আমবা সেই অবস্থা অনুভব কবতে পাবি।

এই অনিত্যব অনুপ্রেক্ষা বটে। যা ঘটছে, যা সংঘটিত কবা হচ্ছে, আমবা তাই দেখি। এতে ধ্বনিব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ আছে। এই জন্য আমি ধ্বনিব আলম্বন তথা কল্পনাব আলম্বন মেনে নিযেছি। আমবা একটি সীমা পর্যন্ত ধ্বনি এবং কল্পনাব আলম্বন উপেক্ষা কবতে পাবি না। ঐ সীমা পর্যন্ত আমাদেব মেনে নিতেই হয।

অর্হেব জপে লোকে ধ্বনিব সঙ্গে অর্হেব ভাবনা কবে থাকে, আবাব সূক্ষ্ম ধ্বনিব সাথে অর্হেব ভাবনা কবে, অধিকন্তু অর্হেব মানসিক ভাবনাও কবে। প্রত্যেক স্তরে আলাদা আলাদা অনুভূতি হতে থাকে।

আমি একবাব বলেছিলাম এই তীব্র ধ্বনি কবে দেওযা যাক। একবাব ঐ প্রযোগ স্থগিত কবে দিই। কিছু লোক বলেছিল, ঐ প্রযোগ চলাই প্রযোজন, কাবণ এটা ভাল লাগে, এতে একাগ্রতা সাধিত হয়, আব এটা স্বাভাবিক কথা। আমরা যেন মানুষেব এই স্বভাব ভুলে না যাই এবং বহুকাল-প্রচলিত স্থূল আলম্বন ত্যাগ কবে সূক্ষ্ম আলম্বন

গ্রহণ না কবি, কাবণ সহসা পবিবর্তন কবলে বেশিব ভাগ লোক সেটা গ্রহণ কবতে পাববে না। প্রেক্ষা ধ্যানেব পদ্ধতিতে এই বাস্তবিকতাব ধ্যান বাখা হয়েছে যাতে সাধক স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে যায়। যে স্থূল দেখছে সূক্ষ্ম সম্বন্ধে কথা তাব বোধগম্য হবে না। অনেকে অভিযোগ কবছে সহজ শ্বাস আযত্তে আসছে না, প্রকম্পনেব নাগাল পাচ্ছে না। এটা ঠিক কথা। শুরুতে ও বকম হবে না। আমাদেব সতর্ক থাকতে হবে যে, যে লোককে আমবা সাধনাব প্রেবণা দিই সে যেন সাধনাকালে ক্লান্তি বা বিবক্তি বোধ না কবে, বা নিবাশও না হয। যদি তাব মনে নিবাশা এসে যায তবে সে সাধনা কবতে পাববে না। যদি সে ক্লান্ত বা বিবক্ত বোধ কবে তবে সাধনায ছেদ পডবে এবং সে আব কখনও সাধনায প্রবেশেব নামও মুখে আনবে না। এইজন্য সাধকেব যাতে ক্লান্তি বা বিবক্তি না আসে, যাতে সাধনাব প্রতি সে আকৃষ্ট হয, যাতে সাধনাব প্রতি তাব অনুবাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পায সে বিষয়ে দৃষ্টি বাখা আবশ্যক। এই জন্য শুরুতে স্থূল আবম্বনেব আবশ্যকতা আমি মেনে নিয়েছি, যদিও আমাদেব দেখতে হবে যে স্থূলেতেই আমাদেব গতি রুদ্ধ হয়ে না যায। তাকে সূক্ষ্ম পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। কিন্তু সাধাবণ মানুষ সহসা স্থূলকে অতিক্রম কবে সূক্ষ্মে পৌঁছে যাবে এ কথা আপনাবা কল্পনা কবতে পাবেন না। আবম্ভেই সোজাসুজি সূক্ষ্মে পৌঁছে যায এবকম লোক বিবল।

এক সাধক তাব গুরুব কাছে গিয়ে বলল, 'আমি সাধনা কবতে চাই। আপনি আমাকে পথ দেখান। আমি কি কবব তাব নির্দেশ দিন।' গুরু শুনলেন। তিবস্কাবেব সুবে বললেন, 'তুমি কি কববে তা জিজ্ঞাসা কবতে এসেছ? কেন দেখিয়ে দিচ্ছি না? তোমাব কি চোখ নেই? কেন শুনতে পাচ্ছ না? তোমাব কি কান নেই?' সাধক বলল, 'আমাব চোখ আছে। আমি দেখতে পাই। কান আছে। আমি শুনতে পাই।' গুরু বললেন, 'আমাকে আবাব কি জিজ্ঞাসা কবছ? তোমাব সামনে কি দেখতে পাচ্ছ?' 'পাহাড় দেখতে পাচ্ছি।'

'কি শুনতে পাচ্ছ ?' 'ঝরণার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।' 'তাহলে চলে যাও। পাহাড় দেখ, আর নির্ঝরের ধ্বনি শোন। এই হল সাধনা।'

সাধক চলে গেল। সে পাহাড় দেখতে থাকল। ধ্বনি শুনতে থাকল। এইভাবে দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে সে অন্তিম বিন্দুতে পৌঁছে গেল।

মূল কথা—দেখা। ইচ্ছা করলে আমরা শরীরকে দেখতে পারি, পাহাড় দেখতে পারি, কোন ছবি দেখতে পারি। মূল মন্ত্র হল—দেখার অভ্যাস করা। দেখ এবং জান। আর কিছুই কোরো না। কেবল দেখ। দেখার সাথে আর কিছু জুড়ে দিও না। কেবল জান। জানার সঙ্গে অন্য কিছু জুড়ে দিও না। মূল কথা—জানা আর দেখা। ইচ্ছা করলে আমরা শরীর দেখতে পারি, শ্বাস দেখতে পারি। আবার প্রাচীরও দেখতে পারি। যাই দেখি তাতে কোন প্রভেদ হবে না। কিছুই যাবে আসবে না। দেখাই একমাত্র দ্রষ্টব্য ব্যাপার।

জৈন আগমে বলা হয়েছে মুনি যেন ভূমি দেখতে দেখতে চলেন। এটা পুরোপুরি ধ্যানের প্রক্রিয়া। তাকে গমন-যোগও বলা হয়। আমরা এ কথার অর্থ বুঝতে পারছি, কিন্তু এর পেছনে একটি মহৎ সত্য গোপন আছে। কোন লোক যদি অন্য কোন প্রকার সাধনা না করে, কেবল চলার সময়ে যদি দেখতে দেখতে চলতে থাকে, তবে ধ্যানের এক মহৎ সাধনা হয়ে যায়। ঐ সাধনা তাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে বলা হয়েছে সাধক পথ চলতে চলতে যেন গমনময় হয়ে যায়। তার সমস্ত শরীর-তন্ত্র তাতে চলন্ত হয়ে যেন গতিতে পরিণত হয়। যে লোক গমন-যোগ অভ্যাস করে, দেখতে দেখতে চলতে থাকে মানুষ না বলে গতি বলা উচিত। তাকে গমন বলা উচিত। কেবল গমন। সে কোন মানুষ নয়, সে শুধু গমন। এবংভূত ন্যায়ের দৃষ্টিতে, শুদ্ধ ন্যায়ের দৃষ্টিতে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ঐ লোককে তুমি কি বলবে ? মানুষ বলবে ? না, একেবারেই না। ও মানুষ কোথায় ? ও তো গতি মাত্র, শুদ্ধ গতি। আর অন্য কিছুই

নয। তাব না থাকে ইন্দ্রিযেব প্রযোগ, না থাকে মনেব প্রযোগ। তাতে পাঁচ প্রকাব ইন্দ্রিযেব বিষযও নেই, পাঁচ প্রকাব স্বাধ্যাযও নেই। কোন কথা নেই, জিজ্ঞাসা নেই, প্রশ্ন নেই, পুনবাবৃত্তি নেই। কোন অনুপ্রেক্ষাও নেই, ধর্মকথাও নেই। চোখেবও প্রযোগ নেই, কানেবও প্রযোগ নেই। দেখাও নেই, শোনাও নেই। যে ব্যক্তিব কোনও ইন্দ্রিযেব প্রযোগ নেই, মন এবং মস্তিষ্কেবও প্রযোগ নেই, ভাবাবও প্রযোগ নেই, সে তো কেবল গতি মাত্র। শেষ পর্যন্ত আব কিছুই থাকে না, থাকে শুধু গতি। ভাবা সমাপ্ত, মন সমাপ্ত, ইন্দ্রিযেব বিষয সমাপ্ত। শেষ পর্যন্ত থাকে শুধু গতি, কেবল গতি। সে লোক আব কিছুই দেখে না। কেবল ভূমি আব ভূমি দেখে। এই হল গমনযোগ।

আমি বলছি, আমবা যেন একটি মাত্র আলম্বন গ্রহণ কবি। আপনাবা যেন ধাবণা না কবেন কেবল শ্বাসই আলম্বন হতে পাবে। ঐ বকম ধাবণা কবলে অনুপ্রেক্ষা হবে না। যথার্থ বা সত্য ঘটনা সম্ভব হবে না। শ্বাসও এক আলম্বন। আপনি যদি কেবল গমনকেই আলম্বন বানিযে নেন তবে সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলম্বন হতে পাবে। হবিভদ্র সুবী বলেছেন, 'সব্বোহবি ধম্মবাবাবো মোক্খেণ জীযণাযো জীযো'—মুক্তিদাতা, দুঃখ থেকে মুক্তিদাতা, এ সবই ধর্মেব ব্যাপার যোগ। এ অনেক গভীব তত্ত্বেব কথা। এই সব মুক্তিদাতা মহৎ সত্যেব উদ্‌ঘাটন কবেছেন। আমবা কোন কিছুকে যদি আলম্বন বানিযে নিই, শেষ পর্যন্ত তাই আমাদেব চবম আলম্বন হবে।

আমি অন্য এক আলম্বনেব কথা বলছি। কোন লোক ধ্যান কবে না, স্বাধ্যায কবে না, বা অন্য কিছু কবে না। সে যদি কেবল একটি কথা আঁকড়ে ধবে থাকে, 'আমি কেবল রুটিই খাব, আব কিছু কবব না', তবে আমাব মনে হয় তাব একটা ধ্যানেব ফল মিলে যাবে যে, আমবা তাব কল্পনাও কবতে পাবব না। সে চিন্তা কবে, 'আমি কেবল খাব, আব কিছুই কবব না।' কেবল খাওযাও খুব বড সাধনা হতে পাবে।

১১

রূপান্তরণের প্রক্রিয়া

এক গ্রামীণ শহরে এসে এক হোটেলে উঠল। রাত এল। তার ঘরে বাতি জ্বলছিল। শোবার সময় হল। সে ভাবল, বাতি নিভিয়ে দিই। সে বাল্‌বের কাছে গিয়ে ফুঁ দিল। আলো নিভল না। দু মিনিট পরে আরও জোরে ফুঁ দিল। তবুও দীপ নিভল না। আরও দু চার-বার ফুঁ দিল। কিন্তু আলো জ্বলতেই থাকল। হয়রাণ হয়ে আলো জ্বেলে রেখেই সে শুয়ে পড়ল। সকাল হল। হোটেলের বেয়ারা এল। গ্রামীণ তাকে বলল, 'ওহে, তোমাদের এ কি রকম দীপ? ফুঁ দিলেও নেভে না। এ দীপ অকেজো। আমার সারা রাত আলোতে কাটাতে হয়েছে।' বেয়ারা বলল, 'মহাশয়। ও প্রদীপ নয়, বিদ্যুৎ। ফুঁ দিয়ে ও আলো নেভান যায় না।' সে সুইচের কাছে গেল, বোতাম টিপল, অমনি বিজলি বাতি নিভে গেল।

গ্রাম্য লোকটি জানত না বিজলি বাতি কিসে নেভে, বা কিসে জ্বলে। সে জানত যাই আলো তাই প্রদীপ, আর ফুঁ দিলেই তা নিভে যাবে। যতক্ষণ আমরা না জানি ততক্ষণ আমরা দীপ জ্বালাতেও পারি না, নেভাতেও পারি না। না জানলে কিছুই করা সম্ভব হয় না।

অনুরূপভাবে না জানলে আমরা কি করেই বা রূপান্তরিত হতে

পারি? আমাদের পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হবার এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

দ্বিতীয় কথা—জানার পরে অভ্যাস করা প্রয়োজন। আমরা এই নিয়ম জানি যে আমরা নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস নিই, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের মধ্যে সঙ্কল্প চলতে থাকে, ভেতর পর্যন্ত পৌঁছয়। আমরা এও জানি আমাদের দ্বিতীয় নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে মনের সঙ্কল্প চলতে থাকে, মনও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। সাধনপদ্ধতির পৌর্বাপর্ব আমরা জেনেছি এবং বুঝেছি। কিন্তু কার্যকালে আমাদের মন প্রমাদে আচ্ছন্ন হয়। সক্রিয়তা থাকে না। অপ্রমাদ থাকে না। জাগরূকতা থাকে না। কর্মণ্যতা থাকে না। শুধু জানলে কিছু হবে না, অভ্যাস করতে হবে। আমরা যেমন জেনেছি পূর্ণ জাগরূকতার সঙ্গে তা আমাদের পুনঃপুনঃ অভ্যাস করতে হবে। বার বার অভ্যাস করলে আমাদের কার্য সম্পন্ন হবে, আমাদের অভ্যাস সফল হবে। সেই কারণে ভগবান বলেছেন—'বিজ্জা চরণং পমোক্খো।' জ্ঞান ও আচরণ মিলিত হলে মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়। জ্ঞান ছাড়া দুঃখ থেকে মুক্তি হয় না, আর ক্রিয়া ছাড়াও দুঃখ থেকে মুক্তি হতে পারে না। যদি জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজন হয়, তবে আচরণও অবশ্য প্রয়োজন। আমরা অপ্রমাদের জন্য কর্ম করি, পূর্ণ জাগরূকতার সাথে অভ্যাসের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করি। এই জন্য অপ্রমাদ অবশ্য প্রয়োজন। আমরা যাতে বিজলি বাতির সামনে গিয়ে ফুঁ না দিই সেজন্য আমাদের জানা দরকার। যেখানে ফুঁ দেওয়ার কথা সেখানে যেন ফুঁ দিই, যেখানে বোতাম টেপার কথা সেখানে যেন বোতাম টিপি। যে কাজ যেমন ভাবে করার কথা, সে কাজ তেমনি ভাবেই করি। এ দুটি কাজ ঠিকমত হলেই আলো জ্বলবে, দরজা খুলে যাবে, জানলা খুলে যাবে। তা না হলে কোন কিছুই হবে না। আলোও জ্বলবে না, দরজাও খুলবে না, জানালাও খুলবে না।

যখন আমাদের মনের গভীরে আকাঙ্ক্ষা জাগে তখনই এ রকম হতে

পাবে। এ বকম গভীব আকাঙ্ক্ষা হবে যে আমাব ঐ কাজ কবা নিতান্ত আবশ্যক, ঐ বকম কবলে আমি নিজে ধন্য হব, উপকৃত হব, লাভবান হব। ওই বকম গভীব আকাঙ্ক্ষা বা অভীপ্সা উৎপন্ন হলে তাবই এ বকম হতে পাবে। গভীব আকাঙ্ক্ষা হলে আত্মাব নিবীক্ষণ হয।

আমবা প্রথম দিন থেকেই আবৃত্তি কবে যাচ্ছি, আত্মা দ্বাবা আত্মাকে দেখ। এব অর্থ—স্ব-দর্শনেব ভাবনা, নিজেকে নিজে দেখাব ভাবনা উৎপন্ন হোক। নিজে নিজেকে দেখলেই গভীব আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হবে। আত্মাকে দর্শন, নিজেব অস্তিত্বকে দর্শন আব গভীব আকাঙ্ক্ষা—এগুলি যখন ঘটে তখন আমাদেব দৃষ্টিকোণেব পবিবর্তন হয। জীবন বদলে যায, তাব আগে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায। দৃষ্টিব পবিবর্তন হলে জীবনেবও পবিবর্তন হয। দুনিযাতে যা আছে তাই আছে। ভাল হলে ভাল, মন্দ হলে মন্দ। যা আছে তাব আমবা কোন বকম অদলবদল কবতে পাবি না। দুনিযাতে এ সবই চলতে থাকবে। আজ পর্যন্ত তাব কেউ পবিবর্তন কবতে সমর্থ হয নি, ধ্বংস কবতে সক্ষম হয নি, নতুন কিছু নির্মাণ কবতেও সমর্থ হয নি। যা আছে তা চলছে, চলতে থাকবে। যে লোক নিজেব দৃষ্টি বদলাতে পাবে তাব জন্য দুনিযা বদলাতে পাবে। যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলায না, দুনিযাও তাব জন্য কখনও বদলায না।

এক গুরু ছিলেন। তাঁব দুটি শিষ্য ছিল। তিনি তাদেব পবীক্ষা কবতে ইচ্ছা কবলেন। এক শিষ্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'বল, জগৎ কেমন? তোমাব জগৎ কেমন লাগছে?' সে বলল, 'জগৎ খুবই মন্দ জাযগা। সব জাযগায অন্ধকাব আব অন্ধকাব। আপনিই দেখুন। একটি দিন হলে দুবাব বাত হয। দুই বাত্রিব মাঝখানে একটি দিন। শুরুতে বাত ছিল। শুধু আঁধাব আব আঁধাব। তাব পবে দিন এল। আলো হল, প্রকাশ হল। আবাব রাত এসে গেল, আঁধাবে সব ছেযে গেল। এক বাব আলো তো দুবাব আঁধাব। আঁধার বেশি, আলো কম। এই তো দুনিযা।'

আচার্য দ্বিতীয় শিষ্যকেও একই প্রশ্ন করলেন। সে বলল, 'গুরুদেব! জগৎ খুব ভাল জায়গা। কেবল আলো আর আলো। রাত গেল। আলোর প্রকাশ হল। সূর্যের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আলোর আবির্ভাব হলে অন্ধকার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আলো সবার বন্ধ চোখ খুলে দেয়, যা সত্য তাকে প্রকটিত করে। যা অন্ধকারে আবৃত ছিল তাকে এক মুহূর্তে অভিব্যক্ত করে, অনাবৃত করে দেয়। যে জগতে এই রকম আলোর খেলা সে জগৎ কত সুন্দর আর লোভনীয়। আমি দেখেছি দিন এসে চলে যায়, রাত আসে, চলে যায়, আবার দিন আসে। এই ভাবে দুই দিনের মাঝখানে এক রাত। আলো বেশি, অন্ধকার কম। দু বার আলোর প্রকাশ, একবার আঁধার।'

প্রশ্ন একটি ছিল, উত্তরদাতা ছিল দু জন। তারা দু রকম উত্তর দিয়েছিল। এক জন বলেছিল, দুই রাতের মাঝখানে একটি দিন হয়। অপর জন বলেছিল, দুই দিনের মাঝখানে একটি রাত। রাত দুজনের পক্ষেই সমান ছিল, দিনও দুজনের পক্ষেই সমান ছিল। দিনেরও প্রভেদ ছিল না, রাতেরও প্রভেদ ছিল না। ছিল দৃষ্টিকোণের পার্থক্য, দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ। একজন অধিক পরিমাণে আলোর খেলা দেখেছিল, সেই অনুসারে মূল্যাঙ্কন করেছিল। সে তার জালে আবদ্ধ হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, দুনিয়ায় অন্ধকারের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। সে আলোর চমক দেখতে পায় নি, তার মূল্য বুঝতে পারে নি।

এ হল সম্পূর্ণ দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। যদি আমরা চোখ বিশ্বের সৌন্দর্য এবং সত্যকে দেখতে আরম্ভ করি তবে সর্বত্র সত্য আমাদের দেখা দেবে, সৌন্দর্য দেখা দেবে। যদি আমাদের চোখ শুধু দুঃখ আর দুঃখ দেখতে থাকে তবে আমাদের আশেপাশে দুঃখ নাচতে থাকবে। সব কিছু দুঃখময় হয়ে যাবে।

আমরা পশ্চিম রাত্রিতেঅ নুপ্রেক্ষার অভ্যাস করি, অনুভব করি। শরীর অনিত্য, এই সত্য থেকেও আনন্দ অনুভব করি। শরীর চয়াপচয়-শীল। কখনও তার চয় অর্থাৎ বৃদ্ধি হয়, কখনও বা অপচয় অর্থাৎ ক্ষয়

হয়। কখনও তা পুষ্ট হয, কখনও বা ক্ষীণ হয়। শবীব ক্ষীণ হলেও সত্যেব বোধ হতে পাবে। এই শবীব বিপবীতধর্মা, বিবিধ পবিবর্তনেব মধ্য দিযে তার গতি। কখনও তাব ওপবে শীতেব প্রভাব হয, কখনও গ্রীষ্মেব, কখনও বা ঝড তুফানেব। কখনও সে বোগ-যন্ত্রণা সহ্য কবে, কখনও বা পবিস্থিতি দ্বাবা পীডিত হয। কখনও এটা, কখনও ওটা ঘটিত হয। এই দেহ অনেক, অনেক পবিবর্তনেব মধ্য দিযে যায। বোগ আমাদেব প্রিয বস্তু নয, কিন্তু বোগেব সত্যতাব অনুভূতি আমাদেব প্রিয। প্রকৃতপক্ষে বোগ আছে—এই সত্য আমাদেবকে সত্যেব দিকে, যথার্থের দিকে নিযে যায়।

এই শবীবেব মৃত্যু ঘটে। শবীবেব বার্ধক্য হয, মানুষ মাবা যায। মবণেব অনুভব কবাও অনেক বড আনন্দ। আমবা অনিত্যেব অনুপ্রেক্ষা দ্বাবা জীবদ্দশায মবণেব অভিজ্ঞতা লাভ কবি। আব যে লোক মবণেব শিক্ষা পেযেছে সে সমস্ত কঠিন সমস্যা উত্তীর্ণ হতে পাবে। মবণ-ভয দুনিযাব সবচেযে বড় ভয। মবণই হল অন্তিম ঘটনা।

আজ পর্যন্ত দুনিযাব শাসককুল নানা ভাবে দণ্ডদানেব উপায উদ্ভাবন কবেছেন। তাঁবা বহু বিচিত্র দণ্ডদানেব কৌশলেব আশ্রয নিয়েছেন। বাঁধা, জেলে দেওয়া, হাতে হাতকডা লাগান, পাযে বেডি লাগান, মাবা, পেটানো। তাঁদেব হাতে চবম দণ্ড—ফাঁসি দেওযা। এটিই অন্তিম দণ্ড।

যে লোক জীবিত অবস্থায মবণ শিক্ষা কবে, তাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে, তাকে অনুভব কবে, নিজেব শবীব শিথিল কবে সকল অবযব মৃতেব অবয়বেব মত কবতে শিক্ষা কবে—সত্যই সে লোক সকল সমস্যা, সকল প্রকাব ভয, সকল প্রকাব বিঘ্নকে অবশ্যই অতিক্রম কবতে পাবে।

আমবা অনিত্যেব অনুপ্রেক্ষা কবে থাকি। ঐ অনুপ্রেক্ষাতে আমবা সত্যকে দেখি, আনন্দ নির্গলিত কবি, আমাদেব অন্তবেব অন্তঃস্থলে যেতে প্রযত্ন কবি এবং তাব সাধনা কবি। এ সবই দৃষ্টিকোণেব পবিবর্তন। তাছাডা যদি আমবা কাউকে বলি, মবণ অনুভব কব, তবে সে ভাববে, কি বকম মূর্খেব মত কথা বলছে। বেঁচে থাকাব কথা

বললে ভাল লাগতে পারে, কিন্তু ও তো মরণের কথা বলছে। বড়ই খারাপ কথা। বাঁচার কথা বেশ ভাল লাগে। কিন্তু মরার কথা বড় মন্দ মনে হয়। আমরা তাকে অলক্ষুণে কথা মনে করি। অশুভ কথা বলে মনে করি। কিন্তু সাধকরা এ রকম মনে করেন না। তাঁরা মরার কথা ভাল কথা মনে করেন। এজন্য মরণকে তাঁরা নিজেদের অভ্যাসের অঙ্গীভূত করে সাধনা করেন। বস্তুত এই হল দৃষ্টির পরিবর্তন।

দৃষ্টি বদলালে সব কিছুই বদলে যায়। সাধনার প্রথম সূত্র—দৃষ্টির পরিবর্তন। রূপান্তরণের প্রথম সূত্র—দৃষ্টির পরিবর্তন। আমাদের সমস্ত রূপান্তর দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন দ্বারা সাধিত হয়। দৃষ্টির পরিবর্তন হলে আভ্যন্তরীণ সমস্ত তত্ত্বের পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। রূপান্তরণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। তখন দুনিয়ার দৃষ্টিতে অনেক উল্টো কথা আমাদের কাছে ঠিক বলে মনে হতে শুরু করে। দুনিয়ার যে সব কথা ঠিক বলে মনে হয় সেগুলি সাধকের কাছে উল্টো লাগতে পারে।

এক সাধক কনফুসিয়সকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আমি কি করে মনের ওপরে সংযম প্রয়োগ করতে পারব? কনফুসিয়স মস্ত বড় সাধক ছিলেন। তিনি মহান যোগী, দার্শনিক ও তত্ত্ববেত্তা ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আমি এ বিষয়ে সহজ সরল উপায়, ছোট একটি সূত্র বলছি। তুমি কি কান দিয়ে শোন। সাধক উত্তর দিল—হ্যাঁ। কনফুসিয়াস বললেন—তুমি যে কান দিয়ে শোন এ কথা মানতে পারি না। তুমি মন দিয়ে শোন। একটা কাজ কর। আজ থেকে শুধু কান দিয়ে শুনতে শুরু কর। মন দিয়ে শোনা বন্ধ করে দাও। তুমি জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নাও এ কথা আমি মানতে পারি না। তুমি মন দিয়ে স্বাদ নাও। আজ থেকে কেবল জিহ্বা দ্বারা স্বাদ নেওয়া আরম্ভ কর। মনের দ্বারা আস্বাদন করা বন্ধ কর। তুমি চোখ দিয়ে কি দেখ, তুমি মন দিয়ে দেখ। আজ থেকে শুধু চোখ দিয়ে দেখা শুরু কর। আপনা আপনি মনের ওপরে সংযম ক্ষমতা এসে যাবে।

কেবল কান দিয়ে শোনা, জিভ দিয়ে চাখা, চোখ দিয়ে দেখা—

রূপান্তরের একটি ছোট সূত্র। কিন্তু আমরা কেবল কান দিয়ে শুনি না, জিভ দিয়ে চাখি না, চোখ দিয়ে দেখি না। মন দিয়ে শুনি, চাখি, দেখি। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হতো তবে আমি উত্তরের সঙ্গে আর একটু কথা জুড়ে দিতাম—আমরা সংস্কার দ্বারা শুনি, স্বাদ গ্রহণ করি, দেখি। আমরা পূর্ব ধারণাসমূহের বশবর্তী হয়ে এই সব করে থাকি।

মা ছেলেকে বলে—কিছু বোঝ না, তুমি নিরেট মূর্খ। ছেলে কান দিয়ে শোনে, মন দিয়ে শোনে, সংস্কার এবং ধারণা দিয়ে শোনে। কোন বিরোধী বা শত্রু ছেলেকে বলল—বুঝতে পারছ না? তুমি আকাট মূর্খ। এ কথাও সে কান দিয়ে শুনল, মন দিয়ে শুনল, সংস্কার দিয়ে শুনল, ধারণা দিয়ে শুনল। কানে দুটো আওয়াজই সমান লাগল। চাই মা বলুক, তুমি মূর্খ, চাই শত্রু বলুক, তুমি মূর্খ—দুটো কথার আওয়াজই সমান। কানের কাছে দুজনের দ্বারা ব্যবহৃত শব্দ এবং তাদের ধ্বনির কোন প্রভেদ নেই। শোনাতেও কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু মনের দিক থেকে ধারণার এত পার্থক্য হবে যে মায়ের কথা প্রিয় লাগতে পারে, কিন্তু দুশমনের কথা আগুনের মত গায়ে জ্বালা ধরাতে পারে। বিরোধীর কথায় ছেলেটি এত কুপিত হয়ে যাবে যে তাতে কখনও কখনও বিরাট অনর্থকারী ঘটনাও ঘটে যেতে পারে।

এই প্রভেদ কেন হয়? যদি শুধু কান দিয়ে শোনা হতো তবে দুজনের কথার কোন তফাৎ হতো না, কারণ দুজনের কথার ধ্বনি এবং শব্দাবলী সমান। দুজনের কথার প্রভেদ এই জন্য হয়েছে যে শ্রোতা শুধু কান দিয়ে শোনে নি, সে সংস্কার দিয়ে, মন দিয়ে, তথা পূর্ব ধারণা দিয়ে শুনেছে।

কনফুসিয়স ঠিকই বলেছেন, কান দিয়ে শোন, মন দিয়ে শোনা বন্ধ কর। কেবল জিভ দিয়ে চাখ, মন দিয়ে চাখা বন্ধ কর। কেবল চোখ দিয়ে দেখ, মন দিয়ে দেখা বন্ধ কর। আপনা আপনি সংযম এসে যাবে।

এটি রূপান্তরণের মস্ত বড় সূত্র। সাধারণ মানুষের কাছে এ কথা

ছলনাপূর্ণ ও দুর্বোধ্য মনে হতে পাবে কিন্তু সাধকেব পক্ষে তা গভীব তাৎপর্যপূর্ণ। আমবা যেন ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদেব কাজ কবতে দিই এবং মনকে তাব আপন কাজ কবতে দিই, সংস্কাব এবং পূর্ব ধাবণাসমূহকে আপন আপন কাজ কবতে দিই। তাদেব কাজেব সঙ্গে আমবা যেন কিছু জুড়ে বা মিলিত কবে না দিই।

কেন অসংযম হয়? কান, মন, সংস্কাব এবং ধাবণা এক ধাবায় মিলিত হয়। তাদেব এক ধাবায় মিলিত হওযাব ফলে অসংযম উৎপন্ন হয়। অসংযম কানে নয়, চোখে নয়, জিভেতে নয়। তাবা যে যেমন আছে সেই ভাবেই আমাদেব দেখা দেয়। তাতে কোন প্রিয়তাও নেই, অপ্রিয়তাও নেই। কোন বাগও নেই, কোন দ্বেষও নেই। যে যেমন সে ঠিক তেমনি আকৃতি এবং বর্ণ নিযে আমাদেব চোখেব সামনে আসে, আব চোখ তাকে তেমনি ভাবেই গ্রহণ কবে। যদি মনে কাবও ওপবে প্রিয়তা বা কাবও ওপবে অপ্রিয়তাব ভাব আসে তাতে বেচাবি চোখেব কি দোষ? তাব কোন দোষ নেই। ও তো প্রণালী মাত্র। তা দিযে নোংবা জল প্রবাহিত কব, নির্মল জল ওব ভেতব দিযে নিযে যাও। যা কিছু প্রবাহিত কব। সে তো মাধ্যম মাত্র। তাব কোনও দোষ নেই। প্রিয়তা বা অপ্রিয়তাব ভাব, বাগ বা দ্বেষ—এ সবই আসে মনেব পথ দিযে, সংস্কাবেব তথা ধাবণাব পথ দিযে। আমাদেব মনে যে লোকেব সম্বন্ধে যে ধাবণা জমে আছে, যে চোখে আমবা তাকে দেখেছি তদনুসাবে আমাদেব দেখাব সঙ্গে সূক্ষ্ম ভাবে ধাবণাব তবঙ্গ তথা আমাদেব মনেব তবঙ্গ এসে মিলিত হয়। তাব পবে আব চোখেব কোন কাজ থাকে না। তাব পবে আমবা চোখ দিযে দেখি না। দেখি সংস্কাব দিযে, ধাবণা দিযে, তথা মন দিযে।

প্রতিসংলীনতা তথা সংযমেব এই হল অতিশয় মহত্ত্বপূর্ণ সূত্র—ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে ইন্দ্রিযেব কাজ নাও, অন্য কোন কাজ নিও না। এই হল সংযমেব সূত্র।

আমি রূপান্তবণেব সূত্রেব আলোচনা কবছি। আমবা অবশ্যই

বদলাতে চাই। প্রত্যেক মানুষই যে বদলাতে চায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে ক্রোধপ্রবণ, সে চায় তার স্বভাব বদলাতে। যে পরনিন্দাপরায়ণ, সে চায় তার স্বভাবের পরিবর্তন করতে। যে খাদ্য-লোলুপ, সে-ও চায় আপন স্বভাবের পরিবর্তন। তারা মন থেকে ইচ্ছা করুক বা বাধ্য হয়ে করুক, তারা সবাই পরিবর্তন চায়।

কিন্তু বাস্তবে কারও অভ্যাস বা স্বভাব বদলায় না। খুব কম লোকেই নিজে নিজের স্বভাব পরিবর্তিত করতে পারে। তারা জানে ঐ সব কাজ খারাপ। তারা ঐ সব কাজ খারাপ বলে মানে। তারা ঐ সব অভ্যাস ছাড়তে বা বদলাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা সেগুলি ছাড়তে বা বদলাতে সক্ষম হয় না। কেন? ঐ রকম হয় কেন? এ একটি মস্ত বড় প্রশ্ন। এর উত্তর দিতে অন্তরের গভীরতায় নামতে হবে। আমি এ কথা স্বীকার করি যে সাধনার অন্যান্য সফলতার মধ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সফলতা যে, আমরা এ প্রশ্নের উত্তর পেতে সক্ষম হই। লোকে পরিবর্তিত হতে চায় অথচ তারা বদলাতে পারে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সাধনার ভূমিকা ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র সাধনার ভূমিকাতেই আমরা এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারি।

আমরা শ্বাসের প্রয়োগ করে থাকি। শ্বাসকে ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মনকেও ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি। কেন এ রকম করি? আমরা কেন একাগ্রতার অভ্যাস করে থাকি? এ কথা আমাদের বুঝতে হবে। আমরা কাজ করে চলি, কিন্তু কেন করি?

আমাদের দুই শরীর আছে—স্থূল শরীর আর সূক্ষ্ম শরীর। আমাদের চেতনার অনেক স্তর। এক হল মনের চেতনা, অর্থাৎ চেতনার মানসিক স্তর। আর একটি অধ্যবসায়ের স্তর। মন এক, অধ্যবসায় অনেক। অধ্যবসায়ের অর্থ, সূক্ষ্ম চেতনা। সূক্ষ্ম চেতনার স্তর অসংখ্য। তা অতিশয় গভীরতায় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের স্থূল মনের কাছে তা প্রীতিকর নয়, আমাদের জাগ্রত মনের পক্ষে তা

প্রীতিকর নয়। তৎক্ষণাৎ আমরা প্রভাবিত হয়ে পড়ি আর চিন্তা করি যে, এসব ত্যাগ করতে হবে। মনে মনে ত্যাগের সঙ্কল্প করি। মনে করুন, আমরা চা পান করার অভ্যাস ত্যাগ করার সঙ্কল্প করলাম। যখনই সকাল হল, জলখাবারের সময় এল, চা মাথায় চড়ে বসল। মাথায় চেপে বসে চলতে আরম্ভ করে। চা পানের জন্য আকুলতা বাড়তে থাকে। চা পানের অভ্যাস ত্যাগ করার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু চা আমাদের সামনে এলে আমরা ভাবি, যাক গে, আজ তো খাই। কাল থেকে ছাড়ব। একদিনে কি যাবে আসবে? পরের দিন চা এলে একই প্রশ্ন ওঠে এবং মন একই ভাবে সমাধান করে। এই রকম দিনের পর দিন চলতে থাকে।

রাজা ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তিনি এক বাগানে এলেন। মন্ত্রী তাঁকে সাবধান করবার জন্য বললেন, 'মহারাজ। আপনি আম গাছের তলায় বসবেন না। আপনার আম খাওয়া নিষেধ, এমন কি আম গাছের তলায় বসাও নিষেধ। বৈদ্য বলেছেন আপনি আম খেলে বাঁচবেন না, মরে যাবেন। আপনি যদি আম হাতে নেন তবে মনে করবেন যে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে হাতে নিয়েছেন। আপনার পক্ষে আমের অর্থ মৃত্যু।'

রাজা মনে মনে চিন্তা করলেন—এ কি রকম বৈদ্য? এত কড়া? এত নিষেধ। আম গাছের ছায়া বেশ ঘন। আম গাছের নিচে বসতে কি দোষ আছে? আম খাওয়াতে দোষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, আম গাছের ছায়াতে কোন দোষ থাকতে পারে না। রাজা আম গাছের ছায়ায় বসলেন। পাকা আমের গন্ধে তাঁর মন ভরে গেল। তাঁর জিভে জল এসে গেল। এই সময়ে দমকা হাওয়ার স্রোত এল। গাছ থেকে একটি আম রাজার কোলে পড়ল। রাজা সেটা ছুঁলেন, হাতে তুলে নিলেন। শুঁকলেন। তার মনমাতানো রঙ আর মিষ্ট গন্ধ। মন্ত্রী বললেন—মহারাজ। ও আপনি কি করছেন? আপনি কি নিজের মৃত্যু ডেকে আনছেন? আমটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিন। রাজা

হাসতে হাসতে বললেন—তুমি তো বড়ই অবিশ্বাসী। দেখাতে আর শোঁকাতে বিপদ কোথায়? আমি এটি খাব না। রাজা আমটি বার বার শুঁকতে লাগলেন। মন মিষ্ট গন্ধে ভরে গেল। শুঁকতে শুঁকতে তিনি আমটিকে চুষতে লাগলেন। বড়ই মিষ্ট রস। মন্ত্রী তাঁর হাত চেপে ধরলেন। রাজা বললেন—মন্ত্রী, বৈদ্যরা অনেক ভয় দেখায়। একটি ভাল আম চুষলে মানুষ কি করে মরে যেতে পারে? আমি তো শুধু শুঁকছি, খাচ্ছি না। তুমি চিন্তা করো না। মন্ত্রী নিষেধ করতে লাগলেন, আর রাজা গোটা আমটি চুষলেন। কিছু দিন পরে রাজা রোগগ্রস্ত হয়ে মারা গেলেন।

লোকে জেনেশুনেও ছাড়তে পারে না কেন? হাত থেকে পড়ে যাওয়া কাঁচের গ্লাসের মত তোমাদের সঙ্কল্প ভেঙ্গে যায়, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তার কারণ ঐ সমস্ত সঙ্কল্প আমাদের স্থূল চেতনার স্তরে, আমাদের জাগ্রত মনের স্তরে ঘটে। সঙ্কল্প করে জাগ্রত মন, আর বিঘ্ন আসে অন্য কোন জায়গা থেকে। ব্যাধি কোন এক জায়গায়, আর আমরা চিকিৎসা করি অন্য কোন জায়গায়।

এক জনের চোখে ব্যথা শুরু হল। সে বৈদ্যর কাছে গেল। বৈদ্য বললেন—এই বড়ি নাও। এটিকে ঘসে চোখে কাজলের মত লাগিয়ে দিও। দুদিন পরে বৈদ্য রোগীর বাড়িতে এলেন। তিনি দেখলেন রোগী বড়িটি ঘসছে পিঠের ওপরে। বৈদ্য জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি করছ? ঐ ওষুধ তো চোখের জন্য। তুমি ওটা পিঠে লাগাচ্ছ কেন? সে উত্তর দিল—কি করব? প্রথম দিন চোখে কাজলের মত লাগিয়েছিলাম, কিন্তু খুবই জ্বালা করল। তখন আমি ভাবলাম, যাক গে। চোখে যদি না সয়, তবে পিঠে ঘসে দিই। কি আর তফাৎ হবে।

আমরাও ঠিক এই রকম করে থাকি। কোথায় রোগ হয়, আর কোথায় আমরা ওষুধ লাগাই। ব্যাধি সূক্ষ্ম চেতনায়, কর্ম শরীরে তথা বাসনা শরীরে, আর আমরা চিকিৎসা করি স্থূল মনের, জাগ্রত মনের, তথা স্থূল শরীরের। এই মনের ঐ কাজ নয়। যেখানে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা

এবং বাসনার বাস, যেখানে তাদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তার নাম অধ্যবসায়। অধ্যবসায় মলিন হতে পারে, আবার নির্মলও হতে পারে। অধ্যবসায়ের মলিনতা বা নির্মলতার আধারে ভেতরের সব কিছু কাজ চলে। আমরা কেবল স্থূল মনের পরিচর্যা করতে থাকি, জাগ্রত মনের সেবা করতে থাকি। সারা জীবন আমরা পরিচর্যা করে চলি। কিন্তু রোগ কখনও নিরাময় হয় না। আমরা ভাবি, এত চেষ্টা করার পরেও রোগের শেষ হল না। যে গ্রামীণ ফুঁ দিয়ে বিজলি বাতি নেভাতে চেয়েছিল আমরা ঠিক তার মত। ফুঁ দিলে বিজলি বাতি নিভবে না। রোগ সারবে না।

আমরা যেন শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মনকেও ভেতরে নিয়ে যাই, যাতে অবচেতন মনের দুয়ার খোলা সম্ভব হয়, স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে যে প্রাচীর আছে তা ভাঙ্গতে পারি, তাদের মাঝখানে এমন এক দুয়ার বানাতে পারি যা দিয়ে সোজাসুজি স্থূল মন থেকে সূক্ষ্ম মনে, স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীরে চলে যেতে পারি। আমরা যদি মধ্যবর্তী প্রাচীর ভাঙ্গতে পারি, মধ্যবর্তী দুয়ার খুলতে পারি তবে তা সাধনার এক বিরাট বড় উপলব্ধি হবে।

এই দরজা খোলার যে সাধনা তার নাম একাগ্রতা। দূরত্বকে অতিক্রম করার সাধনার নাম একাগ্রতা। আমরা যত বেশি একাগ্রতার অভ্যাস করতে পারব তত বেশি পরিমাণে আমরা এই ব্যবধান দূর করতে সমর্থ হব। যেমন যেমন আমাদের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে তেমন তেমন আমাদের স্থূল মন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে আর সূক্ষ্ম মনের কাজ করার সুযোগ মিলবে। সূক্ষ্ম মন সক্রিয় হবে। দরজা খুলে যাবে। যেমন আমার বিচারশূন্যতা বৃদ্ধি পাবে তেমন এত জোরে ধাক্কা লাগবে যে সূক্ষ্ম মনের দরজা খুলে যাবে। যখন আমরা শ্বাসের গতি বুঝতে পারব, শ্বাসের গতি মৃদু করতে পারব, তখন ঐ মৃদু শ্বাস এত শক্তিশালী হয়ে যাবে যে তার ধাক্কায় সেই দরজা খুলে যাবে। আমাদের স্থূল জগতের বিশ্বাস, যা স্থূল তা অতিশয়-শক্তিশালী। কিন্তু সূক্ষ্ম জগতের

বিশ্বাস এব একেবাবে বিপবীত। যা সূক্ষ্ম তাতেই শক্তি। আধুনিক আণবিক তত্ত্ব এই কথাব সত্যতা প্রমাণ কবে দিযেছে। আজকাল এই বিশ্বাস হযেছে যে, স্থূলে কোন শক্তি নেই, শক্তি সূক্ষ্মতায। এক প্রাচীন শ্লোকে এই তথ্যেব সুন্দব অভিব্যক্তি বযেছে—

হস্তী স্থূলবপুঃ স চাঙ্কুশবশঃ কিং হস্তিমাত্রঙ্কুশঃ ?
দীপে প্রজ্বলিতে, বিনশ্যতি তমঃ কিং দীপমাত্রং তমঃ ?
বজ্রেনাপি হতাঃ পতন্তি গিবযঃ কিং বজ্রমাত্রো গিবিঃ ?
তেজো যস্য বিবাজতে স-বলবান্ স্থূলেষু কঃ প্রত্যযঃ ?

[হাতি বিশালদেহ, কিন্তু অঙ্কুশেব বশ। তবে কি হাতি অঙ্কুশ-মাত্রিক, অর্থাৎ হাতিব শক্তিব মাপ কি অঙ্কুশেব দ্বাবা হবে ? দীপ জ্বললে অন্ধকাব দূবীভূত হয, তবে কি অন্ধকাব দীপমাত্রিক ? বজ্রেব দ্বাবা আহত হযে পাহাড ভেঙ্গে পডে, তবে কি পাহাড বজ্রমাত্রিক ? যাতে তেজ নিহিত আছে সেই বলবান, স্থূলে কোনও প্রত্যয নেই।]

হাতি মস্ত বড, কিন্তু সে ছোট্ট জিনিস অঙ্কুশেব অধীন। দীপ জ্বললে অন্ধকাবেব সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু দীপ থেকে অন্ধকাব কত বিশাল। দীপ ছোট জিনিস, অন্ধকাব মস্ত বড জিনিস। কিন্তু অন্ধকাব বেশি শক্তিশালী নয, দীপ বেশি শক্তিশালী। পর্বত অতিশয উচ্চ, বিবাট জিনিস। বজ্র ছোট জিনিস। কিন্তু বজ্র পর্বতকে চূর্ণবিচূর্ণ কবে ফেলতে পাবে। শক্তি স্থূল আধাবে থাকে না, সূক্ষ্ম আধাবে থাকে। শক্তি বড জিনিসে থাকে না, ছোট জিনিসে থাকে। যাব তেজ আছে সে বলবান। আকাবে ছোট হলে কি আসে যায ?

স্থূল হওযা, বিবাট বড আযতনেব হওযা, কোন বিশেষ মহত্ত্বেব সূচক নয। আজকাল সূক্ষ্মেব শক্তিতে প্রত্যয বেডে চলেছে।

কাজেই আমাদেব স্থূল শবীব থেকে সূক্ষ্ম শবীবেব দিকে যাওযাব জন্য বিশেষ প্রযত্ন কবতে হবে। আমবা যেন স্থূল চেতনা থেকে সূক্ষ্ম চেতনাব দিকে যাই। সূক্ষ্ম শবীবকে, সূক্ষ্ম চেতনাকে জাগিযে তুলি। এই জন্যই আমাদেব সমস্ত প্রক্রিযা তথা অভ্যাসেব প্রযোজন।

আমরা আজকের দিনে যে প্রযত্ন করছি সে শুধু অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া নয়। আমরা জেনে এবং বুঝে চেষ্টা করব। আমাদের পক্ষে তার নিশ্চিত প্রয়োজন আছে। আমরা জানি কেন আমরা ঐ রকম প্রযত্ন করি। তার পেছনে আছে আমাদের এক গভীর প্রয়োজন, সেটি হল—আমরা যেন শ্বাসের আলম্বন, তথা এক স্থূল আলম্বন নিয়ে চলি। স্থূল আলম্বনের সাহায্যে, শ্বাসের সাহায্যে মনকে এমনভাবে তৈরি করে নিই যাতে মন ভেতরে যায়, গভীরে অবতরণ করে। মনের এই গভীরতায় অবতরণ করার অভ্যাস আমাদের হারিয়ে গিয়েছে। আমরা এই শ্বাসের আলম্বন দ্বারা আবার মনের সেই স্বভাব তৈরি করছি, মনের সংস্কার উৎপন্ন করছি। তার পরিণাম এই হবে যে ভেতরে যেতে থাকলে, দেখতে থাকলে এবং গভীরে অবতরণ করলে এমন এক ধাক্কা লাগবে যে, স্থূল চেতনা এবং সূক্ষ্ম চেতনার মধ্যবর্তী সেই দুয়ার খুলে যাবে। তখন আমরা জানতে পারব অভ্যাস বদলানো যায়, স্বভাব বদলানো যায়, দোষের যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তাকে রোধ করা যায়। দোষের জড় উজাড় হয়ে গেলে দোষের সমাপ্তি ঘটে। স্থূল মনে বার বার সঙ্কল্প আবৃত্তি করার কোন প্রয়োজন হয় না।

১২

স্থূল থেকে সূক্ষ্মে

সত্যের সন্ধান। কথাটি বড় প্রিয়। 'সত্য' কথাটি নিজেই বড় প্রীতিকর। কিন্তু সত্যের সন্ধান বিশেষ জটিল ব্যাপার। সত্য যখন এত বড়, এত বিরাট তখন তার সন্ধান নিশ্চয়ই সামান্য ছোটখাটো ব্যাপার নয়। আমরা সত্যের অন্বেষণ করার সঙ্কল্প করেছি। আমাদের মনে সত্যান্বেষণের ভাবনা জেগেছে। আমরা সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি। কারণ সত্যের সন্ধান না করলে, যথার্থকে না বুঝলে, কোন লোক ঠিক কাজ করতে পারে না। পৃথিবীতে যত উচিত কাজ হয়েছে সে সবই সত্যের সন্ধানের পরে হয়েছে। যেখানে সত্যের চর্চা হয় না সেখানে সব কাজই ভ্রান্তিপূর্ণ হয়ে থাকে। আমরা অল্প সময়ের মধ্যে সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করব, এ কি সম্ভব? সত্য অত্যন্ত মহৎ বস্তু এবং তার সন্ধান পেতে হলে বিশেষ প্রযত্ন করা প্রয়োজন। যদি আমাদের অভ্যাস ভ্রান্তিহীন হয়, আমরা যা কিছু করি তা যদি প্রমাদমুক্ত হয়, যদি তার প্রতি আমাদের নিষ্ঠা থাকে, যদি আমরা সত্যের সাথে সাথে চলি, তবে আমরা সত্যের স্বরূপ অবশ্যই সন্ধান করতে পারব।

শুরুতেই আমরা বৃহৎ এবং বিরাট সত্যের সন্ধান করতে যাব না। কিন্তু আমরা সেই পরিমাণ সত্যের অবশ্য সন্ধান করব যে পরিমাণ

আমাদেব সাধনাব সহযোগী হতে পাবে এবং যাব আধাবে আমবা বিনা নৈবাশ্যে, বিনা বাধায়, সাধনাব পথে এগিযে যেতে পাবব। এই পবিমাণ সত্য আমাদেব জানতে হবে, খোঁজ কবতে হবে। এই পবিমাণ সত্যও যদি খোঁজ কবা না যায তবে সাধনাব পথে এগিযে যাওযা যাবে না। পদে পদে বাধা আসবে—সন্দেহেব বাধা, অবিশ্বাসেব বাধা, মূর্খতাব বাধা। আমবা না ভেবেচিন্তে, না বুঝেসুঝে কাজ কবে চলি, ফলে কিছুই মেলে না। এই সমস্ত বাধা পদে পদে আসতে থাকে, তাব কাবণ যে সত্যেব অনুভূতি, যে পবমার্থেব সাধনা আপনাব হওযা উচিত তা হয নি। তাব জন্য আপনাব মনে ঐ বকম তীব্র প্রেবণা আসা সম্ভব নয।

একশ' ডিগ্রি উত্তাপে জল বাষ্পে পবিণত হয। তাব কম উত্তাপে জল বাষ্পে পবিণত হয না। জলকে বাষ্পে পবিণত কবতে হলে তাকে একশ' ডিগ্রি উত্তাপ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। ঐ তাপমাত্রায না পৌঁছনো পর্যন্ত ঐ পবিবর্তন ঘটবে না। সেই বকম সত্যেব যতটা উত্তাপ, যতটা তাপমাত্রা প্রযোজন, সেই পবিমাণ তাপমাত্রা আমাদেব মিললে তবেই আমাদেব পবিবর্তন সম্ভব হয। তখনই শুধু ঐ পবিবর্তন সম্ভব হয। তা না হলে সম্ভব হয না।

সাধনাব পথে বহু বাধা আসে। সে সমস্ত বাধা আসে আমাদেব শবীব থেকে। শুধু স্থূল শবীব থেকে বাধা আসে তাই নয, সূক্ষ্ম শবীব থেকে বাধা আসে। সাধনাব পথে কিছু দূব অগ্রসব হওযাব পবে সবাব থেকে বড বাধা আসে আমাদেব বিদ্যুৎ শবীব থেকে, তৈজস শবীব থেকে।

তৈজস শবীবেব, তথা বিদ্যুৎ শবীবেব চমকপ্রদ শক্তি আছে। তাব নানা বকম বাহাদুবি দেখানোর ক্ষমতা আছে।

আমবা কলকাতায গিযেছিলাম। সেখানে এক বিজ্ঞানকক্ষেব সামনে গেলাম। বন্ধ দবজা আপনা আপনি খুলে গেল। ভেতবে গেলাম, বিজলি বাতি জ্বলে উঠল। পাখা চলতে লাগল। কিন্তু

ভেতরে কেউ ছিল না। কোন লোক ঐগুলিকে সঞ্চালিত করে নি। ঐ সবই আপনা আপনি চলেছে। এই হল বিদ্যুতের বাহাদুরি, বিজলির কেরামতি। আমাদের তৈজস শরীরের ঐ রকম বহু কেরামতি আছে। লোকে বলে—ইনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক, কারণ এঁর চেহারায় জ্যোতি আছে। এত জ্যোতি যে মনে হয় তেজ যেন ঠিকরে পড়ছে। এত বড় সাধক যে তিনি মাটি থেকে ওপরে উঠে যান। এত বড় সাধক যে হাত থেকে বিভূতি ঝরে পড়ছে। এত বড় সাধক যে হাত বাড়ালেই মিষ্টি, আতর, ফল সব এসে যায়। মিষ্টি খাও, আতর লাগাও, ফল খাও। এ সবই আমাদের তৈজস তথা বিদ্যুৎ শরীরের কেরামতি। এ সবই আমাদের প্রাণশক্তির চমৎকারিতা, আমাদের বিদ্যুৎ এবং তৈজস শরীরের খেল। সাধক এই সবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমি এ কথা বলতে চাই না যে এগুলি বিস্ময়কর নয়। আমি বলতে চাই যে এগুলি আধ্যাত্মিক ব্যাপার, কেননা এগুলি স্থূল শরীরের দ্বারা সংঘটিত নয়। কিন্তু এগুলি আশ্চর্যজনক নয়।

আমাদের সাধনার সূত্র—রাগস্স দোসস্স য সংখএণং এগন্ত মোক্খং সমুবেই মোক্খং—রাগ এবং দ্বেষ ক্ষীণ হলে মোক্ষ মিলে যায়। আমরা যে মোক্ষপ্রাপ্তির সাধনা করি, যে বীতরাগতার সাধনা করি, তাতে রাগ এবং দ্বেষ ক্ষীণ হলে তবে মুক্তি হওয়া সম্ভব। আমাদের রাগ ও দ্বেষ ক্ষীণ হওয়া প্রয়োজন। এর নাম আধ্যাত্মিকতা। একেই চেতনার জাগরণ, তথা আত্মার উৎক্রমণ বা উৎক্রান্তি বলে। এতে আত্মার সমস্ত মলিনতা দূর হয়। চেতনা নির্মল হয়, আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। এরই নাম অধ্যাত্মের সাধনা। একেই বলে নির্বাণ বা মোক্ষের সাধনা।

এই সাধনার মাঝখানে বহু জটিলতাপূর্ণ তথা কুটিলতাপূর্ণ বাধা আসে। তাতে সাধকের পথ বদলে যায়। তারা বাহাদুরির খেলায় নেমে পড়ে। তাঁর প্রতি সহসা লোকের আকর্ষণও হয়। কিন্তু লোকের আকর্ষণ থেকে বোঝা যায় না সাধকের রাগ-দ্বেষ ক্ষীণ হয়েছে কিংবা হয় নি। সাধকের রাগ-দ্বেষ ক্ষীণ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে জনতার

কোন মাথাব্যথা নেই। তাতে তাদেব কোন লাভ নেই। জনতা দেখে. সাধক ভূমি থেকে ওপবে উঠতে পাবেন কিনা, সন্তান দিতে পাবেন কিনা, ধন দিতে পাবেন কিনা, অদৃশ্য হতে পাবেন কিনা, আকাশে উড়তে পাবেন কিনা, হাতেব ইশাবায বাঞ্ছিত বস্তু নিয়ে আসতে পাবেন কিনা, লোহাকে সোনায পবিণত কবতে পাবেন কিনা। যদি সাধক এই সব কাজে নিপুণ হন তবে হাজাব লোক তাঁব প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাঁব প্রতি লোকেব আকর্ষণ বাডতে থাকবে। সমস্ত আকর্ষণ হল ভেল্কিবাজিতে। বাগ-দ্বেষ ক্ষীণ হওযা বা কমে যাওযা সম্বন্ধে কাবও কোন আকর্ষণ নেই।

বিজলিতে চমৎকাবিত্ব আছে। লোকেব তাব ওপবে আকর্ষণ আছে। তা থেকে আলো পাওয়া যায, গবম ও ঠাণ্ডা হাওযা পাওয়া যায। আবও নানা কাজ বিদ্যুতেব দ্বাবা হয। তাব প্রতি লোকেব প্রচণ্ড আকর্ষণ।

আমাদেব শবীবও একটি বিজলি ঘব। তা সম্পূর্ণভাবে একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। আমবা চিন্তা কবলে আমাদেব মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয। আমবা শান্ত অবস্থায থাকলেও বিদ্যুৎ তৈবি হয। ধ্যানেব সমযে পর্যন্ত বিদ্যুৎ জন্মায। প্রবৃত্তি কম কবলেও আমাদেব মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ জন্মায, আলফা কিবণ উদ্ভূত হয। চিন্তা কবাব সমযে আলফা কিবণ উৎপন্ন হয না, শান্ত অবস্থায তাব উদ্ভব হয। ধ্যানেব অবস্থায আমাদেব মস্তিষ্কে বিজলি তৈবি হয, কিংবা আমবা যখন সহজ শান্ত অবস্থায থাকি তখন আমাদেব দেহে বিদ্যুতেব তবঙ্গ জন্মায, এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয। ঐ সবই বিদ্যুৎ। অনেক লোকে বলে, 'আজ বিশেষ শান্তিব অনুভূতি হচ্ছে।' আমি বুঝতে পাবি, ঐ অনুভূতিও কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয। শান্তিব অনুভূতি হযেছে—তাব অর্থ, আপনাব মস্তিষ্কে আলফা কিবণেব তবঙ্গ প্রবাহিত হযেছে এবং তাব ফলে আপনাব শান্তি মিলেছে।

এক বৈজ্ঞানিক একটি গবেষণামূলক প্রযোগ কবলেন। তিনি

মাটিব ওপবে তামাব জাল বিছালেন এবং তাব ওপবে একটি লোককে বসিযে দিলেন। ঐ লোকটিব শবীবে তিনি তামাব তাব লাগিযে দিলেন এবং তাঁব শবীবেব ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতেব সংযোগ কবে দিলেন। লোকটি শান্ত হযে গেল। তাব অপূর্ব শান্তিব অনুভূতি হল। সম্ভবত সে তখন চিন্তা কবে, নিবন্তব ধ্যানমগ্ন লোক কত দীর্ঘকাল ধ্যান কবলে তবে এই শান্তিব স্থিতিতে পৌঁছতে পাবে। আপনি জিজ্ঞাসা কবতে পাবেন, যখন তামাব তাব থেকে এত শান্তি মেলে তখন আমবা তাবেব প্রযোগই কবব। একেবাবে শান্ত হযে যাব।

সাল্টাব নামে এক আমেবিকান বৈজ্ঞানিক এই বিষযে অনেক প্রযোগ কবেছেন। তাঁব মনে এক বিকল্প চিন্তা এল। মানুষ ধ্যান কবলে শান্ত হযে যায। তবে কি মানুষেব মস্তিষ্কে আলফা কিবণেব তবঙ্গ উদ্ভূত হয, পশুব মস্তিষ্কে হয না? জানোযাবেব মাথায কি আলফা তবঙ্গ তৈবি হয না? এই বিকল্প চিন্তা মনে আসতেই তিনি প্রযোগ শুরু কবে দিলেন। একথা স্বীকাব কবতে হয যে, সহজ শান্ত ভাব থেকে আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হয। কিন্তু ঐ তবঙ্গ অন্য ভাবে তৈবি কবা যায না। কিন্তু যখন কোন যোগী বা ধ্যানী ধ্যানেব প্রযোগ দ্বাবা আলফা কিবণেব তবঙ্গ সৃষ্টি কবেন তখন বৈজ্ঞানিকবা এবং চিকিৎসকবা আশ্চর্য হযে যান। দিল্লি মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটেব একদল ডাক্তাব পবীক্ষা কবে দেখেছেন, ধ্যানী নিজেব ইচ্ছায আলফা তবঙ্গ সৃষ্টি কবেন বা তাকে বোধ কবেন। আবাব উৎপাদন কবেন, আবাব বোধ কবেন। সেই সব বিজ্ঞানীদেব জানা ছিল না, প্রযত্ন দ্বাবা আলফা তবঙ্গ সৃষ্টি কবা সম্ভব হয। প্রথমে তাঁবা স্বীকাব কবেন নি। শুরুতে তাঁবা মনে কবেছিলেন যে, মস্তিষ্কে আলফা তবঙ্গ সহজভাবে উৎপন্ন হয। সাল্টাবেব মনে প্রশ্ন জেগেছিল, জানোযাবও কি ধ্যান কবতে পাবে? তাদেব মস্তিষ্কেও কি আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হতে পাবে? তাদেব মস্তিষ্কে কি আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন কবা যেতে পাবে? তিনি একটি বিড়ালেব ওপবে পবীক্ষা কবলেন। একটি বিড়ালকে অনাহাবে বেখে

তাকে বিদ্যুতেব শক বা ধাক্কা দেন। যেমন যেমন বিড়ালেব ওপবে বিদ্যুৎ প্রযোগ কবা হল তেমন তেমন সে শান্ত হযে গেল, আব তাব মস্তিষ্কে আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হল। আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হওযাব পবে বিড়ালটিকে দুধ এবং মিষ্টি খেতে দেওযা হল। বিড়ালটি দুধ এবং মিষ্টি খেল। এই পালা চলতে থাকল। প্রতিদিন আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হওযাব পবে বিড়ালটিব দুধ ও মিষ্টি মিলতে লাগল। কিছুদিন পবে বিড়াল এই কথা বুঝে গেল যে, শান্ত এবং স্থিব হযে গেলে দুধ এবং মিষ্টি মেলে। সে শান্ত থাকতে আবম্ভ কবল, ধ্যান শুরু কবল। যখন তাব খাওযাব ইচ্ছা হয তখন সে একেবাবে শান্ত হযে চোখ বন্ধ কবে দাঁড়িযে থাকে। আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। তাব মিষ্টি আব দুধ মিলে যায। ঐ বিড়াল ধ্যান কবতে, শান্ত হতে শিখে গেল।

এ থেকে এই তথ্য নির্গলিত হয যে, শান্ত বৃত্তি দ্বাবা আপনাব মস্তিষ্কে আলফা তবঙ্গ উৎপাদন কবা সম্ভব হয। তা বিদ্যুতেবই চমক, কোনও আধ্যাত্মিক বিষয নয। এ এক পবিণাম। যখন আমবা শান্ত থাকি, শবীব শিথিল হয, উত্তেজনা থাকে না এবং মৌন থাকি, তখন ঐ শান্ত অবস্থায আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হয। আমাদেব শবীবেব ঘর্ষণজাত বিদ্যুৎ এবং মস্তিষ্কেব ধাবাবাহিক বিদ্যুৎ—এই দুই প্রকাব বিদ্যুৎ নিবন্তব সঞ্চবমান এবং তাবা এত বকম ক্রিযা কবতে থাকে যে, সাধনাব পথে চলতে চলতে তাব মাঝে বিড়ালেব জগতেব অবস্থা এসে যায। ঐ বকম অবস্থায আমবা ভেবে বসি যে আমবা অনেক শান্তি প্রাপ্ত হযেছি। লোকে পাঁচ-দশ দিন শিবিবে থাকে। আমি তাদেব বলতে শুনেছি—'আহা, আমবা কত আনন্দে আছি। আমবা কত শান্তি পাচ্ছি।' শিবিব শেষ হলে তাবা যখন আবাব আপন আপন ব্যক্তিগত জীবনেব কর্মকাণ্ডেব মধ্যে এসে পড়ে, তখন তাদেব আবাব ক্রোধ কবতে দেখা যায, লড়াই কবতে দেখা যায, গালাগালি দিতে দেখা যায। তাদেব শান্তিব অনুভূতি কোথায যায, কোথায অদৃশ্য হযে

যায়, তাব পাত্তাও পাওয়া যায় না। এই পরিস্থিতি থেকে এই কথাই সুস্পষ্ট হয় যে ঐ আনন্দেব তথা শান্তিব অনুভূতি ভ্রম মাত্র ছিল। তা কেবল উপবিগত ভাসা ভাসা অনুভূতি ছিল। ঐ বকম অনুভূতি সম্বন্ধে আমাদেব সাবধান থাকা প্রযোজন, কাবণ তা কেবল ওপবেব ব্যাপাব।

প্রবৃত্তিব দ্বাবা চালিত হযে আপনাকে বহু পবিশ্রম কবতে হয। আপনাব শবীব ক্লান্ত হয। আপনি বিশ্রাম কবেন এবং ক্লান্তিব স্থিতি-কালে গভীব নিদ্রায গভীব মগ্ন হযে থাকেন। এক বা দু ঘণ্টা বাদে আপনি যখন জাগেন তখন আপনি অনুভব কবেন আপনাব শবীব সতেজ হযেছে এবং আপনি অনেক শান্তি পেযেছেন। এ স্বাভাবিক ব্যাপাব। মানুষ যখন প্রবৃত্তিব ক্ষণে পৌঁছয, বিশ্রামের ক্ষণে পৌঁছয, তখন সে শান্তি অনুভব কবে। এ কোনও মৌলিক কথা নয। মূল কথা হল, যেখান থেকে শান্তিব ওঠা উচিত, সেখান থেকেই যেন ওঠে। এব জন্য অন্য প্রযত্নেব প্রযোজন আছে, কিছু কবাব প্রযোজন আছে। শান্তিব তত্ত্ব, বিদ্যুতেব তত্ত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। শান্তিব অনুভূতি হয, আবও অনেক বিচিত্র অনুভূতি হয। এ সব কিছু ব্যর্থ নয। আমি এ সব বিষযকে নিবর্থক বলি না। মধ্য মার্গ রূপে, মধ্য বিশ্রাম রূপে এবও উপযোগিতা আছে। কিন্তু আমবা যেন এ বকম ভুল না কবি যে এই অবস্থা আমাদেব অন্তিম লক্ষ্য, আমাদেব অন্তিম গন্তব্যস্থল, আমাদেব সাধনাব অন্তিম সাধ্য। আমাদেব দৃষ্টি সুস্পষ্ট হওযা প্রযোজন।

লোকে শক্তিপাতেব কথা জানে। শক্তিপাত কি? তা বিদ্যুতেবই কেবামতি। যে লোক আপনাব শক্তি বা আপনার বিদ্যুতেব বিকাশ কবতে সমর্থ হযেছে সে-ই শুধু অন্যেব দেহে শক্তিপাত কবতে পাবে। তিনি অপব লোকেব মাথায হাত বাখেন এবং নিজেব উর্জা বা বিদ্যুৎ-শক্তি তাব মধ্যে সংক্রমিত কবেন।

কোন কিছু দেওযাব জন্য আমাদেব দুটি উপায বা সাধনযন্ত্র আছে, হাত আব পা। গ্রহণ কবাব মহৎ সাধন মাথা। মাথাই সংগ্রহ কবে।

হাতের আঙ্গুল আর পা দেয়, মস্তিষ্ক গ্রহণ করে। পুরনো পদ্ধতি অনুসারে শিষ্য গুরুর নিকটে এসে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকায়। সে বিদ্যুৎ নিতে চায়। গুরুর চরণ বিদ্যুৎ দিতে থাকে এবং তিনি যদি শিষ্যের মাথায় হাত রাখেন, তবে দু দিক দিয়ে তিনি শিষ্যকে বিদ্যুৎ দিতে থাকেন—হাত থেকে এবং পা থেকে। হাত থেকে শিষ্যের মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে, পা থেকেও তার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হতে থাকে। দু দিক থেকেই শিষ্যের বিদ্যুৎপ্রাপ্তি হতে থাকে। মাথা বিদ্যুৎ গ্রহণ করার সবচেয়ে মহৎ সাধন। তা দু দিক থেকে প্রবাহিত বিদ্যুৎ গ্রহণ করতে থাকে। আমরা আচার্যের বন্দনা করি, আর তাঁর পায়ে আমাদের মাথা রাখি। আচার্য নিজের হাত শিষ্যের মাথায় রাখেন। এদিকে পা থেকে বিদ্যুৎ দিচ্ছেন, ওদিকে হাত থেকে বিদ্যুৎ দিচ্ছেন। মাথা দুদিক থেকে আগত বিদ্যুৎ গ্রহণ করতে থাকে। এই বিদ্যুতে চমৎকারিতা আছে, শক্তি আছে। তার উপযোগিতাও আছে। এ কথা বলা চলে না যে তা সব রকমেই উপযোগবিহীন। কিন্তু এই শক্তিপাত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নয়। এই ব্যাপারের মূল তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হবে যে রাগ ও দ্বেষ ক্ষীণ না হলে, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ না হলে, চেতনা নির্মলতা লাভ না করলে, বিকারের শেষ হবে না এবং বৃত্তিসমূহের পরিবর্তন হবে না। যা থেকে পরিবর্তন আসার কথা, তা ঘটবে না। এ থেকে শুধু মধ্য পথে স্থিত কতকগুলি তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

সাধনার প্রারম্ভেই আমাদের এই সত্য বুঝতে হবে, যাতে আমরা তৈজস শরীরের তথা বিদ্যুৎ শরীরের চোখ ঝলসানো দীপ্তিতে, তার চমৎকারিত্বে বিভ্রান্ত হয়ে তাকেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বলে মনে না করে বসি, তাকে সাধনার উপলব্ধি বলে না মনে করি। তা মানসিক সাধনার উপলব্ধি মাত্র। একে যেন আমরা রাগদ্বেষের ক্ষীণতা থেকে, বীতরাগতা থেকে উদ্ভূত উপলব্ধি বলে মনে না করি।

আমরা কোন বস্তুর পরিবর্তন চাই। সে বিষয়ে আমরা যেন বার বার

সুষ্ঠু ভাবে ভেবে দেখি। 'অপ্পনা সচ্চমে সেজ্জা মেত্তি ভুত্রস্মু কপুঁত্রং'— আমাদেব সত্যকে জানতে হবে, নিজেকে এমনভাবে পবিবর্তিত কবতে হবে যাতে শত্রুতাব ভাব একেবাবে নষ্ট হযে যায। এই লোককে আমি শত্রু মনে কবি। নিজেব ভুল, নিজেব দোষ অন্যেব ঘাডে চাপিযে দিযে মনে করি সে আমাব অনিষ্ট কবেছে, সে আমাব এই বকম ক্ষতি কবেছে। এই বকম শত্রুতাব ভাব যেন আমাদেব মনে বাসা না বাঁধে। সে নিজেও কিছু অনিষ্ট কবেছে, কিছু দোষ কবেছে, এ কথা কেউ মানতে চায না। সমস্ত কিছু দোষ আমবা অন্যেব ঘাডে চাপিযে দিই। পাথব কি বকম এবডো থেবডো, আমাব ঠোকব লেগে গেল। আমাব ভুলেব জন্য আমাব ঠোকব লেগেছে, এ কথা আমবা কখনও স্বীকাব কবব না। আমবা বলব পাথব ঠিক জাযগায ছিল না, সেই জন্য আমাব ঠোকব লেগেছে। দবজা ছোট, সেই জন্য আমাব মাথায চোট লেগেছে। কিন্তু দবজা ছোট জেনেও আমি নিচু হই নি বা মাথা নোযাই নি, সেই জন্য আমাব মাথায আঘাত লেগেছে—এ বকম ভাবে কেউ চিন্তা কবে না। ও আমাব সঙ্গে এই বকম ব্যবহাব কবেছে, ঐ বকম ব্যবহাব কবেছে, আমাব বন্ধুকে বিগডে দিযেছে, তাকে ভুল বুঝিযেছে—এই বকম ভাবে আমবা সমস্ত দোষ অন্যের ঘাডে চাপাই। আমবা অন্যেব দোষ দেখি, আব অন্যকে দোষী সাব্যস্ত কবে নিজেকে দোষেব ভাগী হওযা থেকে বাঁচাই। কিন্তু যারা সত্যেব সন্ধান কবেছে বা এখনও কবছে, তাবা অন্যেব ওপবে দোষাবোপ কবে না। তাবা এ কথা স্বীকাব কবে যে তাদেব নিজেদেব মধ্যে ভ্রান্তি নানা প্রকাব বিকৃতি উৎপাদন কবছে। সেই জন্য তাবা যাতে অপ্রমত্ত থাকতে পাবে, জাগ্রত থাকতে পাবে, সর্বদা সজাগ থাকতে পাবে, তাব জন্য প্রযত্ন কবতে থাকে।

আমাব বিবেচনায শত্রুতাব অর্থ শুধু এই নয যে অন্য কোন লোকেব ওপবে বিদ্বেষ থাকবে, আব মিত্রতাব অর্থও এই নয যে শুধু অন্য কোন লোকেব প্রতি আমাব প্রেম থাকবে। শত্রুতাব অর্থ, নিজেব কর্তব্যপালনে ভুল কবে অন্যেব কর্তব্যে অবহেলা লক্ষ্য কবা। এ এক

রকমের শত্রুতা। পাথরের সঙ্গেও আমাদের শত্রুতা হয়ে যায়। আমরা পাথরকেও গাল দিতে আরম্ভ করি। পাত্রটি জলে পরিপূর্ণ ছিল। তাকে এক হাতে ওঠালাম। পাত্রটি ফেটে গেল। কিন্তু জলে ভর্তি পাত্র এক হাত দিয়ে ওঠালে সেটি ফেটে যাবে, এ সত্য আমরা খুঁজে পাই না। এ কথা আমরা চিন্তাই করব না। আমরা বলব পাত্রটি এত কাঁচা ছিল যে সেটি ফেটে যাবে না তো কি হবে? এ তো ঐ রকম পাত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। নিজেকে কর্তব্যপালনে ত্রুটির দোষ থেকে বাঁচানোর জন্য এই রকম কথাবার্তাও এক রকম অন্যের প্রতি শত্রুতা। অপর বস্তু সজীব বা নির্জীব যাই হোক না কেন, মিত্রতার অর্থ শুধু তার প্রতি প্রেম বা প্রীতি নয়। প্রেমও মিত্রতা বটে। কিন্তু বাস্তবে মিত্রতার অর্থ, সবার অস্তিত্ব স্বীকার করা, যে যেমন তাকে সেই ভাবে স্বীকার করা, কারও ওপরে কিছু আরোপ না করা। এর নাম মিত্রতা। একেই 'অনাশাতনা' বলে। জৈন সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ—আশাতনা। জীবের আশাতনা হয়, অজীবেরও আশাতনা হয়। বাড়িঘরের আশাতনা হতে পারে, কাপড়চোপড়েও আশাতনা হতে পারে। সব কিছু জিনিসেরই আশাতনা হতে পারে। আমাদের পক্ষের ব্যাপক মনোভাব হল, আমরা সত্যের সন্ধান করব, সবার সাথে মিত্রতা করব। অর্থাৎ যে যেখানে যেমন আছে আমরা তাকে তার সেই সহজ ভাবেই স্বীকার করে নেব এবং কারও ওপরে কিছু আরোপ করব না। এই হল সত্য। এই সত্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এই সত্য গ্রহণ না করতে পারলে কোন রকম সাধনা করা সম্ভব নয়।

এক সাধক আছেন। যদি তিনি দু ঘণ্টা ধরে ধ্যান করেন, মৌন থাকেন, কিন্তু অন্যের মধ্যে নানা দোষ দেখতে পান, তবে আমার বিবেচনায় তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিরত নন। তিনি প্রকৃতই ধ্যান এবং মৌন সাধনায় ব্যাপৃত নন। তাঁর দৃষ্টি অন্যের ওপরে। এ থেকে তিনি কি পেয়েছেন? নিজের ভেতরে তিনি কিসের সন্ধান করেন? তাঁর ভেতরে এতে কি পরিবর্তন হয়? সাধনার দ্বারা কিছু বদলানো

উচিত, পবিবর্তন হওযা উচিত। কিন্তু পবিবর্তন কেন হয না?

তাব একটি কাবণ, আমাদেব সমস্ত শবীব প্রকম্পিত। আমবা অনেকবাব অনুপ্রেক্ষা কবি, এই কথা বাবে বাবে আবৃত্তি কবি—'প্রকম্পনকে, শবীবে নিবন্তব ঘটিত প্রকম্পনকে, দেখ।' মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমাদেব শবীব প্রকম্পনেব পুলিন্দা। প্রকম্পন আব প্রকম্পন, কেবল প্রকম্পন। আমাদেব ভাগ্য ভাল যে আমবা সব প্রকম্পন দেখতে পাই না। সমস্ত কিছু প্রকম্পিত হচ্ছে, কোন কিছুই শক্ত নয। হাডগুলি এত ফাঁপা যে তাব ভেতব দিযে যে কোন কিছুই বেবিযে যেতে পাবে।

গৌতম ভগবান মহাবীবকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, 'ভন্তে! কে বদলায?'

ভগবান বলেছিলেন, 'যা অস্থিব তাই বদলায। যা স্থিব তা বদলায না। যখন জীব যৌবন প্রাপ্ত হয তখন তাব সমস্ত অবযব বদলায।' হাত বদলে যায, পা বদলে যায, সব কিছু বদলে যায। এই পবিবর্তন কেন হয? এব উত্তব: দেহ অস্থিব, কম্পনেব অধীন। শুধু কম্পন ছিল বলে পবিবর্তন হযেছে। কম্পন যদি না হতো তবে পবিবর্তন হতো না। সমস্ত কিছু কম্পনেব ব্যাপাব। বোগ কেন হল? কম্পন ছিল, সেই জন্য বোগ হল। কম্পন না থাকলে বোগ হতো না। স্থিব বস্তুব কখনও কোন ব্যাধি হতে পাবে না। অস্থিব বস্তুতেই ব্যাধি হয। কম্পন থেকে বোগ হয, কাবণ কম্পন থেকে বদলানোব ক্ষমতা আসে। সব কিছু বদলায, বদলাতে পাবে, আব যা বদলায তাব পক্ষে সে পবিবর্তন ভালও হতে পাবে, মন্দও হতে পাবে। সুন্দবও হতে পাবে, অসুন্দবও হতে পাবে, মিষ্টও হতে পাবে, কটুও হতে পাবে। যা বদলায তাব নানা প্রকাব পবিবর্তন হতে পাবে।

আমাদেব গোটা শবীব প্রকম্পনেব পুলিন্দা। যা কিছু আমাদেব দৃষ্টিগোচব হয এবং যা কিছু আমাদেব দৃষ্টিব বহির্ভূত সব কিছু প্রকম্পন। আমি কথা বলছি, কথাব সাথে সাথে শব্দেব তবঙ্গ এত বেগে ছুটে

যায় যে মনে হয় দশটি সাপ এক সাথে বেগে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু বিনা মাধ্যমে, খালি চোখে আমরা ঐ সব তরঙ্গ দেখতে পাই না। ব্যাঙ্গালোরে ডঃ বিশ্বেশ্বরায়া সায়েন্স ইনস্টিটিউটে গিয়ে আমি এক যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলি। ঐ যন্ত্রের ওপরে ঐ শব্দের তরঙ্গ এত বেগে ছুটতে লাগল যে মনে হল পঞ্চাশটি সাপ দৌড়চ্ছে। সবই প্রকম্পন আর প্রকম্পন। আমাদের শরীর প্রকম্পনময়, এই সত্য যেন আমরা ঠিক মত উপলব্ধি করি। আমাদের শরীরের যত কিছু পরিণাম, যত কিছু পরিবর্তন হয় সে সব কিছুই প্রকম্পনের দ্বারা ঘটে থাকে।

আমি এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছি যে প্রকম্পনের পরিবর্তন করা সম্ভব। অর্থাৎ প্রতিরোধ থেকে প্রকম্পন উৎপন্ন হতে পারে। যেমন, বিচারের তরঙ্গ এক প্রকারের প্রকম্পন। এক রকম বিচার চলতে থাকে আর প্রকম্পন চলতে থাকে, তার তরঙ্গ চলতে থাকে। আমরা ভাবনা করি, বিরোধী তরঙ্গ উৎপাদন করি। আগেকার তরঙ্গের সঙ্গে তার সংঘাত হয়। সে তরঙ্গ এত শক্তিশালী যে আগেকার তরঙ্গের সমাপ্তি ঘটায়। এ সবই আমরা প্রকম্পনের ফলে করি।

'ইমং শরীরং অনিচ্চ'—এ শরীর অনিত্য, এ কথা আমি বার বার বলে চলেছি। লোকে জিজ্ঞাসা করে, এ দিয়ে কি হবে? আমরাও এ কথা দশ-বিশ মিনিট বার বার আবৃত্তি করি, কিন্তু তাতে কি হবে? এর মর্ম আপনারা এখনও বুঝতে পারবেন না। আপাতত এই কথাগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে বার বার আবৃত্তি করতে থাকুন। সঙ্কল্প করুন যে এই কাজ করতেই হবে এবং এই রকম করা ভাল, হিতকর, কল্যাণকর। ঐ রকম করে কি হবে সে কথা ধীরে ধীরে আপনাদের বোধগম্য হবে। আপনারা শুরু থেকে স্বীকার করে বসে আছেন, শরীর স্থির, নিত্য। এই ধারণা আমাদের সংস্কারে পরিণত হয়েছে। তার নিজের প্রকম্পন এবং তরঙ্গ আছে। ঐ প্রকম্পন-তরঙ্গকে প্রতিহত করতে হলে বিরোধী তরঙ্গের প্রয়োজন। আপনি 'ইমং শরীরং অনিচ্চ'—এই বাক্যটি আবৃত্তি করতে থাকুন। দশ-বিশ মিনিট ধরে আবৃত্তি করে যান।

এ থেকে বাচিক বা বচন থেকে উদ্ভূত তবঙ্গ সৃষ্ট হয। সঙ্গে সঙ্গে আপনি ভাবনা কবতে থাকেন। ভাবনা থেকে প্রকম্পন উৎপন্ন হয। যেমন যেমন 'ইমং শবীবং অনিচ্চ' এই ধ্বনি এবং ভাবনা শক্তিশালী হযে যাবে এবং তাব তবঙ্গ প্রবল হবে তেমন তেমন তা পূর্বগত সংস্কাবেব তবঙ্গকে সমাপ্ত কবে দেবে, বিনষ্ট কবে দেবে। যদি এই কথা আমাদেব বোধগম্য হয তবে 'ইমং শবীবং অনিচ্চ'—এই কথা বাবে বাবে আবৃত্তি কবতে কবতে আমাদেব বিবক্ত হওযাব বা নিবাশ হওযোব কোন কাবণ থাকবে না। আমবা কথা বলে প্রকম্পন সৃষ্টি কবি। কিন্তু ঐ প্রকম্পন ততটা কার্যকবী হয না। সেই জন্য বাব বাব বলা হযেছে, মনকে একাগ্র কব, মনকে সঙ্গে সঙ্গে জুডে বাখ, তন্ময়তা অভ্যাস কব। তাব অর্থ, নিছক কথাব প্রকম্পন ততটা কার্যকবী হয না। যখন তাব সাথে ভাবনাব প্রকম্পন সংযুক্ত হয তখন তা অত্যন্ত শক্তিশালী হয। ঐ শক্তিশালী প্রকম্পন আগেকাব প্রকম্পনকে বাতিল কবে দেয।

প্রকম্পনকে বোধ কবা সম্ভব। আমি নির্বিচাব ধ্যানেব কথা বলছি। শবীবকে স্থিব কব, কাযোৎসর্গ কব, শবীবকে ঢিলে কব, মৌন থাক, আব মনকে শান্ত কব। কুম্ভক কবে মনকে নির্বিকল্প কব। কোন কল্পনাবিলাস কববে না। এই বকম কবলে প্রকম্পনকে বোধ কবতে পাবা যায। প্রকম্পন বোধ কবা অত্যন্ত প্রযোজন, আব তাকে বোধ কবলে তা যত ক্ষীণ হয, তাব যত ধাক্কা লাগে, তা আমবা কল্পনাও কবতে পাবব না। চলতে চলতে যে গতি সহসা রুদ্ধ হয তাকে সামলানো বড মুশকিল। যে লোক দ্রুত বেগে চলছে সে হঠাৎ একেবাবে থামতে পাবে না। তাকে প্রথমে তাব গতিবেগ কমিযে দিতে হবে, পবে এক সময আসবে যখন সে থামতে পাববে। সেই বকম তেজী গাডি থামানোব জন্য হঠাৎ পুবো ব্রেক কষলে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথমে গতি মন্থব কব, তাব পবে ব্রেক কব। চলতে চলতে আমবা যদি বিচাবেব ওপব পুবো ব্রেক লাগাই, শ্বাসেব ওপবে হঠাৎ ব্রেক লাগাই,

তাকে একবাবে থামতে যাই, তবে এমন বিস্ফোবণ হবে যে তাতে পুঞ্জীভূত সংস্কাব ধ্বংস হবে। প্রকম্পনেব বোধ এক সত্য। প্রকম্পন বোধ সম্ভব।

আমি ছোট ছোট কথাব উল্লেখ কবছি। এগুলি ছোট ছোট সত্য। সেগুলি বুঝতে পাবলে সাধনাব ওপবে আমাদেব নিষ্ঠা বেড়ে যাবে। অভ্যাসেব সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব জাগরুকতা বৃদ্ধি পাবে।

আপনাকে বলেছি, শ্বাসেব মোড়েব ওপবে লক্ষ্য বাখুন। আমবা যখন পুবো শ্বাসেব সাথে মনকে নিয়ে চলেছি তখন শ্বাসেব মোড়েব ওপবে ধ্যান কেন্দ্রিত কবাব কথা কেন? এই কথা আপনি বুঝবেন যাতে আপনাব মন এত সংবেদনশীল হয় বহু ছোট তত্ত্বেবও অবধান তা কবতে পাবে।

সাধাবণ ক্যামেবা আপনাব ফোটো বা প্রতিচ্ছবি তুলতে পাবে। কিন্তু ধরুন আপনি কোন জাযগায দু ঘণ্টা বা দশ মিনিট বসে বইলেন, তাবপবে উঠে চলে গেলেন। তখন আপনাব ছবি তুলতে হবে। ঐ সাধাবণ ক্যামেবায সে ছবি তোলা যাবে না। তাব জন্য সংবেদনশীল বা অনুভূতিসম্পন্ন ক্যামেবা প্রযোজন, এমন ক্যামেবা যাতে মানুষ কোথাও অবস্থান কবাব পবে সেখান থেকে চলে গেলেও তাব ছবি উঠতে পাবে। তাব কাবণ মানুষটিব আকৃতিব পবমাণু সেই জাযগায সঞ্চিত থাকে। ঐ বকম ক্যামেবা দ্বাবা চোব ধবা যেতে পাবে, আবও অনেক বকম জিনিসেব সন্ধান কবা যেতে পাবে, অনেক কিছু কথাব পাত্তা পাওযা যেতে পাবে। ঐ সব কাজ কবাব জন্য ক্যামেবায বিশেষ সূক্ষ্ম ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। আমাদেব মন সম্বন্ধেও ঐ একই বক্তব্য। আমাদেব মনেব সংবেদনশীলতা যত বৃদ্ধি পাবে তত আমবা সূক্ষ্ম কথা ধবতে পাবব।

যে সমস্ত প্রযোগ দ্বাবা মনকে ছোট বিন্দুকে গ্রহণ কবতে সক্ষম কবা যায সে সমস্তই হল মনকে সংবেদনশীল কবাব প্রক্রিযা। আপনি সম্পূর্ণ নাসাগ্রে আপনার শ্বাসেব প্রকম্পন দেখুন। এই প্রক্রিযা চলতে

চলতে আপনি এক সময নির্দেশ পাবেন। নাসাগ্রেব নিচে নাসাগ্রেব এক আঙ্গুল পবিমিত স্থানে মনকে কেন্দ্রিত করুন এবং সেখানে প্রকম্পন লক্ষ্য করুন। আপনি হযতো ভাবছেন, যখন সম্পূর্ণ নাসাগ্রেব প্রকম্পন দেখছি তখন এক বিন্দুতে ঘটিত প্রকম্পন দেখাতে কি প্রভেদ হবে? এক আঙ্গুল পবিমিত স্থান কেন দেখব? এব উত্তব সুস্পষ্ট। যে মন সম্পূর্ণ নাসাগ্রেব প্রকম্পন দেখছে তাকে এক বিন্দুতে এক আঙ্গুল পবিমিত স্থানে কেন্দ্রিত কবাব অর্থ, সেই মনেব সংবেদনশীলতা বেড়ে গিযেছে, তাব ক্ষমতা বেড়ে গিযেছে।

এই সব ছোট ছোট জিনিস কিভাবে আমাদেব মনে পবিবর্তন নিযে আসে, কিভাবে আমাদেব শাবীবিক ক্রিযাকলাপে পবিবর্তন ঘটায, কি কবে আমাদেব ধাবণা ও সংস্কাবসমূহেব উদ্ভব কবে এবং কি কবে আমাদেব ভেতবকাব পুঞ্জীভূত সংস্কাবকে উন্মুলিত কবে, আপনাবা যদি বুঝতে পাবেন তবে সাধনাব দ্বাবা আপনাদের যা পাওযা উচিত, যা আপনাদেব অভীষ্ট, তাই পাবেন।

বাজা একটি লোকেব ওপবে প্রসন্ন হযে বললেন, 'কিছু চাও। তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে দেব।' লোকটি একটু অদ্ভুত ধবনেব ছিল। সে ধন বা প্রভুত্ব চাইল না। সে বলল—'বাজন। আপনি যখন দান কবতে চান তখন আমাকে শান্তি দান করুন। আমি শান্তি চাই, অন্য কিছু চাই না।' বাজা চিন্তা কবলেন, 'আমি একে শান্তি দেব কোথা থেকে? আমি নিজেই অশান্ত, আমি কোথা থেকে একে শান্তি এনে দেব?' তিনি এক সন্ন্যাসীব কাছে গিযে বললেন, 'গুরুদেব। কৃপা করুন। আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচান। আমি একটি লোকেব প্রার্থনা পূবণ কবাব কথা দিতে সে বলল, 'আমাকে শান্তি দিন।' আমাব কাছে তো শান্তি নেই, আমি তাকে কোথা থেকে শান্তি দেব। এখন আপনি আমাকে দযা করুন।'

সন্ন্যাসীব নিজেব শান্তি ছিল, কাজেই তিনি বাজাকে শান্তি দিতে পেবেছিলেন। বাজা সেই লোকটিকে ডেকে তাকে শান্তিব উপায বলে

দিলেন। সে শান্তি পেল।

সাধনা থেকে যে ক্ষমতা, যে পুবস্কাব পাওযা যায তা অন্য কিছু থেকে পাওযা যায না। স্থুল শবীব ও স্থুল চেতনা থেকে পাওযা যায না, স্থুল কর্ম থেকে পাওযা যায না। সূক্ষ্ম চেতনা এবং সূক্ষ্ম জগতেব স্তবে পৌঁছতে পাবলে তবে তাকে পাওযা সম্ভব হয। কথা হচ্ছে' সেখানে পৌঁছতে হবে। আমবা যদি কোন স্থুল স্তবে থেকে যাই তবে ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হব না। সেই জন্য আমবা সাধনাব মাধ্যমে স্থুল শবীব এবং স্থুল চেতনাকে অতিক্রম কবে সূক্ষ্ম শবীব ও সূক্ষ্ম চেতনা পর্যন্ত পৌঁছনোব চেষ্টা কবি। সেখানে পৌঁছলে আমাদেব অভীষ্ট পূবণ হবে।

১৩

অধ্যাত্মের রহস্যের সন্ধান

আমবা কোন লোকেব সঙ্গে বিশ বছব বাস কবেও তাকে সম্পূর্ণ জানতে এবং চিনতে না-ও পাবি। দূবেব মানুষকে জানা কিছুটা সহজ। কিন্তু যে লোকেব সঙ্গে বাস কবি তাব পবিচয পাওযা বেশ কঠিন।

অধ্যাত্ম বিষয আমাদেব এত নিকট, এত অন্তবঙ্গ, তাই এত বহস্যাবৃত। কিন্তু ঐ বহস্য উদঘাটন ছাডা আমাদেব কোন গত্যন্তব নেই। আজ পর্যন্ত দুনিযাতে যত বিকাশ হযেছে সে সবই অধ্যাত্মেব বহস্য উদঘাটন দ্বাবা সম্ভব হযেছে। ভৌতিক বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীবা বহস্য উদঘাটন কবছেন, আব এখন তাঁবা আণবিক বিস্ফোবণেব ভূমিকা পর্যন্ত পৌছেছেন। মানসিক জগতে মনোবিজ্ঞানীবা অনেক অনেক বহস্য উদঘাটন কবে অবচেতন মনেব ভূমিকা পর্যন্ত পৌছে গিযেছেন। অন্য অনেক ক্ষেত্রে যখনই বহস্যেব আববণ উন্মোচন সম্ভব হযেছে তখনই নতুন শক্তিব প্রবাহ মানুষেব আযত্তে এসেছে। আব, শক্তিস্রোতেব উপলব্ধি বহস্যেব উদঘাটন ছাডা সম্ভব নয এবং শক্তি-স্রোতেব উপলব্ধি না হলে এই সংসাবে বিকাশ হতে পাবে না। আজ-কালকাব ভৌতিক জগতেব সমস্ত বিকাশ বিদ্যুৎ এবং ইন্ধনেব ওপবে নির্ভবশীল। পেট্রোলেব কোন সমস্যা হলে পৃথিবীব সমস্ত বাষ্ট্র

টলমল করে, লোকে দুর্ভাবনায় পড়ে। তাদের সমস্ত শক্তিস্রোত শুকোতে আরম্ভ করে। আপনি কল্পনা করুন সারা দুনিয়াতে পেট্রোল নেই, বিদ্যুৎ নেই, আণবিক ইন্ধন নেই। তা হলে কি এই ভৌতিক বিকাশ টিঁকে থাকতে পারবে? কখনই তা সম্ভব নয়। এই সবই বিদ্যুতের আধারে সংঘটনশীল। আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে, আমাদের শক্তির বিকাশের একটি উৎস হল বিদ্যুৎ। যেমন আধুনিক সমস্ত ভৌতিক বিকাশ বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল তেমনি অধ্যাত্ম শক্তির বিকাশও বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল। এই হল অধ্যাত্মের রহস্য।

আমাদের শরীর বিদ্যুতের শরীর। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। জৈন দর্শনবিদ ভালভাবেই জানেন যে, আমাদের সমস্ত অভিব্যক্তি তৈজস শরীরের মাধ্যমেই হয়। তৈজস শরীর ছাড়া শরীরের সঞ্চালন সম্ভব নয়। তৈজস শরীর বিনা কেউ কথা বলতে পারত না, অঙ্গুলিহেলন করতে পারত না, শ্বাস নিতে পারত না, খেতে পারত না, খাদ্য পরিপাক করতে পারত না। আমাদের সমস্ত উর্জা বা শক্তি তৈজস শরীরের মাধ্যমে প্রকট হয়। এই বিদ্যুৎমণ্ডল, বিদ্যুৎ শরীর এবং তৈজস শরীর—এ সবই মনুষ্যদেহে শক্তির অবতরণের এবং অধ্যাত্মের কাছে পৌঁছবার জন্য একটি দুয়ার। তৈজস শরীর দ্বারা আমরা যে শক্তি আয়ত্ত করি তা আজকালকার জগতে বিস্ময়কর বটে। প্রাচীন সাহিত্যে এই সমস্ত শক্তিকে 'লব্ধি' বলা হয়েছে। এগুলিকে 'যোগজ বিভূতি'ও বলা হয়েছে। এই সমস্ত লব্ধি, ঋদ্ধি, যোগজ বিভূতি তৈজস শরীরের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

জৈন আগম প্রজ্ঞাপনায় দু রকম মানুষের বর্ণনা পাওয়া যায়—ঋদ্ধিপ্রাপ্ত আর ঋদ্ধিবিহীন মানুষ। যে মানুষ ঋদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ শক্তি উপলব্ধি করেছে, সে ঋদ্ধিপ্রাপ্ত মানুষ। তার শক্তিসমূহ যথার্থই বিস্ময়কর।

অধ্যাত্মের আলোচনার প্রারম্ভে বাহ্য বস্তু এবং অধ্যাত্মের মধ্যে আমাদের একটি ভেদরেখা অঙ্কিত করতে হবে। প্রাচীন আচার্যগণ

একটি ভেদরেখা নির্দিষ্ট করেছেন। ভগবান মহাবীর বলেছেন—যে মানুষ অধ্যাত্মকে জানে আর যে বাহ্যকে জানে, সে অধ্যাত্মকে জানে। এর তাৎপর্য এই যে, আমাদের দুই স্থিতি প্রকট—এক বাহ্য জগতের এবং অপরটি অধ্যাত্ম জগতের। একটি আমাদের বাইরের সংসার। অপরটি আমাদের ভেতরের সংসার। বাইরের সংসারের নাম সমাজ, ভেতরের সমাজের নাম ব্যক্তি। সময় সময় আমরা বাহ্য জগতের সঙ্গে সংযুক্ত হই। তার অর্থ, অন্য লোকের সঙ্গে আমাদের সংযোগ হয়। ঐ লোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আমরা সমাজ হয়ে যাই। ব্যক্তি সমাজে পরিণত হয়। যখন আমরা একলা থাকি, কারও সঙ্গে আমাদের সংস্রব থাকে না, আমাদের একাকীত্ব সুরক্ষিত থাকে তখন সমাজ হয়ে যাই না, তখন আমরা ব্যক্তি থাকি। আমাদের সামাজিক জীবনও আছে, আবার ব্যক্তিজীবনও আছে। ব্যক্তি জীবনে সংঘটনশীল ব্যাপারগুলি ভিন্ন প্রকারের হয়।

আমরা দু রকম জীবন যাপন করে থাকি—বৈযক্তিক বা ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক জীবন। আমাদের জীবন দু রকম মান-বিশিষ্ট। আমাদের বৈযক্তিক জীবন আধ্যাত্মিক বা আন্তরিক জীবন। আর সামাজিক জীবন আমাদের বাইরের জীবন। এ জীবন আমরা সাধারণত বাইরের জগতে যাপন করি। আমরা দু রকম জীবন যাপন করি এবং দুয়েরই রহস্যের সন্ধান করি। বাহ্য জগতের বা সমাজজীবনের, তথা আন্তরিক জগতের বা ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করি।

অন্তর্জগৎ চেতনার জগৎ, কেবল চেতনার জগৎ। সেখানে শুধু চেতনা থাকে, আর কিছুই থাকে না। তাকে আমরা শক্তি, জ্ঞান বা অন্য যে নামই দিই না কেন, তা বিশুদ্ধ চেতনা মাত্র। ঐ চেতনায় যা আছে তা আনন্দও বটে, শক্তিও বটে, জ্ঞানও বটে। কিন্তু মোটের ওপর তা বিশুদ্ধ চেতনা, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাইরের জগৎ বৈচিত্র্যের জগৎ। সেখানে অনেক পদার্থ, অনেক

জিনিস। সেগুলি অণু-পবমাণুব দ্বাবা সংঘটিত। অন্তর্জগতে আছে শুধু চেতনা, আব কোন কিছুই নয়।

একটি চেতনাব জগৎ, অপবটি পদার্থেব জগৎ। যখন আমবা চেতনাব জগতেব দিকে অগ্রসব হই তখন আমবা যেখানে পৌছতে হবে বলে বিচাব কবি, সে-ই আমাদেব অভ্যাস। চেতনা থেকে বিচ্যুত হযে, অন্যেব সঙ্গে মিলিত হয়ে আমবা যা কিছু কবি সেই আমাদেব ভৌতিক বা বস্তু জগৎ।

বহস্যেব সন্ধানেব জন্য আমাদেব কিছুটা গভীবতাব মধ্যে যেতে হবে। কখনও কখনও কোন কিছু ঘটে আব বহস্য উদ্‌ঘাটিত হয। কখনও কখনও কোন নিমিত্ত থাকে না, কিন্তু অনাযাসে অতল গভীবতায ডুব দেওযাব সুযোগ ঘটে যায়, আব বহস্য প্রকাশিত হয।

আপনাবা বহস্য উদ্‌ঘাটনেব সিদ্ধান্ত জানেন এবং অনেক ঘটনাব কথাও শুনেছেন।

একটি লোক পাহাড়েব পাশে বসেছিল। সেখানে একটি ঝবণা বযে যাচ্ছিল। সেখানে এক হবিণী এল। সে অনেকক্ষণ তাব একটি পা জলে ডুবিযে বাখল। আব এক দিন এল। তাব পবে তৃতীয এবং চতুর্থ দিনও এল। চাবদিন সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল, পঞ্চম দিনে সে পা সোজা কবে চলতে লাগল। সেই লোকটি ভাবল—হবিণীটি কেন বোজ আসে? সে বিচাব কবল। হবিণীব পা দেখল। তাব পা জখম ছিল। হাড ভেঙ্গে গিয়েছিল। দু-চাবদিন জলেব উপচাব প্রযোগের ফলে তাব পা ঠিক হয়েছিল।

লোকটি এই উপচাব আযত্ত কবল। প্রাকৃতিক চিকিৎসা আবম্ভ হল। জলেব এবং মাটিব উপচাব শুরু হল।

একটি লোক বসে ছিল। সে দেখল একটি বাচ্চা শুয়ে আছে। তাব শ্বাস ফুলে উঠছিল। তাব গভীব শ্বাস পডছিল। পেট ফুলে ছিল, আব শবীব ব্যথায কুঁকড়ে যাচ্ছিল। সে লা-লা-লা কবে এক অব্যক্ত শব্দ কবছিল। লোকটি চিন্তা কবল। সে ভাবল যে ঐ ধ্বনিব সাথে

সাথে একটা কিছু হচ্ছে। সে তাব প্রযোগ কবল। ধ্বনি-চিকিৎসাব বিকাশ হল। লোকটি শব্দেব উচ্চাবণ দ্বাবা ধ্বনি-চিকিৎসাব বিকাশ ঘটাল। এই পদ্ধতি দ্বাবা বোগ নিবাময হল।

একটি লোকেব মাথায অত্যন্ত ব্যথা হযেছিল। সে বৈদ্যেব কাছে গেল। অনেক চিকিৎসা কবাল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। সে জীবন সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হল। তাব জীবন দুঃসহ হযে উঠল। একবাব কোন একটি মানুষেব সঙ্গে তাব লডাই হল। তাব শত্রু বেগে এসে তাকে বাণ মাবল। তাব পাযে লাগল। বাণটি পাযে বিদ্ধ হওযা মাত্র তাব মাথাব ব্যথা একেবাবে সেবে গেল। সে আশ্চর্য হযে গেল। সে চিন্তা কবল—এত উপচাব প্রযোগেও আমাব ব্যথা সাবে নি, আব একটি তীব লাগতেই তা একেবাবে সেবে গেল। মনে হচ্ছে আমাব মাথায কোন কালেই কোন ব্যথা ছিল না। এ বহস্য বুঝতে পারলাম না। সে বৈদ্যেব কাছে গেল। নিজেব দীর্ঘ কাহিনী তাকে শোনাল। বৈদ্যও বিস্মিত হযে গেল। সে ঐ বকম প্রযোগ শুরু কবল। আব একটি লোকেব মাথায ব্যথা হল, তাকে সে তীব মাবল। তাব ব্যথা সেবে গেল। তৃতীয, চতুর্থ, পঞ্চম লোকেব ওপবে একই প্রযোগ কবল এবং তাদেব মাথা ব্যথা সেবে গেল। তখন এই তথ্য স্থাপিত হল যে, মাথাব ব্যথা হলে পাযেব বিশেষ স্থানে বাণ বিদ্ধ কবলে মাথাব ব্যথা সেবে যাবে। এই প্রযোগেব নাম আকুপাংচাব চিকিৎসা পদ্ধতি।

আমাদেব শবীব বিদ্যুতেব শবীব। তাতে বিদ্যুতেব প্রাধান্য। আমবা মানি বা না মানি বিদ্যুতেব ভাবসাম্যেব অভাবে যে শবীবে অনেক বোগ হয এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তথ্য। তৈজস শবীব অস্থিব হলে তাতে নানা প্রকাব বিকৃতি সঞ্জাত হয। যদি আমবা তৈজস শবীবেব সমুচিত ব্যবস্থা কবি, বিদ্যুতেব ভাবসাম্য স্থাপন কবি, তাব সমতা আনি, তবে আমবা নিজে নিজে অনেক কিছুবই সমাপ্তি ঘটাতে পাবি, অনেক পবিস্থিতিব মীমাংসা আমবা নিজেবাই কবতে পাবি।

আমি এই সমস্ত আলোচনা এইজন্য করছি যে বহস্যেব সন্ধান না

কবলে. বহস্য উদ্ঘাটন না কবলে এই ত্বনিযায বিকাশ সম্ভব হবে না, শক্তিব উপলব্ধি হবে না। প্রাচীন আচার্যগণ অনেক বহস্যেব সন্ধান কবতেন। আজ আমবা যদি কোন সিদ্ধান্ত বুঝতে পাবি কিছুকাল পবেই আমবা তা বিস্মৃত হই। সব কিছু ভুলে যাই। ভুলে যাওযাব ফলে আমবা ঐ সমস্ত বহস্যেব ঠিকমত ব্যাখ্যা কবতে পাবি না, এবং তাদেব প্রয়োগ কবতে পাবি না।

এই প্রসঙ্গে আমি একটি ঘটনাব আলোচনা কবব। আমি সত্য একটি কথা পড়েছি—উত্তব দিকে মাথা দিযে বা দক্ষিণ মুখে পা বেখে শোযা উচিত নয। এই বচন আমাদেব দেশে প্রচলিত আছে। কেউ কেউ এ বচন অন্ধ বিশ্বাস বলে মনে কবে। তাবা বলে—শয়নকালে আমবা পা দক্ষিণ, উত্তব, পশ্চিম বা পূর্ব যে দিকেই বাখি না কেন, তাতে কি পার্থক্য হয? কোন না কোন দিকে মাথা তো বাখতে হবে। কিন্তু আজকাল প্রত্যেক জিনিসেব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রস্তুত কবা হচ্ছে। বিজ্ঞানেব বহস্য উদ্ঘাটনেব পবে ব্যাপাব এই বকম দাঁড়িযেছে যে, কোন লোক যদি কোন বিশ্বাসকে অন্ধ বিশ্বাস বলে তবে সে নিতান্ত তুঃসাহসী। আগেকাব দিনে এ বকম বলা চলত, আজকাল আব চলে না। সম্প্রতি আমি এই বিশ্বাসেব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পড়ে বিস্মিত হযেছি।

আমাদেব শবীবে তু বকম বিত্যুৎ আছে—পজিটিভ ও নেগেটিভ। এক হল ধনাত্মক, অপবটি ঋণাত্মক। চোখ, কান, নাক, মাথা, মুখ প্রভৃতি শবীবে ওপবেব অংশে আছে ধনাত্মক বিত্যুৎ। আব পা, জঙ্ঘা প্রভৃতি শবীবেব নিচেব অংশে আছে ঋণাত্মক বিত্যুৎ। ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ড থেকে, জগৎ থেকে পৃথক নয। যখন জগতেব সঙ্গে তাব সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তখন সে সমাজে পবিণত হয। আমবা বাতাববণেব দ্বাবা প্রভাবিত হযে এ জগতে বাস কবি। পবিস্থিতিবও প্রভাব আছে। আমবা এই সব কিছুব দ্বাবা প্রভাবিত হই।

পৃথিবীব তুটি দিককে ধ্রুব বলে মানা হয—উত্তব ও দক্ষিণ। উত্তবে

যে ধ্রুব সেখানে অফুরন্ত বিদ্যুৎভাণ্ডার আছে। সেখানে এতই বিজলির প্রকাশ যে সেখানে গেলে মনে হয় শত শত সূর্যের উদয় হয়েছে। এমন চোখ-ধাঁধানো আলো। অন্ধকারের কোন পাত্তাই নেই। দক্ষিণী ধ্রুবতে সম-পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে। উত্তরের ধ্রুবতে ধনাত্মক বিদ্যুৎ, দক্ষিণের ধ্রুবতে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ। যখন লোকে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শোয় তখন দক্ষিণের দিকে তার পা থাকে। দক্ষিণের দিকে থেকে যে বিদ্যুতের প্রবাহ আসে সেটি ঋণাত্মক। মানুষের পায়ের বিদ্যুৎও ঋণাত্মক। দুই ঋণাত্মক বিদ্যুৎ যেখানে মিলিত হয় সেখানে প্রতিরোধ ঘটে, সংঘর্ষ হয়। একই ভাবে যখন ধন বিদ্যুতের সঙ্গে ধন বিদ্যুৎ মিলিত হয় তখন প্রতিরোধ ঘটে। ফলে একে অন্যের সহায়ক না হয়ে পরস্পরকে পরাস্ত করতে প্রয়াস করে। সেই জন্য যে লোক দক্ষিণদিকে পা রেখে শোয় তার ঋণাত্মক বিদ্যুতের সঙ্গে দক্ষিণী ধ্রুব থেকে আগত ঋণাত্মক বিদ্যুতের সংঘর্ষ লাগে। ঐ রকম পরিস্থিতিতে লোকের মনে নানা রকম দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়, সে খারাপ খারাপ স্বপ্ন দেখে, তার শরীরে নানা রকম রোগ ও বিকৃতি উৎপন্ন হয়। সেই কারণে বৈজ্ঞানিকরা প্রতিপন্ন করেছেন, দক্ষিণ দিকে পা রেখে ঘুমোনো উচিত নয়। তা থেকে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার রোগ হতে পারে।

আমরা যেন একথা ভুলে না যাই যে রহস্য উদ্‌ঘাটনের পরে যে তত্ত্ব আমরা বুঝতে পারি এবং সত্য বলে দেখতে পাই এবং যার ওপরে আমাদের যথার্থ বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তা শুধু মেনে নেওয়া থেকেই হয় না।

এখন আপনাদের অধ্যাত্ম-রহস্য বোঝানোর জন্য এই সন্দর্ভের অল্প আলোচনা করতে চাই।

ধর্মের মূল সূত্র—পাপ কোরো না, পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কিন্তু কিভাবে নিজেকে বাঁচাতে পারবে, সেই হল প্রশ্ন। মন কত চঞ্চল, শরীর কত চঞ্চল। বাণী কত চঞ্চল। তা ঐ সব থেকে কিছু না কিছু পাপ হয়ে যায়। আমি পাপ থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করব? পাপ থেকে বাঁচার কি উপায় আছে? অধ্যাত্মের রহস্য উদ্‌ঘাটন ছাড়া অন্য

কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়. ঐ প্রশ্নের সমাধান সম্ভব নয়। মানুষ পাপের হাত থেকে বাঁচতে পারে এ কথা অনেকে মানতে পারে না। তাদের প্রশ্ন—যে দুনিয়াতে পাপ করার জন্য অনবরত হাজার হাজার প্রেরণা আসছে, সেই দুনিয়াতে বসে থেকে লোক কি করে পাপের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

ভগবান মহাবীর এ বিষয়ে উপায় নির্ধারণ করার প্রসঙ্গে বলেছেন—এক কচ্ছপ ছিল। যখন কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপস্থিত হতো—পাখিতে তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে গেলে, শিয়াল প্রভৃতি পশু তাকে খেতে চেষ্টা করলে, কোন রকম নিরাপত্তার অভাব বা ভয় উপস্থিত হলে—সে তৎক্ষণাৎ নিজের খোলের মধ্যে চলে যেত। প্রকৃতি তাকে এমন একটি খোল দিয়েছিল যা তার ঢালের মত কাজ করত। প্রাচীন-কালে যখন তলোয়ার আর ঢাল নিয়ে যুদ্ধ হত তখন যোদ্ধা নিজের হাতে ঢাল রাখত। খোলটি কচ্ছপের পক্ষে সেই ঢাল হয়েছিল। কচ্ছপ নিজের খোলের মধ্যে চলে গেলে সব রকমে সুরক্ষিত হতো। আমাদের কি এমন কোন খোল আছে যেখানে পৌঁছলে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পাব? আমাদের মনে বাসনা ফুলে ফেঁপে উঠছে। আমাদের ওপরে বাসনা, ক্রোধ তথা আবেগের আক্রমণ হচ্ছে। এমন কোন উপায় আছে কি যার দ্বারা এই সব আক্রমণ থেকে বাঁচা যায়? হাঁ, উপায় আছে। ভগবান বলেছেন—কচ্ছপ যেমন বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য নিজের খোলের ভেতরে চলে যায় তুমিও তেমনি অধ্যাত্মের ভেতরে চলে যাও। সব আক্রমণ থেকে বেঁচে যাবে। অধ্যাত্মের ভেতরে চলে যাও, চেতনার ভেতরে চলে যাও। ভেতরে চলে যাও, অন্তরে প্রবেশ কর, তা হলে সুরক্ষিত হবে। যত দিন মন বাইরে ঘুরে বেড়াবে, তত দিন পর্যন্ত বাসনা ও আবেগ ফুলে ফেঁপে উঠবে। যে সমস্ত পরিস্থিতি চিন্তা, ভয় এবং দুঃখ উৎপন্ন করে সে সবই মনকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেয়। তুমি ভেতরে চলে যাও, চেতনার জগতে চলে যাও, চেতনার নৈকট্য লাভ কর, সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ, সম্পূর্ণভাবে

সুবক্ষিত হবে। কোন বিপদ নেই, কোন ভয নেই। সে এক জ্বলন্ত শক্তি। এ শক্তি তুমিও অনুভব কবতে পাব।

এক বকম কথা মানতেই হয। আমাব এক বকম কথা মানাব প্রযোজন নেই, কিন্তু অনুভব কবা সম্ভব। অধ্যাত্ম-কথা শুধু মেনে নেওযাব জিনিস নয। আপনাবা যদি চান তবে আজই এই অবস্থাব নির্ণয কবতে পাবেন, আজ বাতেই শোবাব পব পবই এ সম্বন্ধে অনুভব কবতে পাবেন। আপনাব মনে কোন বিচাব আসতে পাবে, তাব বিকল্প আসতে পাবে, অনেক খাবাপ চিন্তা মনেব ভেতব থেকে ঠেলে উঠতে পাবে। আপনি তৎক্ষণাৎ নিজেব অন্তবে চলে যান, মনেব ভেতবে প্রবেশ করুন। আপনাব মনে হবে আপনি যেন অন্য এক জগতে এসে পৌছেছেন আব সমস্ত বিকাব, বিকল্প ও চিন্তা বাইবেব জগতে থেকে গিযেছে। আব তাবা আপনাকে আক্রমণ কবতে পাববে না। একেই বলে প্রেক্ষা ধ্যান। এব অর্থ—আপনি নিজেকে দেখতে আবম্ভ করুন। যে মুহূর্তে আপনি নিজেই নিজেকে দেখতে আবম্ভ কববেন, চেতনাব ক্ষেত্রে চলে যাবেন সেই মুহূর্তে আপনি বাসনা, ক্রোধ ইত্যাদিব আক্রমণ থেকে মুক্ত হবেন। আব কোন কিছুব আক্রমণ হতে পাববে না।

অধ্যাত্মেব সাহায্যে আমবা এই সব আক্রমণ থেকে বাঁচতে পাবি। আমবা অধ্যাত্মেব চর্চা কবি তাব কাবণ অধ্যাত্মই আমাদেব এই সব বাইবেব আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পাবে, আব এই সব প্রভাবেব বশবর্তী হওযা থেকে বক্ষা কবতে পাবে। আজ আমবা অধ্যাত্ম থেকে খানিকটা দূবে চলে গিযেছি। আজ আমাদেব পথ দেখানোব কেউ নেই। অধ্যাত্মেব বহস্যও আমাদেব অজানা হযে গিযেছে। এব কাবণ কি? যা ঘটেছে তা এই—

একটি লোক পথ চলছে। পাযেব আঘাতে জীব মবে যাচ্ছে। আমবা বলি—জীবহিংসা হল। ঐ লোক অনেক প্রাণী মেবে ফেলল, জীবহিংসা কবল। এই আমাদেব বিচাব, ব্যবহাবেব বিচাব, বাইবেব

দুনিয়ার বিচার। ভগবান মহাবীর এবং কোন কোন মনস্বী আচার্য এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা এই কথা বলেছেন—অধ্যবসায় থেকে বন্ধন হয়। এক অধ্যবসায়, অপর ঘটনা। দুটো দুই জিনিস। অধ্যবসায় অন্তর্জগতের বিচার, ঘটনা বাহ্য জগতে ঘটে। আচার্য ভিক্ষু বলেছেন, যে হত্যা করে সে হিংসক। যে মারে অর্থাৎ যার মারার জন্য অধ্যবসায় আছে সে হিংসক। জীব বেঁচে থাকল কি মারা গেল তার সঙ্গে হিংসার কোন সম্বন্ধ নেই। জীবের বেঁচে থাকা কোন দয়ার ব্যাপার নয়, জীবের মৃত্যুও কোন হিংসার ব্যাপার নয়। জীব মরুক বা না মরুক, সেটা গৌণ ব্যাপার, অন্য ব্যাপার। হত্যা করার যে সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং তার পরিণাম, সেই হল মুখ্য কথা। হিংসা হল হত্যার জন্য অধ্যবসায়, কোন জীবের মৃত্যুর ঘটনা নয়। অধ্যবসায়ের জগতে পৌঁছে যখন আমরা রহস্যসমূহ দেখি তখন আমাদের সমস্ত সাধনপদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। তারপর আমরা আর ঘটনাকে মুখ্য বস্তু বলে মেনে কাজ করি না, অন্তরকে প্রধান মনে করে আচরণ করতে থাকি।

সামাজিক জীবন একটা দিক। আন্তরিক জীবনই সামাজিক জীবন সম্বন্ধে নির্ণয়ের আধার। এই কারণে বলা হয়, দিন বা রাত্রি যে কালই হোক, কেউ দেখুক বা না দেখুক, তাতে কোন পার্থক্য হয় না। যে স্থিতিতে দেখা বা না দেখার মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকে না, সে হল আন্তরিক ক্ষেত্রে স্থিতি। ব্যবহারের জগতে প্রভেদ আসে। যে ব্যবহারের নিয়ম অনুযায়ী চলে সে আচরণ করার আগে দেখবে আলো না অন্ধকার আছে, কেউ দেখছে কিংবা দেখছে না। এই বিচারের আধারে তার আচরণ ঘটবে, সে পদক্ষেপ করবে।

স্বপ্ন কেন আসে? আমরা কেন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি? মনস্তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা হল, আমাদের মনের দমিত বাসনাদি যখন আমাদের জাগ্রত অবস্থায় প্রকট হবার সুযোগ পায় না তখন তারা স্বপ্নের ভেতরে প্রকটিত হয়। সেই জন্যই ঘুমের ভেতরে স্বপ্ন আসে। একটা সীমা পর্যন্ত এ কথা ঠিক বটে। কখনও কখনও এমন হয় যে,

শোবাব সমব যে কথা মনে থেকে যায স্বপ্নে সেই কথা আমাদেব সামনে দৃশ্যমান হয। অধ্যাত্ম-বহস্তেব এটি একটি বড সত্য। ক্রোধ আসে। সে পর্যন্ত পৌঁছে আপনাব স্থিতি বিনষ্ট হয। তাব কোন ওষুধ নেই। তাকে নিযন্ত্রণ কবা যায না। ব্যবহাবেব দিক দিযে এ কথা তো ঠিকই বটে। আমি আপনাদেব সর্বদা ব্যবহাব থেকে মুক্ত থাকতে বলছি না। আমাদেব নিযন্ত্রণ কবাব শক্তি আছে, আমাদেব বিবেক আছে। আমবা বাহ্য জগতে জীবন ধাবণ কবি, এই জন্য আমাদেব ব্যবহাবকেও মেনে চলতে হয। কিছু নিযন্ত্রণ হয, দমনও হয, ওষুধও দেওযা হয। কিন্তু অধ্যাত্মেব চর্চাব সময এসব কথা বলতে কোন সঙ্কোচ হওযা উচিত নয। কাবণ এ শুধু ব্যবহাবেব কথা, অধ্যাত্মেব কোন কথা নয। অধ্যাত্মেব কথাব মূল পর্যন্ত যেন পৌঁছই।

সমস্ত সমস্যাব মূল—বাগ এবং দ্বেষ। প্রচলিত ভাষায বলা যায—হিংসা। পবিগ্রহই বল, অ-ব্রহ্মচর্যই বল, চুবিই বল আব মিথ্যাভাষণই বল—এসব কিছুকেই আমাদেব আচার্যগণ হিংসা বলে স্বীকাব কবেছেন। উলটো দিক থেকে দেখলে বলা যায অহিংসা ছাডা কোন মহাব্রত হয না। দুটি কথাব মধ্যে দুনিযাব সব কিছু এসে যায—হিংসা এবং অহিংসা। অহিংসা কি ? বাগ-দ্বেষ প্রভৃতিকে উৎপন্ন হতে না দেওযাব নাম অহিংসা। আপনি অহিংসাব কথা, অহিংসাব ঘটনা হিংসাব সঙ্গে এক কবে দেখবেন না। ঘটনাব শেষ কবে ফেলাব চেষ্টাও কববেন না। যে ক্ষণে বাগ উৎপন্ন হয সেই ক্ষণকে লক্ষ্য করুন। যে ক্ষণে বাগ উৎপন্ন হয প্রকৃতপক্ষে সে-ই হল জাগ্রত থাকাব সময।

প্রেক্ষা ধ্যানেব সূত্র হল—অপ্রমাদ ও জাগৰূকতা। কি বিষযে জাগৰূকতা ? অতীতেব সম্বন্ধে জাগৰূক থাকাব কোন প্রযোজন নেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও জাগৰূক থাকাব কোন প্রযোজন নেই। বর্তমান ক্ষণ সম্বন্ধে জাগ্রত থাক। বর্তমান ক্ষণ সম্বন্ধে জাগৰূক থাকাব তাৎপর্য ঃ যে কোন বীজ পাওযা গেলে তা বর্তমান ক্ষণেই বপন কবতে হবে। পবে ফল আসবে, পবিণাম আসবে, মহীরুহ জেগে উঠবে। সে বৃক্ষকে

আপনি উপড়াতে পারবেন না। আপনি ফলাগম রোধ করতে পারবেন না। আপনি শুধু লক্ষ্য করুন, বীজ বপন করা হয়েছে কিংবা হয় নি। বর্তমান কালের যে ক্ষণে বীজ উপ্ত হয়েছে সেই ক্ষণ সম্বন্ধে আমরা জাগরূক থাকব। সেটি রাগের তথা দ্বেষের ক্ষণ। ঐ রাগের ও দ্বেষের বীজ যে মুহূর্তে বপন করা হয় সেই মুহূর্তে আমি যদি জাগরুক না থাকি তবে পরিণাম-বিষয়ে সজাগ থাকার কোন অর্থ হবে না। অধ্যাত্মের সূত্র থেকে তার যে এক বড় রহস্য প্রতিপন্ন করা হয়েছে সেটা হল—রাগের তথা দ্বেষের ক্ষণ হল হিংসার ক্ষণ। অ-রাগ ও অ-দ্বেষের ক্ষণ অহিংসার ক্ষণ।

বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটে থাকে। মনের মধ্যে কোন বিকল্প চিন্তা উঠল, এক বিচার মনে এল। তাকে উপেক্ষা করব। তার পরিণাম এই হবে যে, ঐ বীজ যখন উপ্ত হবে এবং ঐ বীজ যখন বড় হবে, অর্থাৎ বৃক্ষে পরিণত হবে তখন নিশ্চিতভাবে নিজের পরিণাম নিয়ে আসবে। আমরা যেন দুনিয়ার ঘটনাবলী দেখি। পঞ্চাশ-ষাট বছর পর্যন্ত যে যশস্বী থেকেছে, যার জীবনের পূর্ব অংশ তেজস্বিতা ও যশের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে, সে যখন জীবনের উত্তরাংশে পৌঁছয় তখন তার পতন হয়, সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এ রকম কেমন করে সম্ভব হয় ভেবে আমরা আশ্চর্য হই। যে লোক পঞ্চাশ-ষাট বৎসর যশস্বী এবং তেজস্বী জীবন যাপন করেছে তার জীবনের পরের দিক কেমন করে পতনের দিকে যেতে পারে? আমরা সাধারণত এর ব্যাখ্যা করতে পারি না। কিন্তু ঐ রকম ঘটনার পেছনে কোন কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু আমরা যদি মনের গভীরতায় এ বিষয়ে সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করি তবে এই তথ্য স্পষ্ট হবে, যে বীজ বপন করা হয়েছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত করা হয় নি, এখন তা বৃক্ষে পরিণত হয়েছে, তার ফলে শেষের ঘটনা ঘটেছে।

মনে রাগ এবং দ্বেষের যে সংস্কার উৎপন্ন হয় তাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলা, পরিবর্তন করা তার প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রায়শ্চিত্ত করলে আর ঐ সব সংস্কার উপদ্রব করবে না। বীজকে নষ্ট করে দিলে তা

থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন হবে না। প্রাযশ্চিত্ত না কবলে বীজ অঙ্কুবিত হওযাব এবং বেড়ে উঠাব সুযোগ পাবে। কালে কালে তা বৃক্ষে পবিণত হবে, তাব শিকড ছড়িযে পডবে। তখন তাকে আব বশ কবাব উপায থাকে না। তাব যে কষ্টদাযক ফল তা আমাদেব ভোগ কবতে হয। কিন্তু আমবা ঘটনাকে মুখ্য মেনে ব্যবহাবেব চালনা কবি না, পবন্তু অন্তবকে মুখ্য মেনে ব্যবহাবেব চালনা কবি।

অধ্যাত্মেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহস্য এই যে, বাগেব এবং দ্বেষেব বীজ যে ক্ষণে উপ্ত হয সেই ক্ষণ সম্বন্ধে আমাদেব জাগরূক থাকতে হয।

আমবা অহিংস। আমবা অত্যন্ত স্থূলভাবে মেনে নিযেছি যে, কাউকে না মাবাব নাম অহিংসা। কিন্তু বাগ ও দ্বেষেব বীজ যদি মনেব ভেতবে উপ্ত হয তবে কি কবে অহিংসা হবে? ব্যবহাবেব জগতেব কথা তো ঠিকই। কোন লোক যদি কাউকে হত্যা না কবে তবে সে আইনেব কবলে পডবে না। আইন তাকে অভিযুক্ত কববে না, তাকে বিবক্ত কববে না, কেননা সে এমন কোন কাজ কবছে না যাতে সে আইনেব আওতাব মধ্যে আসে। আইনেব সূত্র—কাজ। এমন কাজ যা আইনেব গণ্ডিব মধ্যে আসে। অধ্যাত্মেব সূত্র—অধ্যবসায। কাজ হোক ছাই না হোক অধ্যবসায মাত্র দাযিত্ব হযে যায। এই বকম অধ্যবসায, সঙ্কল্প, বিচাব তথা পবিণাম হিংসাপ্রধান। ঐ বকম ভাব মনে এলে আপনি যদি কিছু না কবেন তবে আপনি হিংসাব বন্ধনে আবদ্ধ হন। আপনি নিজেকে এভাবে প্রস্তুত কবতে পাবেন—আমি তো কোন কিছু কবি নি, তবে আমি ঐ ঘটনাব জন্য দাযী হব কেন? অধ্যাত্ম এ কথা স্বীকাব কবে না আপনি ক্রিয়া-রূপে কিছু কবেন নি। সে এই নির্ণযে পৌছতে চায যে, আপনি ঐ রূপ চিন্তা কবেছেন কিংবা কবেন নি। ঐ বকম চিন্তারূপ ক্রিয়া কবেছেন কিংবা কবেন নি। চিন্তাব আধাবে, পবিণাম এবং অধ্যবসাযেব আধাবে অধ্যাত্মেব সমস্ত বিচাব হয, আইনেব সমস্ত বিচাব হয কার্যেব আধাবে। যদি আমবা এই কথা ঠিকমত বুঝতে পাবি তবে জাগরূকতাব ক্ষেত্র মুক্ত হযে যায,

জাগরূকতার সীমা বেড়ে যায়। আবার আমরা মূল সম্বন্ধে যতটা জাগরূক হই পরিণাম সম্বন্ধে ততটা জাগরূক হই না। যখন আমাদের মন প্রমাদ দ্বারা কিছুটা আচ্ছন্ন হয় তখন আমাদের জাগরূকতা পরিস্থিতি তথা পরিণামের ওপরে নিবদ্ধ হয়। আমরা ভাবতে থাকি—ও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, ও আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করেছে, ও আমাকে অপমান করেছে। আমাদের সমস্ত চিন্তা বাহ্য জগতের দিকে যায়। আমরা চিন্তা করে দেখি না এতে রাগ ও দ্বেষের মুহূর্ত কি ভাবে উজ্জীবিত হয়। অর্থাৎ আমরা অধ্যাত্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে বাইরের বিচারের দিকে চলে যাই।

ভগবান মহাবীর এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিয়েছেন—সমস্ত দায়িত্ব আত্মার। তিনি কখনও বলেন নি যে আত্মা ছাড়া মানুষের কোন শত্রু বা মিত্র আছে। তিনি বলেছেন, আত্মাই মানুষের মিত্র। কিন্তু মিত্রের খোঁজ কেউ করে না। তিনি কখনও বলেন নি, অন্য কেউ তোমাদের বন্ধনদশায় নিয়ে যায়। ঐ বন্ধন এবং বন্ধনমুক্তির দায়িত্ব, ঐ পুণ্য এবং পাপের দায়িত্ব, ঐ সুখ ও দুঃখের দায়িত্ব—এ সমস্ত দায়িত্ব আত্মার। সব কিছু কর্মের কর্তা আত্মা। সব কিছু দায়িত্ব আমাদের ওপরে ন্যস্ত, অধ্যাত্মের এই গভীর তত্ত্বে কি আমরা পৌছনোর চেষ্টা করি? আমরা হামেশাই প্রত্যেক ব্যাপারের দায়িত্ব অন্যের ওপরে আরোপ করি এবং যখন অন্যের ওপরে দায়িত্ব আরোপ করি না তখন আমাদের মন হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আমরা এখানে সেখানে খোঁজ করি অমুক এ রকম করেছে, অমুক ঐ রকম করেছে। ঐ রকম করে আমরা নিজেদের হালকা বোধ করি, আর ভাবি এ রকম কাজই চলছে। কিন্তু অধ্যাত্মের রহস্য এ থেকে ভিন্ন। অধ্যাত্মের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব : কেউ কারও জন্য দায়ী নয়। আপনাদের আত্মার, আপনাদের অধ্যবসায়ের সমস্ত কিছু ঘটনার জন্য চূড়ান্ত দায়িত্ব।

আমি আপনাদের কাছে অধ্যাত্মের রহস্য বিষয়ে দু-তিন রকম আলোচনা উপস্থিত করেছি। ঐ আলোচনার জন্য অনেক বিস্তার

প্রযোজন। কিন্তু আমি তা সংক্ষেপে বিবৃত কবেছি। যদি এই দু-তিন বহস্যের উদঘাটন আমাদেব মনে হওয়া সম্ভবপব হয়, আমাদেব জীবনে হওযা সম্ভব হয, তবে আব কোন বহস্যেব সন্ধানেব প্রযোজন নেই। আজ আমি যে সব আলোচনা কবেছি সেই সব বহস্যেব সন্ধান সকলে কবে। আমাদেব তীর্থঙ্কবগণ, আমাদের আচার্যগণ ঐ সব তত্ত্বেব খোঁজ কবেছেন। তাঁদেব বাণীব সাবাংশ আমি আপনাদেব কাছে বিবৃত কবেছি।

আপনাবা একটু একটু স্মবণ বাখবেন। এই সব বহস্যেব ওপবে আমাদেব ধ্যান কেন্দ্রিত হোক, আব নতুন নতুন বহস্যেব সন্ধানেব জন্য ব্যাকুলতা, ভাবনা এবং শ্রদ্ধা আপনাদেব মনে জেগে উঠুক। আমাব মনে হয আমাদেব পুরুষকাব যদি এই দিকে এগিযে যেতে থাকে, তবে এই সংসাবে ক্লেশভোগকাবী লোক বহু শাবীবিক ব্যাধি এবং মানসিক সংকট থেকে বাঁচতে পাবে এবং কচ্ছপেব রীতি অনুসবণ কবে এ বকম খোল তৈবি কবতে পাবে যে, সমস্ত আক্রমণ থেকে বেঁচে সে নিজেকে সুবক্ষিত মনে কবতে পাবে।

১৪

অধ্যাত্ম ও ব্যবহার

কোন কাজে প্রবৃত্ত হওযাব পূর্বে তাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা কবা আবশ্যক। বিনা প্রযোজনে মুর্খ ব্যক্তিও কোন কাজে প্রবৃত্ত হয না। এ জন্য প্রযোজন কি, তা স্পষ্ট কবে প্রকাশ কবতে হয। প্রাচীন কালে গ্রন্থবচনাব প্রাবম্ভে মঙ্গলাচবণ কবা হত এবং উদ্দেশ্য ও সম্বন্ধ কি তা বলা হতো। এখনও সেবকম কবা আবশ্যক। আমবা যা কবতে যাচ্ছি, তাব উদ্দেশ্য পবিস্ফুট কবতে হবে। যদি আত্ম-সাধনা, ধ্যান বা সমাধিব জন্য প্রচেষ্টা কবতে চাই তবে সেগুলিব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদেব অবহিত হতে হবে। কেন আমবা এই বকম চেষ্টা কবব? এই প্রকাব প্রচেষ্টাব দ্বাবা আমবা কি হতে চাই?

দু বকম স্থিতি আছে। এক স্থিতি হল 'হযেছে', আব অপবটি হল 'হতে যাচ্ছে'। 'কি হযেছে' তা প্রকৃতিবাদী দর্শন, বর্ণন ও নিরূপণ কবে। কিন্তু আচাব শাস্ত্র বা আচাব বিজ্ঞানেব প্রতিপাদ্য হল 'কি হতে চাই?' যেখানে মূলেব প্রশ্ন ওঠে, সেখানে হওযাব ব্যাপাবে জিজ্ঞাসা আসে 'কি হতে চাই?' প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে কি হওযা উচিত? সমাজেব কি হওযা উচিত? যেখানে হওযাব কথা আসে, সেখানে মূল্য-বোধেব বিকাশ হয, আচাব শাস্ত্রেব বিকাশ হয। হওযাব কথাব সঙ্গে

'আমাকে কি হতে হবে'—এই প্রশ্ন স্বভাবতই জড়িত থাকে। 'কেন হতে চাই'—এই বিষয়েও ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়।

জৈন আগমে দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়—'সংজ্ঞোপযুক্ত' এবং 'নো-সংজ্ঞোপযুক্ত'। চেতনা দুই প্রকারের হয়—সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা, আর নো-সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা। চেতনাতে যখন সংজ্ঞা থাকে তখন তাকে সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা বলে, আর চেতনা যখন সংজ্ঞাকে অতিক্রম করে তখন তা হয় নো-সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা। বীতরাগ নো-সংজ্ঞোপযুক্ত, তার ক্ষেত্রে বা তার চেতনাতে কোন সংজ্ঞা থাকে না। বীতরাগ সংজ্ঞাতীত চেতনার অর্থ হল—বিশুদ্ধ চেতনা, কেবল চেতনা। যে চেতনার সঙ্গে সংজ্ঞা মিশ্রিত থাকে, যে চেতনা সংজ্ঞার দ্বারা প্রভাবিত হয়, যে চেতনা সংবেদনাত্মক হয়—তাকে সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা বলা যায়। সংজ্ঞা দশ প্রকার, যথা—

১। আহার সংজ্ঞা
২। ভয় সংজ্ঞা
৩। মৈথুন সংজ্ঞা
৪। পরিগ্রহ সংজ্ঞা
৫। ক্রোধ সংজ্ঞা
৬। মান সংজ্ঞা
৭। মায়া সংজ্ঞা
৮। লোভ সংজ্ঞা
৯। লোক সংজ্ঞা
১০। ওঘ সংজ্ঞা

আমাদের সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য হল চেতনা থেকে এইসব সংজ্ঞাকে বহিষ্কৃত করা, অর্থাৎ বীতরাগ হয়ে যাওয়া। এই আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনার উদ্দেশ্য। চেতনার সাথে যে সংবেদন যুক্ত আছে, যে সংজ্ঞা জড়িত আছে, তাদের নির্মূল করা—এই আমাদের স্পষ্ট লক্ষ্য। এই কাজের দ্বারা কোন চমকপ্রদ শক্তি অর্জন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য কেবল নিজের চেতনাকে সংশোধন ও পরিমার্জন করা—পরিষ্কার করা। যখন ব্যক্তির চরিত্র পরিমার্জিত ও পরিষ্কৃত হয়, তখন তার বিকাশ আরম্ভ হয়ে যায়। তবে কি আমরা আহার করব না? আহার-সংজ্ঞাকে সমাপ্ত করার অর্থ কি এই? নিশ্চয়ই নয়। শরীর থাকতে এটা সম্ভবই নয় যে আমরা আহার করব না। আহার না করলে

সাধনাব সামর্থ্যও থাকবে না। সাধনাব জন্য শবীব যদি প্রযোজনীয হয, তবে শবীবেব জন্য আহাবও প্রযোজনীয। আহাব ত্যাগ কবা সম্ভব নয, কিন্তু আহাবেব প্রতি আসক্তি বা বাসনা ত্যাগ কবা সম্ভব।

এই সব সংজ্ঞাব মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে নির্মল জলে খানিক কাদা মিশে যায। জল স্বভাবতই নির্মল, কিন্তু তাতে ধুলো পডলে, আবর্জনা জমলে, তা মযলা হযে যায। চেতনা স্বভাবতই শুদ্ধ, কিন্তু তাতে বিভিন্ন সংজ্ঞা এসে যুক্ত হয, ফলে তা বিকৃত হযে যায।

মযলা জল পবিষ্কাব কবা যায। পবিষ্কাব কবাব অনেক পদ্ধতি প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালে ঐ বকম অনেক পদ্ধতি ছিল। ময়লা জল নির্মল হতে পাবে। জল স্বভাবত স্বচ্ছ ও নির্মল। তাব নির্মলতা একেবাবে নষ্ট কবা যায না। যে আবর্জনা জলে মিশেছে তা দূব কবা যায। আবর্জনা দূব কবে দিলেই জল আগেব মত নির্মল হযে যায।

আমাদের চেতনা নির্মল। তাব নির্মলতাব সমাপ্তি বা বিনাশ নেই। তবে চেতনাব এই অবস্থান্তব ঘটতে পাবে যে, যখন তাতে সংজ্ঞাব আবর্জনা এসে জোটে, সংবেদনেব মালিন্য এসে লাগে, তখন তা মলিন ও অপবিচ্ছন্ন হযে যায। তখন চেতনা আবৃত হযে যায, তাব স্বচ্ছতা আব থাকে না। যেমন মযলায আবৃত হলে দর্পণ অন্ধ হযে যায। তখন তাব প্রতিবিম্ব গ্রহণ কবাব ক্ষমতা কমে যায বা একেবাবে লোপ পায। কিন্তু ঐ দর্পণকে পবিষ্কাব কবলেই তাব ক্ষমতা আবাব প্রকট হয, তা প্রতিবিম্ব গ্রহণ কবতে সক্ষম হয।

সংজ্ঞাব সংস্পর্শে চেতনা ধোঁযাটে ও অস্পষ্ট হযে যায, মলিন হযে যায। চেতনাকে নির্মল কবা, তাকে তাব প্রকৃত অবস্থায এনে কেবল চেতনারূপে প্রতিষ্ঠা কবা—এই হল আমাদেব সাধনাব উদ্দেশ্য।

সাধনাব বহস্য হল কেবল জানা। তা এখনও লাভ কবা সম্ভব। কেবলজ্ঞান অর্থাৎ কোবা জ্ঞান শুধু জ্ঞানই, তাব মধ্যে সংবেদনেব সংস্পর্শ নেই। আপনি ইচ্ছা কবলেই এব অভ্যাস কবতে পাবেন। আপনি কেবলজ্ঞানেব অবস্থায এসে কেবলজ্ঞানী হযে যেতে পাবেন।

কেবলজ্ঞানকে সাধনার অন্তিম স্তর, সাধনার চরম লক্ষ্য বলা হয়; আবার কেবলজ্ঞান সাধনার প্রথম চরণও বটে। যতক্ষণ কেবল জ্ঞানের অভ্যাস না হবে ততক্ষণ সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার অধিকার পাওয়া যাবে না। সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা কেবলজ্ঞান অভ্যাস করতে ব্রতী হই। যা আদিতে, অন্তেও তাই। আদিতে যে কেবলজ্ঞান সাধন, অন্তে সেই কেবলজ্ঞান নিজেই সাধ্য।

উপাদান উপাদানই থাকে। উপাদানের মধ্যে প্রথমে যা হয়, অন্তেও তাই থাকে। কোন পার্থক্য হয় না। আমাদের চেতনা যদি কেবল চেতনা না হয় তবে আমরা কখনও কেবলজ্ঞান প্রাপ্ত হব না। কেবলজ্ঞান তখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় যখন আমরা প্রথম ক্ষণেই তাকে প্রাপ্ত করে নিতে পারি। প্রথম ক্ষণের কেবলজ্ঞানই অন্তিম ক্ষণের কেবলজ্ঞান রূপে দেখা দেয়। সাধনার প্রথম ক্ষণেই যদি কেবল-জ্ঞানের সন্ধান না মেলে তবে সাধনার কোন ক্ষণেই—তা লক্ষ বৎসর-ব্যাপী সাধনা হোক না কেন—কেবলজ্ঞান লাভ করা যাবে না। সাধনার প্রথম ক্ষণেই তাকে লাভ করতে হবে, তবেই অন্তিম ক্ষণে তাকে লাভ করতে পারব।

কুম্ভকার একটি ঘড়া বানাল। ঐ ঘড়া যদি প্রথম ক্ষণেই ফেটে না যায় তবে আর কখনও ফাটবে না। একটি শিশু জন্মাল। সে যদি প্রথম ক্ষণেই মরে না যায় তবে আর কখনও সে মরবে না। সে অমর হয়ে গেল, কখনও সে মরবে না। যার প্রথম ক্ষণে বিনাশ ঘটে নি তার আর কখনও বিনাশ ঘটবে না। প্রথম ক্ষণেই যার সমাপ্তি ঘটে নি, কখনও তার সমাপ্তি ঘটানো যাবে না। প্রথম ক্ষণেই যদি কেবলজ্ঞান না হয়, তবে আর কখনও কেবলজ্ঞান হবে না। বাস্তবিক পক্ষে কেবলজ্ঞান হল কোবা জ্ঞান। এই জ্ঞানের সঙ্গে সংবেদন মিশ্রিত নেই। যখন আমরা সাধনার এরকম স্তর প্রাপ্ত হব তখন আমরা কেবলজ্ঞানের স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছতে পারব।

প্রাণকে সংবেদন-শূন্য করা, সংজ্ঞার প্রভাব থেকে মুক্ত করা, যোগ-সংযোগ থেকে মুক্ত করা—এই হল আমাদের সাধনার উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হতে পারে, এমন করা কি করে সম্ভব হতে পারে? এই বিষয়ে আমি কিছু বিচার করতে চাই।

যোগ-সংযোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লোকোত্তর চিত্ত গঠন করতে হয়। আমাদের চিত্ত দুই প্রকারের—লৌকিক চিত্ত, আর লোকোত্তর চিত্ত। যে চিত্ত সংজ্ঞার ফাঁদে পড়েছে, সংবেদনার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে, তা-ই হল লৌকিক চিত্ত। যে চিত্ত পূর্বোক্ত দশটি সংজ্ঞাকেই অতিক্রম করেছে—তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে—তাই হল লোকোত্তর চিত্ত। যিনি লোকোত্তর চিত্ত লাভ করেছেন, তিনি নো-সংজ্ঞোপযুক্ত হয়ে গেছেন। একই শক্তি দুই ক্ষেত্রেই কাজ করে। যে ঊর্জা, যে প্রাণ ও যে শক্তি লৌকিক চিত্তে কাজ করে, সেই ঊর্জা, সেই প্রাণ ও সেই শক্তি লোকোত্তর চিত্তেও কাজ করে।

শরীরের দুটি মুখ্য কেন্দ্র আছে। তাদের একটি কাম-কেন্দ্র, অপরটি জ্ঞান-কেন্দ্র। নাভির নিচে যে স্থান তা কাম-কেন্দ্র বা বাসনা-কেন্দ্র। মস্তিষ্ক হল জ্ঞান-কেন্দ্র। আমাদের শরীরে ঊর্জার একই প্রবাহ আছে। যে স্থানে মন যাবে ঊর্জাও সেই স্থানে যাবে, প্রাণও সেই স্থানে যাবে। যদি আমাদের মন, আমাদের চিন্তন কাম-কেন্দ্রের দিকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়, তবে ঐ কেন্দ্রের বল ও শক্তি বাড়বে, ঐ কেন্দ্র সমৃদ্ধ হতে থাকবে। প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়ম যে, যা কিছু সিঞ্চন লাভ করবে তা-ই পুষ্ট হবে। যা সিঞ্চন পায়না তা শুকিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। যা সিঞ্চন পায় তা বাড়ে ও সমৃদ্ধ হয়। আমাদের ঊর্জার সিঞ্চন যে কেন্দ্র লাভ করবে সে কেন্দ্র অবশ্যই পুষ্ট হবে, বাড়বে এবং সমৃদ্ধ হবে, তা সে কাম-কেন্দ্রই হোক বা জ্ঞান-কেন্দ্রই হোক। যদি এই সিঞ্চন নিচের দিকে, কাম কেন্দ্রের দিকে, যায়, তবে আমাদের ঊর্জার প্রবাহ ঐ দিকেই ঘুরে যাবে। আমাদের সমস্ত প্রাণশক্তি ঐ দিকেই প্রবাহিত হতে আরম্ভ করবে। ফলে কাম-কেন্দ্র বলবান হতে

থাকবে, আব জ্ঞান-কেন্দ্র দুর্বল হযে পডবে। এই হল লৌকিক চিত্তেব প্রক্রিযা। লৌকিক চিত্তেব কাজই হল, সর্বদা কামনাকে পুষ্ট কবা, সেচন দিযে কাম-কেন্দ্রকে বলবান কবা। আমবা ভালরূপেই এটা জানি যে, আমাদেব জীবনে কামনাব আকর্ষণ যতটা প্রবল আব কোন আকর্ষণই ততটা প্রবল নয। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ঐ আকর্ষণ নিবন্তব স্থাযী। ক্রোধেব আবেগ কখনও কখনও হয, লোভেব চেতনাও কখনও কখনও প্রকাশ পায, কিন্তু কামেব চেতনা নিবন্তর থাকে। যখন আমাদেব চেতনা কাম-কেন্দ্রেব দিকে অধিক পবিমাণে প্রবাহিত থাকে, তখন সহজেই জ্ঞান-কেন্দ্রেব শক্তি ক্ষীণ হতে আবম্ভ কবে। সাধনাব দ্বাবা এই অবস্থাব পবিবর্তন কবতে হবে। যে সাধক নিজেব জ্ঞানেব বিকাশ চায, নিজেব শক্তিব অভিব্যক্তি চায, নির্মলতা চায, তাকে অবশ্যই চেতনাব প্রবাহকে ওলটাতে হবে, ঘোবাতে হবে। অর্থাৎ তাকে ওপবেব দিকে মনকে তুলে আনতে হবে।

ওপবে দেখ—ওপবেব দিকে তাকাও। এব এই অর্থ কবা যেতে পাবে যে, মোক্ষেব দিকে তাকাও। কিন্তু মোক্ষ অনেক দূবে। অত দূবে আমবা কেন যাব? কাছে যা আছে, তাই আমবা দেখব, কিন্তু মনেব গতি ফেবাব মস্তিষ্কেব দিকে। গতিকে এভাবে বদলে দেব। প্রাণধাবাব প্রবাহকে ঘুবিযে দেব, তাব গতিকে বদলে দেব। তাকে ওপবেব দিকে, জ্ঞান-কেন্দ্রেব দিকে, চালিত কবব। তখন জ্ঞান-কেন্দ্র প্রাণধাবা থেকে সিঞ্চন পাবে। সিঞ্চন পেলেই জ্ঞানকেন্দ্র পুষ্ট হবে, আমাদেব সাধনা সহজেই সফলতাব দিকে অগ্রসব হবে। জ্ঞানকেন্দ্র তখনই পুষ্ট হয যখন আমাদেব উর্জা জ্ঞানকেন্দ্রে প্রবাহিত হয। উর্জাব এই যে ঊর্ধ্বগতি, তাকেই কুণ্ডলিনীব জাগবণ বলা যায, বিশিষ্ট জ্ঞানেব উপলব্ধি বলা যায বা ঐ বকম অন্য কিছুও বলা যায। জ্ঞানেব সকল কেন্দ্র মস্তিষ্কে আছে। আবাব শক্তিব সমস্ত স্রোতও ঐ মস্তিষ্কে আছে।

শবীব শাস্ত্রেব দিক দিযে দেখলে দেখা যায যে, মস্তিষ্কই সমস্ত শবীব-তন্ত্রেব সঞ্চালন কবে। পাযে একটা ছোট কাঁটা ফুটল, ফলে

পাযে ব্যথা হল, কাঁটা যে ফুটেছে তাব অনুভব হল। আব অমনিই হাত এগিয়ে এল পাযেব সাহায্যে। কিন্তু কেন এমন হল? কাঁটা ফুটলেই আমাদেব নাড়ি-মণ্ডল বা নাড়ি-সংস্থান সক্রিয হযে ওঠে, আব মস্তিষ্ক পর্যন্ত এই সংবাদ পৌঁছে দেয যে, পাযে কাঁটা ফুটেছে। মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ আদেশ দেয, কাঁটা বেব কবে দাও। এই আদেশ হাত পর্যন্ত আসে, আব তখন হাতেব আঙ্গুল এগিযে এসে পাযেব কাঁটা বেব কবে দেয। এই সমস্ত সঞ্চালনই মস্তিষ্ক থেকে হচ্ছে। ওটাই সঞ্চালনেব মুখ্য কেন্দ্র। মস্তিষ্কেব ওপব ধ্যান যতই কেন্দ্রিত হবে, মস্তিষ্কেব বিকাশ ততই ঘটতে থাকবে। আমবা তার খুব কম অংশের বিকাশই কবতে পেবেছি। এব কাবণও স্পষ্ট। আমাদেব যতটা শক্তি আছে, আমাদেব যতটা ক্ষযোপশম ক্ষমতা আছে, তা আমবা কাজে লাগাতে পাবি না। আমাদের ক্ষয়োপশম ক্ষমতাব সামান্য অংশই কাজে লাগে, বাকিটা পডেই থাকে।

বিজ্ঞানেব ভাষায বলা যায যে, মস্তিষ্কেব যত ক্ষমতা আছে তাব ব্যবহাব আমবা কবতে পাবি না। ক্ষমতাব শতকবা সামান্য অংশই আমবা ব্যবহাব কবতে সমর্থ হই। তাব কাবণ মস্তিষ্কেব যে প্রকোষ্ঠ-গুলি খুললে অতিবিক্ত চেতনা আমাদেব কাজে আসতে পাবে, সেই প্রকোষ্ঠগুলি খোলাব কোন প্রযাসই আমবা কবি না। আমাদেব এই অসামর্থ্যেব হেতু এই যে, আমাদেব চেতনাব সকল প্রবাহ নিচেব দিকেই চলেছে। সেজন্য সাধনাব এক মহৎ উদ্দেশ্য হল কাম-কেন্দ্রেব দিকে প্রবাহিত মনেব ধাবাকে, কাম-কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত মনেব উর্জাকে, মোড ঘুবিযে ওপবের দিকে নিযে যাওযা। এটি একটি শ্রেষ্ঠ সাধনা।

আমাদেব মনে নানা সংজ্ঞা উৎপন্ন হয। আহাবেব সংজ্ঞা উৎপন্ন হয, মৈথুনেব সংজ্ঞা উৎপন্ন হয। এদেব উৎপত্তিব কি কাবণ? শাস্ত্রে প্রত্যেক সংজ্ঞাব উৎপত্তিব চাব চাবটি কাবণ আছে বলা হযেছে। তাদেব মধ্যে একটি কাবণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই কাবণ হল—স্মৃতি। বাব বাব আহাবেব স্মৃতি, বাব বাব ভযেব স্মৃতি, বাব বাব মৈথুনেব স্মৃতি, বাব বাব

কামের স্মৃতি মনে উদয় হচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব সংজ্ঞা উত্তেজিত হয়ে উঠছে, উদ্বেল হয়ে যাচ্ছে। বার বার স্মরণ করা, বার বার চর্চা করা, বার বার আপনার প্রাণশক্তিকে সংজ্ঞার দিকে প্রবাহিত করে দেওয়া—এই হল সংজ্ঞার উদ্দীপনের পথ। সংজ্ঞা উদ্দীপ্ত হওয়ার কারণ ঘটেছে, আমরা চেতনাকে তার দিকে নিয়ে গিয়েছি, তাই তার উদ্বেল হয়ে ওঠার সুযোগ মিলেছে। যদি চেত না তার দিকে না যেত তবে তার উদ্বেল হওয়ার কারণ ঘটত না। এজন্য মহর্ষিগণ গভীর চিন্তা করে বলেছেন, সাধক যেন 'বিকথা' না করে। এ অতি গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ কথা। সাধক চর্চা করতে পারে, কিন্তু তার 'বিকথা' করা উচিত হবে না। কারণ তার মন যদি বিকথায় আসক্ত হয় তবে তারা সমস্ত প্রাণ-ধারাই ঐদিকে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করবে। তাহলে সাধনার ক্রম স্তব্ধ হয়ে যাবে। সে জন্য উর্জাকে কোন দিকে বইয়ে দিতে হবে, সে বিষয়ে আমাদের ধ্যানকে কেন্দ্রিত করতে হবে।

সাধনার দৃষ্টিতে জাগরণের সূত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাগরণের অর্থ হল—প্রবহমান উর্জার প্রতি জাগরূকতা। অর্থাৎ, উর্জার প্রবাহ কোন্ দিকে চলেছে? যদি প্রবাহ নিচের দিকে চলতে থাকে, তবে তার মোড় ঘুরিয়ে তাকে ওপরের দিকে নিয়ে যাওয়া।

সংজ্ঞা দশটি। তাদের মধ্যে আটটি সংজ্ঞার অর্থ স্পষ্ট। যথা—আহার সংজ্ঞা, ভয় সংজ্ঞা, মৈথুন সংজ্ঞা, পরিগ্রহ সংজ্ঞা, ক্রোধ সংজ্ঞা, মান সংজ্ঞা, মায়া সংজ্ঞা আর লাভ সংজ্ঞা। এগুলি সহজেই বোঝা যায়। বাকি দুইটি সংজ্ঞা লোক সংজ্ঞা আর ওধ সংজ্ঞা। এদের সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার।

'লোক' শব্দের অনেক অর্থ আছে। তাদের মধ্যে এক অর্থ, শরীর। সুতরাং লোক সংজ্ঞার অর্থ দাঁড়াল, দেহাসক্তি। কেবল মানুষের নয়, প্রত্যেক প্রাণীরই দেহাসক্তি থাকে। শরীরের প্রতি তার নিবিড় সম্বন্ধ থাকে। প্রত্যেক প্রাণীই শরীরকে বাঁচাতে প্রযত্ন করে। কিন্তু সাধকের কাছে শরীর বাঁচানোর প্রশ্নই মুখ্য নয়। শরীরকে ঠিকমত রক্ষা করা

আবশ্যক বটে। কিন্তু তা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাকে প্রথম স্থান দেওয়া যায় না, দ্বিতীয় স্থান হয়ত দেওয়া যায়।

লোক-সংজ্ঞার আর এক অর্থ, লৌকিক মান্যতার ধারণা দিয়ে মগজ ভরে দেওয়া। অনেক রকম মান্যতা মাথায় ঢুকিয়েছি। সে জন্য চেতনার বিকৃতি প্রবল হয়েছে। এখানে একটা ছোট কথা বলি। লোক-প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আমরা ধরেই নিয়েছি যে, স্বভাবকে বদলান যায় না। এই ধারণাই আমাদের দৃঢ় হয়েছে। ফলে, আমাদের চেতনায় এক ছিদ্র হয়েছে, আর ছিদ্রপথে বিষ প্রবেশ করে চেতনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এখন আমরা কিছু করতেই আর সক্ষম নই, কারণ আমাদের দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে যে, স্বভাব বদল করা সম্ভব নয়। সে জন্যই একটা গভীর অর্থপূর্ণ কথা মনে রাখতে হয়—কোন বিষয়ে ধারণা করার পূর্বে সেই বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে হয়। কারণ যে ধারণা একবার হয়ে যায়, তা আর ছাড়তে চায় না, আমরা ঐ ধারণার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যাই। চেতনার সমস্ত প্রবাহ তখন বিপরীতমুখী হয়ে যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিষয় হল—সংকল্পের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা। আমরা কি সংকল্প করার ব্যাপারে স্বাধীন? এই প্রশ্ন নিয়ে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে যথেষ্ট চিন্তন ও মনন করা হয়েছে।

পশ্চিমে তিন প্রকার মতবাদ চলিত আছে, যথা—

১। নিয়তিবাদ।

২। আত্মবাদ।

৩। আত্ম-নিয়তিবাদ।

প্রথম বাদ—নিয়তিবাদ। নিয়তিবাদী মনে করে যে মানুষ যন্ত্রবৎ। যে রকম পরিস্থিতি হয়, যে রকম বাতাবরণ হয়, মানুষকে তদনুসারেই কাজ করতে হয়। সে সর্বদাই যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়। মানুষের নিজের কোন স্বাধীন সংকল্প নেই। এই হল নিয়তিবাদী ধারা।

দ্বিতীয় হল আত্মবাদী ধারা। ঐ মতবাদ অনুসারে সংকল্প করার

বিষযে মানুষেব স্বাধীনতা আছে। মানুষ পবিস্থিতিব দাস নয, সে পবিস্থিতিব দ্বাবা প্রভাবিত হয না।

তৃতীয হল আত্ম-নিযতিবাদী ধাবা। আত্ম-নিযতিবাদীব মত এই যে, নিযতি সত্য হতে পাবে, কিন্তু আমাদেব পবিস্থিতিতে নিযতি কোন বাধাব সৃষ্টি কবতে পাবে না। আমবা পূর্ণভাবেই স্বাধীন, সর্বদাই স্বাধীন।

আমবা কি সংকল্প কবাব ব্যাপাবে পবাধীন? আমবা কি যন্ত্রেব তুল্য? আমবা কি পবিস্থিতিব দাস? অথবা, আমবা কি পূর্ণভাবে স্বাধীন? কোন পবিস্থিতিই কি আমাদেব ওপব প্রভাব বিস্তাব কবতে পাবে না?

আমবা যদি যন্ত্রবৎ হই, আব সমস্ত ব্যাপাবই যদি নিযতিব দ্বাবা সঞ্চালিত হয, তবে আমাদেব বুঝতে হবে যে, স্বভাব বদল কবা সম্ভব হবে না। যদি আমাদেব স্বভাব নিযত হয, তবে তাকে বদলানোব জন্য কোন সংকল্প বা পুরুষার্থেব প্রযোজন আমাদেব থাকে না। আমাদেব সকল প্রযত্নই ব্যর্থ হবে।

কিন্তু আমি এ কথা স্বীকাব কবি না। আমি মানি যে স্বভাবকে বদলানো যায। সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনাকে নো-সংজ্ঞোপযুক্ত কবে নেওযা যায। সকল সংজ্ঞাবই পবিসমাপ্তি ঘটানো যায। যখন এ সব কিছুই হতে পাবে, তখন 'স্বভাবকে বদলানো যায না'—এই কথাটি আপনা আপনি অর্থশূন্য হযে পড়ে। স্বভাব বদলায, স্বভাবকে বদলানো যায।

আমি এটা মানি যে আত্মাব কিছু অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব আছে। বাহ্য পবিস্থিতি বা বাতাববণ কিছু প্রভাব বিস্তাব কবতে পাবে বটে, কিন্তু আত্মাব অন্তর্নিহিত শক্তি এতই প্রবল যে, যখন তা জাগ্রত হয তখন বাহ্য প্রভাব শূন্য হযে যায, নির্মূল হযে যায—তাব অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকে না।

আমবা বাহ্যেব দ্বাবা তখনই প্রভাবিত হই যখন আমাদেব কষায সংজ্ঞা প্রবল হয। এক শ্রেণীব সংজ্ঞাকে কষায সংজ্ঞা বলে। এই

এই শ্রেণীতে চারটি সংজ্ঞা আছে—ক্রোধ সংজ্ঞা, মান সংজ্ঞা, মায়া সংজ্ঞা, এবং লোভ সংজ্ঞা। এই চার সংজ্ঞার সাধারণ নাম কষায় সংজ্ঞা। যখন এদের প্রাবল্য হয় তখন আমাদের ওপর বাহ্য পরিস্থিতির প্রভাব এসে পড়ে, আর যখন এরা প্রবল থাকে না তখন বাহ্য-পরিস্থিতির প্রভাব তীব্র হয় না। ঐ প্রভাব তখন ক্ষীণ হয়ে যায়। আগমে এই তথ্য এই ভাবে বোঝানো হয়েছে। এক দেওয়ালে দুটি মাটির গোলা ছুঁড়ে মারা হল। একটি গোলা ছিল ভিজে মাটির, আর একটি ছিল শুকনো মাটির। যেটি ভিজে ছিল সেটি দেওয়ালে আটকে গেল, আর যেটি শুকনো ছিল সেটি নিচে মাটিতে পড়ে গেল। ভিজে আটকে গেল, আর শুকনো নিচে ঝরে পড়ল। যদি দেওয়াল ভিজে হয় তবে অবশ্যই তাতে ধুলো লেগে যাবে। যদি তা শুকনো হয় তবে ধুলো নিচে ঝরে পড়বে, তাতে লেগে থাকবে না। কষায় চেতনা যেন ভিজে। ঐ চেতনা যখন প্রবল হয় তখন বাহ্য পরিস্থিতি প্রবলরূপে প্রভাব বিস্তার করে, আর যখন তা প্রবল থাকে না তখন বাহ্য বাতাবরণও প্রভাব দেখাতে পারে না। আকাশ সর্বদা আকাশই থাকে। তাকে কিছুই প্রভাবিত করতে পারে না। বৃষ্টি হোক, শিলাপাত হোক, আঁধি আসুক, তুফান চলুক, বিদ্যুৎ চমক দিক, আরও যা কিছু হোক—আকাশ যেমন ছিল তেমনই থাকে। আকাশ বৃষ্টিতে ভেজে না, শিলাতে খণ্ড-বিখণ্ড হয় না, আঁধারে ধোঁয়াটে হয় না, বিদ্যুতে জ্বলে ওঠে না। রৌদ্রের তেজ যতই হোক না কেন, আকাশ কখনও গরম হয় না। যত বরফই পড়ুন না কেন, আকাশ কখনও ঠাণ্ডা হয় না।

চেতনা যদি বিশুদ্ধ হয় তবে বাইরে যা কিছু ঘটুক না কেন, ব্যক্তির ওপর কোন প্রভাব পড়ে না। চেতনাতে সংজ্ঞার লোপ পড়েছে, তাই তাতে বাইরের ব্যাপারের ছাপ পড়ে—বাইরের ব্যাপার তাতে আটকে যায়। তখন উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

এই তথ্য আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, মান্যতার ওপর নির্ভর করে আমরা যেন নিজেদের ধারণাগুলি গড়ে না তুলি। এই লোক

সংজ্ঞাকেও আমাদেব ছাডতে হবে।

সংজ্ঞাকে যদি একটিমাত্র শব্দেব দ্বাবা বুঝতে চাই, তবে সেই শব্দ হবে—মূর্চ্ছা। যেমন আমাদেব ভযেব মূর্চ্ছা, কামেব মূর্চ্ছা, কষাযেব মূর্চ্ছা, পবিগ্রহেব মূর্চ্ছা ভাঙ্গতে হয, তেমনই আমাদেব লোক মূর্চ্ছা, লৌকিক ধাবণাব মূর্চ্ছা ভাঙ্গতে হবে। এই মূর্চ্ছা প্রবল হয। যত দিন এই মূর্চ্ছা দূব না হবে, ততদিন অন্য সমস্ত মূর্চ্ছাকে ভাঙ্গাব প্রযোজন সিদ্ধ হবে না। আমবা নিজেব মান্যতাব জালে জডিযে পডেছি। যাব চিন্তাশক্তি কম সে অতি শীঘ্রই এই জালে জডিযে পডে। এই বিপদেব ঘাঁটি পাব হতে হবে, লোক সংজ্ঞাব পবিসমাপ্তি ঘটাতে হবে।

আব এক সংজ্ঞা আছে—ওধ সংজ্ঞা, অর্থাৎ সামূহিক চেতনা বা প্রবাহপাতী চেতনা। লোকে বলছে—'ভযেব কাবণ কি? সবাব যা ঘটছে আমাদেব অবশ্যই তাই ঘটবে।' এই হল প্রবাহবাহী চেতনা। এক প্রবাহেব সঙ্গে নিজেকে জুডে দিলাম, আব সেই সুযোগে নিজেব মন্দ আচবণকে প্রবাহবাহী চেতনাব দ্বাবা সংবক্ষণ কবলাম। 'যা সবাব ভাগ্যে ঘটে তাই আমাব ভাগ্যে ঘটবে, ভাবনাব কোন কাবণ নেই'—এই বকম চিন্তা কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক চেতনা। আমবা যখন এই চেতনাব জালে আবদ্ধ হই তখন বেবিযে আসা খুবই কঠিন হয।

এই মূর্চ্ছাকে ভাঙ্গতে না পাবলে আমবা সাধনাব ক্ষেত্রে প্রবেশ কবতেই পাবব না। এটা খুবই আবশ্যক যে এই মূর্চ্ছা ত্যাগ কবে আমবা নিজেব ব্যক্তিত্ব গঠন কবি, অর্থাৎ শুদ্ধ চেতনা নির্মাণ কবি।

ব্যবহাবিক মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রেব এক বৈজ্ঞানিক বলেছেন—'আমাকে একটা শিশু দাও, আব বল, তুমি তাকে কি বানাতে চাও। তুমি চাও তো আমি তাকে ডাকাত বানিযে দেব, তুমি চাও তো আমি তাকে মহাত্মা বানিযে দেব। যেমন চাও, তেমন বানাব। কাবণ আমি পবিস্থিতিকে নিযন্ত্রণ কবতে পাবি, আব এই পবিস্থিতিব ওপবই ব্যক্তিব চবিত্র গঠন নির্ভব কবে, ব্যক্তি ভাল বা মন্দ হযে গডে ওঠে।'

এ বকম ঘোষণা লোকেব কাছে অদ্ভুত মনে হতে পাবে। তবে

শুধু আশ্চর্যজনক নয, এ ঘোষণা সুখদাযকও বটে। যদি কোন ব্যক্তিব হাতে এমন ক্ষমতা এসে যায় যে, সে পবিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কবে লোককে যেমন ইচ্ছা তেমনই বানাতে পাবে, তবে সংসাবে পবমাত্মা কল্পনা কবাব স্থলই আব থাকে না। পবমাত্মাকে মানাব কোন আবশ্যকতাই থাকে না, কাবণ ঐ বৈজ্ঞানিক তো স্বযং পবমাত্মা বনে গিযেছেন।

বৈজ্ঞানিক তো ঘোষণা কবলেন। লোকেও তা শুনল। কিন্তু কিছুই হল না। মানুষ বানানো সম্ভব হল না। কেবল বাহ্য পবিস্থিতিব সাহায্যে মানুষ গডাব কথা যখন ওঠে তখম আমবা এই সত্য ভুলে যাই যে, যদি কোন মানুষেব স্বকীয কোন বৈশিষ্ট্যই না থাকে তবে সে মানুষ মানুষই নয। সে চেতনাবান প্রাণীই নয। সে যন্ত্র মাত্র।

এও আমাদেব বুঝতে হবে যে, যদি কোন সাধক ঘোষণা কবেন তাঁব কাছে কোন শিশুকে বাখলে তিনি যেমন চাওযা যাবে তেমন কবেই তাঁকে মানুষ কবে দেবেন, তবে তিনি অসম্ভব কথা বলছেন। এ খুবই কঠিন ব্যাপাব, কাবণ পবিস্থিতিব দ্বাবা যেমন ব্যক্তিকে গডা যায না, তেমনই কেবল সাধনাব দ্বাবাও সে কাজ কবা সম্ভব হয না। আমাদেব দেখতে হবে কোন ব্যক্তিব কতটা আন্তবিক ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ কাব কতটা ক্ষযোপশম ক্ষমতা আছে। এই এক কথা। দ্বিতীয কথা এই যে, আমাদেব দেখতে হবে কোন ব্যক্তি সাধনাব কতখানি অবসব লাভ কবছে, কি প্রকাব বাতাববণ আব পবিস্থিতিব মধ্যে কালাতিপাত কবছে। একদিকে আন্তবিক ক্ষমতা, অন্যদিকে বাতাবরণ ও পবিস্থিতি—এই উভযেব উপযুক্ত সংযোগ হলেই চেতনা নির্মলীকবণেব কাজ অগ্রসব হতে পাবে। এই দুটিব কোন একটিব ক্রটি থাকলে, প্রযত্ন কবা সত্ত্বেও সফলতা হবে না। যদি এই তথ্য মনে বেখে চলি তবে সাধনাব প্রতি, সাধনাব উদ্দেশ্যেব প্রতি, আমাদেব দৃষ্টি কখনও আচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট হবে না এবং আমবাও ধীবে ধীবে অগ্রসব হতে পাবব।

ধ্যেয যদি স্পষ্ট না হয, শক্তি যদি অল্প হয, অথচ মনে যদি অনেক কিছু কবাব চিন্তা থাকে, তা হলে সম্ভবত মাঝপথেই বিভ্রান্ত হযে

ঘুরে বেড়াতে হবে।

একটা সুন্দর কাহিনী আছে। এক শেঠের দুই ছেলে ছিল। শেঠ ভাবল, কাকে আমার উত্তরাধিকারী করি। সে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করল। তার প্রচুর বিত্ত ছিল। সে দুই ছেলেকেই পাঁচ লাখ করে টাকা দিয়ে বলল, 'যাও, আমি তোমাকে টাকা দিলাম। রাজ্যের প্রত্যেক শহরে একটা করে পাকা বাড়ি বানাও, আর তিন মাসের মধ্যেই আমাকে খবর দিও। ছেলেরা চলে গেল। ঐ রাজ্যে অনেক শহর ছিল। সময় পূর্ণ হল। তিন মাস কেটে গেল।

এক ছেলে ফিরে এল। তাকে শ্রান্ত-ক্লান্ত ও দুর্বল দেখাচ্ছিল। শেঠ জিজ্ঞাসা করল—'পাকা বাড়ি বানিয়েছ?' ছেলে বলল—'কয়েকটি শহরে বানিয়েছি। কি করে সব শহরে বানাব? আপনি যে টাকা দিয়েছিলেন তা তো তিন-চারটি পাকা বাড়ি করতেই ব্যয় হয়ে গিয়েছে।'

অপর ছেলেটিও ফিরে এল। তাকে খুব প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। শেঠ জিজ্ঞাসা করল—'কতগুলি পাকা বাড়ি বানিয়েছ?' সে বলল—'বাবা, সব শহরেই পাকা বাড়ি করেছি।' তাই শুনে শেঠ জিজ্ঞাসা করল—'কত ব্যয় হল?' ছেলে বলল—'ব্যয় কিছুই হয় নি। পাঁচ লাখ টাকা ধরাই আছে।' শেঠ জিজ্ঞাসা করল—'তা হলে কি করে করলে?' তখন ছেলে উত্তর করল—'সব শহরেই আমি মিত্র করেছি। এমন গভীর মিত্রতা করেছি যে, মিত্রদের সব বাড়িই আমার নিজের বাড়ি হয়ে গিয়েছে। যখন ইচ্ছা তখনই সেই সব বাড়িতে যেতে পারি।'

এই কাহিনী থেকে আমরা এই বুঝি যে, শক্তির ব্যবহার আমরা করতে পারি, কিন্তু তার আগে আমাদের শক্তি কতখানি তা ওজন করে বুঝতে হবে, এবং কি ভাবে ঐ শক্তির ব্যবহার হবে তাও ভাবতে হবে। যদি নিজের শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক বোধ থাকে তবে প্রত্যেক স্থানেই পাকা বাড়ি করা সম্ভব হতে পারে। আর শক্তির যদি ঠিক আন্দাজ করতে না পারি, নির্ণয় করতে না পারি, তবে সামান্য কয়টি পাকা বাড়ি বানাতেই আমাদের ধন ফুরিয়ে যাবে।

১৫

শরীর ও তার বিশিষ্ট কেন্দ্র

আমাদের উপর, মধ্য ও নিচ—এই তিন মুখ্য ভাগ আছে। এই তিন ভাগেই শক্তির স্রোত প্রচ্ছন্ন আছে। শরীরশাস্ত্রজ্ঞগণ শরীরকে এক বিশেষ কোণ থেকে দেখেছেন। সেই কোণ সর্ববিদিত। কিন্তু যোগাচার্যগণ শরীরকে আর এক কোণ থেকে দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন—শরীরে কতগুলি মুখ্য কেন্দ্র, চৈতন্য-কেন্দ্র, জ্ঞান-কেন্দ্র আছে। ঐ কেন্দ্রগুলিকে জাগ্রত করতে পারলে, সক্রিয় করতে পারলে, শক্তির স্রোত প্রবাহিত হয়, আর শক্তির বিশেষ অনুভব হতে আরম্ভ করে। ভগবান মহাবীর আচারাংগ সূত্রে বলেছেন—'আযতচক্খু লোকবিপস্সী', 'লোগস্স অহে ভাগং জাণই, উড্ঢং ভাগং জাণই, তিরিযং ভাগং জাণই' —যে আযতচক্ষু হয়, সংযতচক্ষু হয়, যে লোকদর্শী হয়, যার উন্মীলিত-চক্ষু এক বিন্দুতে স্থির থাকে, সেই লোকদর্শী ঊর্ধ্বলোক, মধ্যলোক, অধোলোক—তিন লোকই দেখতে পায়।

আমাদের শরীরই লোক। বস্তুকে পুরুষের মাধ্যমে বা লোকের মাধ্যমে বোঝানো প্রাচীন পদ্ধতি। জৈন পরম্পরায় লোককে বোঝানোর জন্য লোক-পুরুষের কল্পনা করা হয়েছে। পুরুষের সাথে লোকের তুলনা করা হয়েছে। পুরুষের শরীরের তিন ভাগ আছে—ঊর্ধ্বভাগ, মধ্যভাগ

ও অধোভাগ। সেই বকম লোকেবও তিন ভাগ হয—উর্ধ্বভাগ, মধ্যভাগ ও অধোভাগ। এখানে লোকেব অর্থ—শবীব, পুরুষ-শবীব। পুরুষ-শবীবেব তিন ভাগেব ওপবই ধ্যান কবা যায। ভগবান মহাবীব শবীবেব তিন ভাগেব ওপবই ধ্যান কবতেন। প্রথম ভাগ হল—কপাল, মস্তিষ্কেব ওপব অংশ, মুখ্য মস্তিষ্ক—এই ভাগই হল ধ্যানেব মুখ্য কেন্দ্র, শক্তিব মুখ্য কেন্দ্র। দ্বিতীয ভাগ হল ভ্রূকুটি বা আজ্ঞাচক্র। তৃতীয ভাগ বিশুদ্ধি চক্র, যা কণ্ঠমণিব স্থান। এ ছাডা চতুর্থ ভাগ আছে—মনঃচক্র। আমাদেব গলাব সোজা নিচে নাভিব বাব আঙ্গুল ওপবে যে স্থান আছে, তাই হল মনঃচক্র। জৈন পবম্পবায এই প্রসঙ্গে 'রুচক প্রদেশেব' কথা বলা হযেছে। এই প্রদেশ এমন যে এব ওপব কোন আববণ নেই, তা নিবাববণ। এ যদি অনাবৃত না থাকে তবে চৈতন্যেব হেবফেব হযে যায। জীব আব জীব থাকতে সমর্থ হয না। যোগেব আচার্যগণ মনঃচক্রেব আটটি দল স্বীকাব কবেছেন। এই দিক থেকে রুচক প্রদেশেব সঙ্গে এব তুলনা কবা হযেছে। এই হল মনঃচক্র। এব থেকে অল্প দূবে হৃদযেব যে স্থান তাও গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থান আমাদেব উর্ধ্ব শবীবেব চৈতন্যেব এক বিশেষ কেন্দ্র।

মধ্য শবীবেব মুখ্য কেন্দ্র—নাভি। নাভি শক্তিশালী কেন্দ্র। নাভি আব তাব দু দিকেব ভাগই খুবই শক্তিশালী।

আমাদেব শবীবেব অধোভাগে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র আছে। মেরুদণ্ডেব নিচে যে বাঁক ('কার্ভ') আছে, মেরুদণ্ড যেখানে শেষ হয, সেখানে যে মাংসপিণ্ড আছে, তাকে কুণ্ডলিনীব স্থান বলা হয। সেখানেই প্রাণধাবা উৎপন্ন হয, বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয। এই স্থান জেনাবেটবেব কাজ কবে, এখান থেকেই সমস্ত শবীবে বিদ্যুৎ সবববাহ হয। এই স্থান মেরুদণ্ডেব অন্তিম প্রান্ত। তাব পবে আসে জননেন্দ্রিযেব স্থান, আব তাবও পবে পাযেব আঙ্গুল। অধো শবীবেব—অধোলোকেব—এগুলিই মুখ্য স্থান।

শবীবে এই সবই চেতনাব মুখ্য কেন্দ্র। আমাদেব কোন্ কেন্দ্রকে

জাগ্রত করতে হবে, সক্রিয় করতে হবে. তা নির্ভর করবে আমাদের লক্ষ্যের ওপর। প্রশ্ন হবে, কেন্দ্রকে জাগ্রত করার পদ্ধতি কি ? এক সরল পদ্ধতি হল, আপনি যে কেন্দ্রকে জাগ্রত করতে চান, সক্রিয় করতে চান, তার ওপর মনকে একাগ্র করুন। মন যতই একাগ্র হবে ততই ঐ কেন্দ্র জাগ্রত হবে, সক্রিয় হয়ে উঠবে। যে ব্যক্তি বার বার বাসনার কথা চিন্তা করে, তার বাসনা-কেন্দ্র. জননেন্দ্রিয়ের স্থান সক্রিয় হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করতে চায়, সে যদি তার সমগ্র মন মস্তিষ্কের মধ্যভাগে একাগ্র করে তবে তার জ্ঞান-কেন্দ্র সক্রিয় হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি পবিত্রতা লাভ করতে চায়, পবিত্র হতে চায়, সে বিশুদ্ধি-চক্রের ওপর মনকে বারে বারে একাগ্র করুক। এর ফলে বাসনার সংস্কার ক্ষীণ হবে, আর পবিত্রতা আসতে থাকবে। যে প্রাতিভ জ্ঞান চায়, কি ঘটতে যাচ্ছে তা আগেই জেনে নিতে চায়, সে আপন মন আজ্ঞাচক্রের ওপর কেন্দ্রিত করুক। ঘটনার পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব হবে। আমাদের এরকম ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন থাকতে পারে। এটা সত্য যে, যার প্রতি আমরা বেশি মনোযোগ দেব, তা আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে যাবে। আমরা লৌকিক ব্যবহারেও সর্বদা অনুভব করেছি যে, যে ব্যক্তিকে আমরা বেশি পছন্দ করি, যার সম্বন্ধে আমরা ভাল ভাব পোষণ করি, যাকে আমরা বেশি ভালবাসি ও স্নেহ করি, যার সঙ্গে সর্বদা সম্বন্ধ রাখতে চেষ্টা করি, সেই ব্যক্তি সহজেই আমাদের হয়ে যায় ও আমাদের প্রত্যেক ইচ্ছা পালন করতে যত্নবান হয়। সেই ভাবে যে জ্ঞানতন্তুকে আমরা প্রশিক্ষিত করি তা নিশ্চিতরূপে আমাদের আদেশ পালন করবে। সেই জ্ঞানতন্তু আমাদের আদেশ পালন করবে না, যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি, যাকে আমরা প্রশিক্ষিত করি নি বা যার সঙ্গে আমাদের মন সংযুক্ত হয় নি। প্রাকৃতিক চিকিৎসা বা মানসিক চিকিৎসার একটা মুখ্য সিদ্ধান্ত এই যে, যদি তোমার অন্ত্র ঠিকমত কাজ না করে তবে বার বার অন্ত্রের ওপর মন কেন্দ্রিত কর ও তাকে আদেশ দাও তা যেন ঠিকমত কাজ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই

অন্ত্রেব মধ্যে যে জ্ঞানতন্তু আছে তা তোমাব আদেশ মেনে নেবে ও ঠিক কাজ কবতে আবম্ভ কববে। যখন আমবা জ্ঞানতন্তুগুলিকে উপেক্ষা কবি তখন তাবাও উদাসীন থাকে ও কোন সহযোগিতা কবে না। যখন আমবা তাদেব ওপব সাপেক্ষ হই, তাদেব অপেক্ষা বাখি, তখন তাবাও সক্রিয হযে ওঠে এবং আমাদেব অপেক্ষিত কাজ কবতে তৎপব হয। এ সবই আমাদেব উপেক্ষা আব অপেক্ষাব ওপব নির্ভব কবে। জ্ঞানতন্তুব শক্তিব বা সহযোগিতাব কোন ন্যূনতা হয না। যে ব্যক্তি প্রাণশক্তি বা তৈজসকে প্রবল কবতে চায সে ব্যক্তিকে মেরুদণ্ডেব নিচে অবস্থিত মাংসপিণ্ডেব ওপব ধ্যান কেন্দ্রিত কবতে হবে। প্রাণধাবার প্রবলতা সাধনেব পক্ষে ঐ স্থান খুবই উপযুক্ত।

এখন আমি নিচেব দিকে যাব। পাযেব বুড়ো আঙ্গুলেবও যথেষ্ট মূল্য আছে। সেখানে প্রাণেব সীমা। যে প্রাণেব প্রবাহ নাসাগ্র থেকে চলতে আবম্ভ কবে তা পাযেব বুড়ো আঙ্গুলে এসে সমাপ্ত হয। যে ব্যক্তিব মনে আপনাব শক্তি ও বীর্যকে সুবক্ষিত কবাব চিন্তা আছে, সে যেন পাযেব বুড়ো আঙ্গুলে ধ্যান কেন্দ্রিত কবে। যোগে এক প্রক্রিযা নির্দিষ্ট আছে। যে ব্যক্তি বীর্যদোষগ্রস্ত, তাব সম্বন্ধে বলা হযেছে, সে যেন সবলভাবে শযন কবে এবং শাযিত অবস্থায শবীবকে একটু ওপবেব দিকে তুলে পাযেব বুড়ো আঙ্গুলেব ওপব মনকে একাগ্র কবে, ধ্যানকে কেন্দ্রিত কবে। এই মুদ্রায দুই-এক মিনিট থাকতে হয। দিন কযেক এই মুদ্রা অভ্যাস কবলেই বোগমুক্ত হবে।

এই কটি মুখ্য কেন্দ্র, যেখানে মনকে নিযোজিত কবলে আমবা লাভবান হতে পাবি। আধুনিক শবীবশাস্ত্রে কতকগুলি নতুন গ্রন্থিব, নতুন গ্ল্যানডেব, উল্লেখ কবা হযেছে। সেগুলিও আমাদেব বুঝতে হবে, সেগুলি থেকেও যথাসম্ভব লাভ আদায কবতে হবে।

আমাদেব শবীবেব চক্র আছে, সাত-আটটি গ্রন্থি আছে, কমল আছে। যোগেব ভাষায আমবা শুনি, আমাদেব শবীবে ছযটি চক্র আছে, সাত-আটটি গ্রন্থি আছে, আব হৃদয-কমল, নাভি-কমল প্রভৃতি

কমল আছে। শরীর শাস্ত্রের দৃষ্টিতেও কতকগুলি গ্রন্থি প্রতিপাদিত হয়েছে, কতকগুলি কমলও নির্দিষ্ট হয়েছে। তবে, এ সব শব্দ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, তাই এগুলি আমাদের বুঝতে হবে। এই যে সব কেন্দ্র নির্দিষ্ট আছে—মুখ্য কেন্দ্র আছে, সেখানে প্রাণতত্ত্ব অনেকটা জড়িয়ে পড়েছে, এঁকে-বেঁকে গিয়েছে। প্রাণের ধারা সেখানে সোজা চলতে পারে না, তাকে ঘুরে যেতে হয়, চেষ্টা করে যেতে হয়। সেজন্যই ঐগুলিকে 'গ্রন্থি' বলা হয়েছে। জট-পাকানো পথ বলে ওদের গ্রন্থি বলা হয়েছে, চক্র বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই বোঝানো যে, সেখানে গতি চক্রাকার ও ঘূর্ণমান, সহজ বা সরল নয়। সেজন্য 'চক্র' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কমল' শব্দটি প্রতীকাত্মক। কমল এমন বিচিত্র বস্তু যা বিকশিত হয়, আবার শুকিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। যার সঙ্কোচ ও বিস্তার আছে, যাতে সঙ্কোচ ও বিকাশের শক্তি আছে, তাকেই কমল বলা যায়। এখানে রূপক অর্থে 'কমল' শব্দের প্রয়োগ। এর অভিপ্রায় এই যে, যদি আপনারা ঐ সব ধ্যান কেন্দ্রের ওপর ধ্যান কেন্দ্রিত করে ঐগুলিকে সক্রিয় করে তোলেন, তবে ঐগুলি সহজ ও সরল হয়ে যাবে, এবং আপনাদের প্রাণধারা সোজা পথে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ পাবে। আর যদি আপনারা ঐ কেন্দ্রগুলিকে উপেক্ষা করেন, তাদের ওপর ধ্যান কেন্দ্রিত না করেন, তবে তারা সরল হবে না, সঙ্কুচিতই থাকবে এবং তার ফলে আপনাদের প্রাণধারা সোজা রাস্তা না পেয়ে এঁকে-বেঁকে চলার চেষ্টা করতে বাধ্য হবে।

এখন এই তিনটি কথাই স্পষ্ট হল যে, আমাদের শরীরে গ্রন্থি আছে, চক্র আছে, কমল আছে। কমলের মত কিছু দেখতে না পেয়ে আধুনিক কালের ডাক্তার বলেন—'আমরা গোটা শরীরটাই কেটে-কুটে দেখেছি, শরীরের প্রতিটা অণুই বিশ্লেষণ করেছি, কিন্তু কোথায়, কমলের তো দেখা পাই নি। কোথায় আজ্ঞা চক্র, কোথায় বিশুদ্ধ চক্র ইত্যাদি—কই, এসব কিছুই তো দেখা যায় নি।' স্বীকার করতেই হবে, ডাক্তার ঐ রকম কিছু দেখতে পান নি। তবে, আজ্ঞা চক্র থাক বা না থাক,

বিশুদ্ধি চক্র থাক বা না থাক, এখন যে 'পিনিযাল' আব ঐ বকম অনেক গ্রন্থি—অনেক 'গ্ল্যান্ড'—সম্বন্ধে কথা বলা হচ্ছে, তুলনাত্মক দৃষ্টিতে সেগুলিকে দেখলে যোগশাস্ত্রেব প্রতিপাদন ও শবীবশাস্ত্রেব প্রতিপাদনেব মধ্যে যে বিশেষ ভেদ আছে এমন বোধ হবে না।

প্রশ্ন হতে পাবে, আমবা মনকে কোথায লাগাব? ধ্যানকে কোথায কেন্দ্রিত কবব? এব উত্তব আপনাদেব ওপবই নির্ভব কবে। আপনাদেব লক্ষ্য কি? আপনাবা কি চান? আপনাদেব প্রাপ্তিব বিষয কি? যদি ধ্যানেব নির্মলতা সাধন আপনাদেব লক্ষ্য হয, তবে আপনাদেব ধ্যান-কেন্দ্রেব ওপব ধ্যান কবতে হবে। আচার্যগণ কিছু কিছু ব্যবস্থা দিযেছেন। আমবা 'ণমো অবহং তাণং'—এব ধ্যান কোথায কবব? অর্হতেব ধ্যান কোথায কবা উচিত? তাঁবা বলেছেন, শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান-কেন্দ্র, সেটাই অর্হৎ ধ্যানেব স্থান।

কেন্দ্রগুলি স্থূলভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত—জ্ঞান-কেন্দ্র আব বাসনা-কেন্দ্র। যখন আমাদেব প্রাণধাবা তথা মনেব গতি নিচেব দিকে যায, তখন বাসনা-কেন্দ্র সক্রিয হয, তীব্র হয ও জাগ্রত হয। জ্ঞান-কেন্দ্র দুর্বল হযে যায। আবাব যখন আমাদেব প্রাণধাবাব—তথা মনেব—গতি ওপবেব দিকে ওঠে, তখন আমাদেব জ্ঞান-কেন্দ্র সক্রিয হয, তীব্র হয-ও জাগ্রত হয। বাসনা-কেন্দ্র ক্ষীণ হযে যায। অর্হতেব স্থান হল—মস্তিষ্ক। যদি আমবা মস্তিষ্কে অর্হতেব ধ্যান কবি, তবে আমবা জেনে বা না জেনে জ্ঞান-কেন্দ্রেব জাগবণ কবতে থাকি। জ্ঞান-কেন্দ্র জাগ্রত হযে যাবেই। এই হল জ্ঞান-কেন্দ্রকে সক্রিয কবাব উপায। আচার্যবা বলেছেন—অর্হতেব ধ্যানেব সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত বর্ণেব ধ্যানও কব। মস্তিষ্কেব যে অগ্রভাগ, সেখানে এক বকম পদার্থ আছে। তাব বঙ মেটে—খানিকটা হলদে, খানিকটা সাদা। সেখানে শ্বেতবর্ণেব (ধূসবেব) ধ্যান লাভপ্রদ। তাতে সেখানকাব পবমাণুগুলি সহজ শক্তি প্রাপ্ত হয। মস্তিষ্ক আপনা-আপনি শক্তিশালী হযে যায। আমাদেব জ্ঞান-কেন্দ্রেব তন্তুগুলি সক্রিয হযে জেগে ওঠে।

'ণমো সিদ্ধাণং'-এব ধ্যানেব স্থান ললাট—আজ্ঞাচক্র। এব বর্ণ—রক্ত। আজ্ঞাচক্র আমাদেব সমস্ত সক্রিযতাকে উৎপন্ন কবে। শবীবেব ওপব নিযন্ত্রণ বাখা—জ্ঞানাত্মক নিযন্ত্রণ বাখা—এই চক্রেব প্রধান কাজ। লাল বর্ণ প্রচুব উত্তেজনা, সক্রিযতা ও গতি উৎপাদন কবে। যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধবে লাল বঙেব ধ্যান কবে তাব বিপদও হতে পাবে। লাল বর্ণ থেকে অতিবিক্ত উষ্মা উৎপন্ন হয। তাতে বিপদেব সৃষ্টি হতে পাবে। ব্রক্তেব সমস্ত সক্রিযতাই লাল বঙেব কাবণে।

এখন প্রশ্ন, 'ণমো আযবিযাণং'—এব ধ্যান কোথায কবব ? আচার্য আচাবেব প্রতীক। আচাবেব অর্থ—পবিত্রতা। পবিত্রতাব স্থান হল, গলাব পাশ। সেখানে যদি আমবা ধ্যান কেন্দ্রিত কবি তো আমাদেব আচাবেব ভাবনা সহজেই আসবে, আমাদেব পবিত্রতা জাগ্রত হবে। সেখানে আমাদেব হলদে বঙেব ধ্যান কবতে হবে। পীত বর্ণ ভাবনাকে বেগবতী কবে। 'অ্যানাটমি' শাস্ত্র অনুসাবে, শবীবেব আভ্যন্তবীণ স্রাব সর্দি, গর্মি প্রভৃতি নিযন্ত্রণ কবে। যাব শবীবেব স্রাব কম হয, সে ব্যক্তি অসমযেই বুড়ো হযে যায, ক্ষীণ হযে যায। তাব শবীবেব উপচয বন্ধ হযে যায। যাব শবীবে স্রাব যথোচিত হয, তাব শবীবেব সুসমঞ্জস বিকাশ হয। এই স্রাবই আমাদেব শবীবেব ওপব নিযন্ত্রণ কবে, আমাদেব গ্রন্থিগুলিব নিযামক তত্ত্বই এই স্রাব। পীত বর্ণেব সঙ্গে, 'ণমো আযবিযাণং'—এব ধ্যান এই নির্দিষ্ট স্থানে কবতে হয। পীত বর্ণ সদ্-ভাব ও আচাবেব পুষ্টিসাধক হয। যে ব্যক্তি পীত বর্ণেব ধ্যান কবে সে -ব্যক্তি যেমন জ্ঞানেব বিকাশ সাধন কবে, তেমনই পবিত্র ভাবনাব বিকাশেবও পোষকতা কবে। আপনাবা দেখবেন যে, পবিত্র ভাবনাব প্রতীক রূপে যেখানে বঙেব নির্বাচন কবা হযেছে সেখানেই পীত বঙকে গুরুত্ব দেওযা হযেছে—পীত বর্ণকে মুখ্য স্থান দেওযা হযেছে।

'ণমো উপজ্‌ঝাযাণং'—এই উপাধ্যাযেব ধ্যান কবাব স্থান—মনঃ-চক্র। কেউ কেউ মনে কবেন, এই ধ্যানেব স্থান—হৃদয। এ নিযে অনেক মীমাংসা হযেছে। মোট কথা, এটা হৃদয-স্থানেব ব্যাপাব নয,

এব স্থান মনঃচক্র। মনঃচক্রেব ওপব উপাধ্যাযেব ধ্যান কবতে হয। প্রাচীনকালে একে হৃদয-চক্র বলে মানা হতো। উপাধ্যাযেব ধ্যান নীল বর্ণেব সঙ্গে কবতে হয। নীল বর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদেব মনে উত্তেজনা হযেছে, জটিলতা হযেছে। আপনাবা ঐ উত্তেজনা ও জটিলতাকে প্রশমন কবতে নিজেদেব অসমর্থ বোধ কবেছেন। ঐ অবস্থায আপনাবা বিশ মিনিট ধবে নীল আকাশেব দিকে তাকিযে থাকুন। অবশ্য ঐ সমযেব আকাশ যেন স্বচ্ছ ও নিবাববণ থাকে। আকাশ দেখতে থাকলে অল্প সমযেব মধ্যেই আপনাব মনেব উত্তেজনা কমে যাবে, চিন্তা মিটে যাবে, জটিলতা হ্রাস পাবে। নীল বর্ণেব প্রধান কাজ—মনকে শান্ত কবা, উত্তেজনাকে কমিযে দেওযা। বোগী যখন খুবই উত্তেজিত হয, যখন তাব ঘুম কিছুতেই আসে না, তখন তাকে নীল বঙেব জল পান কবানো হয। এতেই তার উত্তেজনা কমে—ঘুম আসতে থাকে। বোগীব ছটফটানি ও কষ্টেব উপশম হয।

'ণমো লোএ গব্ব সাহুণং'। মুনিব স্থান—চবণ। পাযেব অঙ্গুষ্ঠেব স্থানেব খুব মহত্ত্ব আছে। সেখানকাব বর্ণ—কৃষ্ণ, অর্থাৎ কালো। কালো বর্ণেব নিজস্ব এক অর্থ আছে। এব থেকে অবশোষণেব ক্ষমতা হয, যাব ফলে বাইবেব কোন প্রভাব ভেতবে যেতে পাবে না।

এই হল পাঁচটি স্থান ও পাঁচটি বর্ণ। যে আচার্যবা এই স্থান ও বর্ণগুলিব ব্যাখ্যা কবেছেন, তাঁবা শবীবেব গঠনপ্রণালীব সঙ্গে সম্পূর্ণ পবিচিত ছিলেন। তাঁব জানতেন, কোন্ স্থানে কোন্ বর্ণেব ওপবে ধ্যান কবলে কোন শক্তি জাগ্রত হয। স্থান ও বর্ণেব পবিকল্পনা এই ভিত্তিতে কবা হযেছিল যে সেখানে কেন্দ্র সক্রিয হতে পাবে ও তাব শক্তিব বিকাশ হতে পাবে। আপনাবা স্মবণ বাখবেন এ সবই মত-বাদেব কথা, বিজ্ঞানেব কথাও বটে। শবীবেব কেন্দ্রগুলি কিভাবে জাগ্রত কবা যায, সে বিষযে জৈন আচার্যবা নিজেদেব ভঙ্গিতে এই সব পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক চিন্তা কবেছেন।

জৈন পবম্পবায 'এগ পোগ্গল নিবিট্ঠদিট্ঠি' আব 'নাসাগ্গ

নিবিট্‌ঠদিটি্‌ঠ'—এক পুদ্‌গলেব ওপব দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত কবাব বা নাসাগ্রেব ওপব দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত কবাব কথা এসে যায। প্রশ্ন হতে পাবে, নাসাগ্রেব ওপবই দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত কবতে হবে কেন? যে কোন স্থানেই তো দৃষ্টিকে স্থিব কবা যায। আসলে, তাৎপর্যটা কি? দৃষ্টিকে কেন ভ্রূকুটিব ওপব স্থিব কবব? অন্যত্রও তো স্থিব কবতে পাবি। উত্তবে বলতে হবে, এ সবেব পেছনেই গভীব অর্থ আছে, বহস্য আছে। অমুক স্থানেব ওপব কেন্দ্রিত হলে, অমুক অমুক তন্তু সক্রিয হয, জাগ্রত হয। শবীবেব দিক থেকে দেখলেও, এইসব স্থানেব মহত্ত্ব আছে। আধ্যাত্মিক বা যৌগিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই সব স্থানেব মহত্ত্ব আবও ভাল কবে বোঝা যায। শবীবশাস্ত্রেব দৃষ্টি দৈহিক স্বাস্থ্যতেই সীমিত। জ্ঞানেব বিকাশ কবা, পবিত্রতাব বিকাশ কবা—এগুলি যোগেব দৃষ্টিকোণ থেকে কবণীয কাজ। শবীবেব অমুক অমুক স্থানকে জাগ্রত কবলে জ্ঞান বাড়ে, পবিত্রতা আসে—এই দৃষ্টি যোগ-শাস্ত্রীয, শবীবশাস্ত্রীয নয। শবীব অস্থি, মাংস, মজ্জা দিযে গঠিত—কেবল এই দৃষ্টিতেই আমবা শবীবকে দেখব না। দেখাব আব একটা কোণও আছে। মজ্জা একটি ধাতু, কিন্তু তাব কাজ কি? শবীবশাস্ত্রজ্ঞ এই প্রশ্নেব উত্তব দেবেন। জ্ঞানেব কেন্দ্র হল মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক জ্ঞান ও ক্রিযা—দুটিকেই নিযন্ত্রণ কবে। এখানে পৃষ্ঠবজ্জুও মস্তিষ্কেব সহাযতা কবে। এই বিষযে শবীবশাস্ত্রজ্ঞেবা অনেক বিচাব কবেছেন। যাঁবা ডাক্তাবি পডছেন, ডাক্তাব হচ্ছেন, তাঁবা এই সব কথা সূক্ষ্মভাবেই জানেন। কিন্তু মস্তিষ্কেব অতিবিক্ত অন্য কেন্দ্রকে সহযোগীরূপে বিকশিত কবলে আমাদেব ভাবপক্ষ, জ্ঞানপক্ষ ও ক্রিযাপক্ষেব কোন কোন চেষ্টা সফল হযে ওঠে—তা এঁদেব জানাব বিষয নয। অবশ্য আজকাল তাঁবাও এই ক্ষেত্র নিযে কাজ কবতে আবম্ভ কবেছেন। আগে তো এই ক্ষেত্র তাঁদেব পক্ষে একেবাবে অববুদ্ধ ছিল।

আমি সূক্ষ্ম শবীবেব কথা ছেড়ে দিযেছি। ঐ শবীবকে সক্রিয কবাব উপাযও আছে। এখানে সে বিষযেব আলোচনা কবব না।

স্থূল শবীবেব সঙ্গে আমাদেব নিকট সম্বন্ধ। কি উপাযে ঐ শবীবেব মুখ্য কেন্দ্রগুলিকে সক্রিয কবা যায, তাব সংক্ষিপ্ত আলোচনা কবলাম। যদি আমবা এই বিষযে মনোযোগ দিই তবে নিজেদেব ভাবনা অনুসাবে অমুক অমুক কেন্দ্রকে সক্রিয কবে লাভবান হতে পাবব।

রাজগড় শিবির

(৭ জুন, ১৯৭৩—১৭ জুন, ১৯৭৩)

হিসার শিবির

(২ অক্টোবর, ১৯৭৩—৯ অক্টোবর, ১৯৭৩)

১৬

শরীর বোধের অপেক্ষা

সেদিন ছিল দীপাবলী। এক ব্যক্তি আসছিল। রাস্তায় আর এক ব্যক্তির সঙ্গে তার দেখা হল। দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'কোথা থেকে আসছ?' প্রথম ব্যক্তি উত্তর দিল, 'বাজার থেকে।' 'কি এনেছ বাজার থেকে?' 'দীপ এনেছি।' প্রথম ব্যক্তির হাতে দীপ ছিল, অর্থাৎ মাটির এক আকারবিশেষ ছিল। কিন্তু মাটির তো দীপ হয় না। দীপ তাকেই বলে যা প্রকাশমান—যার আলো আছে, দীপ্তি আছে। যা প্রকাশমান নয়, তা দীপ নয়। অথচ ওই মাটির পাত্র ছাড়া কেবল সলতে আলো দেয় না, দীপ হয় না। যখন মাটির পাত্রে তেল ভরা হয়, সলতে তেলে ভেজে, তখনই দীপ্তি হয়। পাত্র ছাড়া কেবল সলতে বা কেবল তেল কিছু করতে পারে না, সলতে ও তেল একত্রেও কিছু করতে পারে না। আধারই যেন স্বয়ং দীপ হয়ে গেল। তাই সাধারণ লোকের ভাষায়, সলতে দীপ নয়, যা তার আধার তাই দীপ।

আমাদের ঠিক এই রকম অবস্থা। আমাদের চেতনার প্রকাশ আমাদের শরীরেই প্রকট হয়। শরীর বাদ দিয়ে চৈতন্য প্রকট হতে পারে না। সেজন্য শরীরও আত্মা হয়ে যায়। প্রাচীন সাহিত্যে চেতনাকে

আত্মা বলা হয়েছে, আবার শরীরকেও আত্মা বলা হয়েছে। চৈতন্যের যোগ আছে বলেই শরীরকে আত্মা বলা হয়েছে। আত্মাকে পুদ্গলও বলা হয়েছে। শরীর তো পৌদগলিক, তাকেও আত্মা বলা হয়েছে। এখানে আমি ভেদ-বিজ্ঞানের দিক থেকে কথা বলছি। আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, কিন্তু তাদের ভিন্ন মনে করা হয়েছে। আত্মা আর শরীর ভিন্ন, কিন্তু তাদের অভিন্ন মনে করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, শরীরের শক্তি আর আত্মার শক্তি—এই দুই শক্তির মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে। শরীরের শক্তি ছাড়া আত্মার শক্তি কার্যকর হয় না। আবার আত্মার শক্তি ছাড়া শরীরের যন্ত্র সঞ্চালিত হতে পারে না। যেমন আগেই বলেছি, দীপের যদি পাত্র না থাকে তবে আলো পাওয়া যাবে না। বাল্ব নেই, কেবল বৈদ্যুতিক কারেন্ট আছে, তাতে আলো হবে না। অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য আলোর বা দীপ্তির এক আবরণ প্রয়োজন। শরীর বিনা চৈতন্যের প্রকাশ অভিব্যক্ত হতে পারে না। চোখের গোলক যদি ঠিক না থাকে তবে লোকে দেখতে পায় না। চোখই যে দেখে, তা নয়। চোখ অভিব্যক্তির এক মাধ্যম মাত্র। কিন্তু গোলক ছাড়া চোখ দেখতে পায় না। চোখ আর তার গোলক—এই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অতি গভীর।

আমরা যখন সাধনার কথা মনে রেখে চিন্তা করি, তখন শরীরকে অনেক অভিশাপ দিই, গাল দিই। তবে শরীর যদি গালির যোগ্য হয় তবে প্রশংসার যোগ্যও বটে। যদি শরীর না থাকত তবে আমাদের এই জগৎও বস্তুহীন হতো। কোন কিছুই ব্যক্ত হতো না, সারা জগৎ অব্যক্তই থেকে যেত। সাধনার দৃষ্টিতেও শরীরের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শরীর নশ্বর বটে, কিন্তু সমস্ত শক্তিকে শরীরই অভিব্যক্তি দেয় ও আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে। আপনারা যা দেখছেন কেবল সেটাই শরীর নয়, সেটা স্থূল শরীর মাত্র। সেই শরীরও শক্তিশালী, কিন্তু অন্য যেসব শরীর আছে তাদের সঙ্গে তুলনায় কম শক্তিশালী। সেই সব অন্য শরীর হল—সূক্ষ্ম শরীর। নাস্তিকরাও এই শরীরের মধ্যে আত্মার

সন্ধান কবতে চেষ্টা কবেছেন। বাজা প্রদেশী চোবেব শবীব টুকবো টুকবো কবে কেটে আত্মাব সন্ধান কবেছেন। কিন্তু আত্মাব দেখা মেলেনি। আজকেব বৈজ্ঞানিকবাও স্থূল শবীবকে মুখ্য মনে কবে আত্মাব সন্ধানে ব্যাপৃত হযেছেন। তাঁবা মৃত্যুব পূর্বে জীবন্ত শবীবের ওজন নিযেছেন, আবাব মৃত্যুব পবে মৃত শবীবেব ওজন নিযেছেন। তাঁদেব উদ্দেশ্য, তুই শবীবেব ওজনেব মধ্যে কোন পার্থক্য হয কিনা, তা নির্ধাবণ কবা। যদি ওজন কমে যায, বুঝতে হবে কোন বস্তু শবীব থেকে বেব হযে গিযেছে। আব সেটাই হবে আত্মা। যদি তুই ক্ষেত্রে ওজনেব কোন পার্থক্য না হয, বুঝতে হবে কিছুই বেব হয়ে যায নি। যা আগে ছিল এখনও তাই আছে। এই ধবনেব অনেক পবীক্ষাই কবা হযেছে। কিন্তু এ সবই খুব স্থূল ব্যাপাব। আত্মা এখন কোথায? এখন যা দেখছি তা তো স্থূল শবীব। সেটা প্রথম দবজা মাত্র। তাব আগে আছে সূক্ষ্ম শবীব। সূক্ষ্ম শবীব তু প্রকাব—বৈক্রিয় আব আহাবক। এরা স্থূল শবীব অপেক্ষা সূক্ষ্ম। বৈক্রিয শবীবেব ক্রিযা নানা রূপে প্রকট হয। আমাদেব স্থূল শবীবেব ক্রিযা একই, অর্থাৎ তা এক রূপেই দেখা যায। স্থূল শবীব রূপ বদল কবতে পাবে না। কিন্তু বৈক্রিয শবীবেব এমন শক্তি আছে যে তা নানা ভাবে রূপ বদল কবতে পাবে। যদি আবশ্যক হয তো এই শবীব একটা পদ্মফুলেব সমান হতে পাবে, আবাব প্রযোজন হলে বিষ্ণুকুমাবেব মত লক্ষযোজন বিস্তৃত রূপ ধাবণ কবতে পাবে। প্রযোজন থাকলে না আবাব পশু-পক্ষীব রূপও ধাবণ করতে পাবে। এই সূক্ষ্ম শবীব এইভাবে নানা রূপ ধাবণ কবতে সমর্থ।

আব এক আছে আহাবক শবীব। এই শবীবও সূক্ষ্ম। এই শবীব বিচাবেব—অর্থাৎ চিন্তা ভাবনাব—সংবাহক। আমাব মনে চিন্তা হল, অমুক ব্যক্তিব সঙ্গে মিলতে হবে, অমুক ব্যক্তিব সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। কিন্তু সে ব্যক্তি এখানে নেই, অনেক দূবে কোথাও আছে। কি কবে তাব সঙ্গে আমাব মিলন হবে? কি কবে কথাবার্তা

হবে ? এই অবস্থায় সংকল্পমাত্রই এক সূক্ষ্ম শরীরের নির্মাণ হয়ে যায়। এই শরীরের সংস্থান ছোট হয়। ছোট. খুবই ছোট। ধারণাতীত ক্ষুদ্র। এই শরীর হাজার মাইলের দূরত্ব এক মুহূর্তে পার হয়ে আমার ইঙ্গিতে ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যায়। তার কাছে আমার প্রশ্ন রাখে, আবার উত্তরও নেয়, তার পরে ফিরে এসে আমার শরীরে প্রবেশ করে সমাহিত হয়ে যায়। এই সমস্ত ক্রিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে যায় যে, ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারে না সম্পূর্ণ ক্রিয়াতে কত সময় লেগেছে। এই হল আহারক শরীরের কাজ। এই শরীর বিচারের—চিন্তা-ভাবনার—সংবাহক। চিন্তা বহন করে নিয়ে যায়, আবার চিন্তা বহন করে ফিরে আসে।

এর আগে আরও দুটি সূক্ষ্মতম শরীর আছে। তাদের একটি তৈজস শরীর, অপরটি কার্মণ শরীর। সবশুদ্ধ শরীরের তিনটি 'গ্রুপ' হয়ে গেল :

স্থূল শরীর—ঔদারিক শরীর—হাড়-মাংসের শরীর।

সূক্ষ্ম শরীর—বৈক্রিয় শরীর—নানারূপ গ্রহণে সমর্থ শরীর।

আহারক শরীর—বিচার-সংবাহক শরীর।

সূক্ষ্মতম শরীর—তৈজস শরীর—তাপময় শরীর।

কার্মণ শরীর—কর্মময় শরীর।

তৈজস শরীর হল তাপময় শরীর। এই শরীর আমাদের উষ্মা, সক্রিয়তা আর শক্তির সঞ্চালক। এই শরীর যদি না থাকত, তবে উষ্মা উৎপন্ন হতো না, পাচন ক্রিয়া হতো না, রক্তের সঞ্চরণও হতো না। এই তৈজস শরীরই আমাদের স্থূল শরীরের যাবতীয় ক্রিয়া সঞ্চালন করছে। স্থূল শরীরে যে শক্তি আছে তার সবচেয়েবড় ভাণ্ডারই হল তৈজস শরীর। যার তৈজস শরীর মন্দ হয়, তার অগ্নিমান্দ্য হয়, সমস্ত ক্রিয়াতেই মন্দতা লক্ষিত হয়। অগ্নি তীব্র হলেই সমস্ত ক্রিয়াতে তীব্রতা আসে। আধুনিক বিজ্ঞানে এই তথ্য ভাল করেই ধারণা করা হয়েছে। ডঃ হীহাক প্রতিপাদন করেছেন যে, সূর্যের তেজ আমাদের আহারের পূর্তি করে।

সূর্যের তাপ আমাদের খাদ্যের পূরক। যদি সূর্যের তাপ না মেলে আমরা কেবল খাদ্যের সাহায্যে বেঁচে থাকতে পারি না। এই বিষয়ে মাইকেল ও তাঁর কয়জন সহকারী ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁরা আঠারোটি ইঁদুর বেছে নেন। তাদের মধ্যে বারোটিকে এমন আহার দিলেন যাতে সুষম খাদ্যের সব উপাদানই ছিল, কিন্তু ক্যালসিয়াম ও ফস-ফরাসের অভাব ছিল। খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুরো উপাদান না থাকায় ইঁদুরগুলি রোগগ্রস্ত হয়ে গেল। তাদের অন্ধকার ঘরে রাখা হয়েছিল। তারা রোগগ্রস্ত হওয়ায় তাদের সূর্যের তাপে রাখা হল। দু-একদিনের মধ্যেই তারা সুস্থ হয়ে গেল, যদিও তাদের খাদ্য অপূর্ণই রইল।

দ্বিতীয় দলের ইঁদুরগুলিকেও অপূর্ণ খাদ্য দেওয়া হল। তারাও রোগগ্রস্ত হয়ে গেল। কিন্তু এবার তাদের সূর্যের তাপে ছাড়া হল না। তারা অন্ধকার ঘরেই রইল। কিন্তু তাদের যে খাদ্য দেওয়া হচ্ছিল তা দেওয়ার আগে অনেকক্ষণ রৌদ্রে রাখা হল। দুই-চার দিনের মধ্যেই ইঁদুরগুলি সুস্থ হয়ে গেল। এই সব অভিজ্ঞতা থেকে ডাক্তার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, সূর্যের তাপ কেবল খাদ্যকে পাক করে না, ঐ তাপ নিজেই খাদ্য এবং আহারের পরিপূরক। সূর্যের তেজ না পেলে বনস্পতির বিকাশ হয় না। মনুষ্য শরীরেরও বিকাশ হয় না, আর ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকও হয় না। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে মনে এক চিন্তা আসছে। জৈন পরম্পরায় মুনিদের আতাপনা নেওয়ার কথা সর্বজনবিদিত। অনেক মুনি আতাপনা নিতেন। তাঁরা কয়েক ঘণ্টা ধরে সূর্যের তাপ নিতেন। তাঁরা পুরো দু দিন বা পুরো তিন দিন আহার না করে থাকতেন। তাঁদের ক্ষিধে কমে যেত। তাঁরা এই রহস্য জানতেন, সে জন্যই এই ক্রিয়াতে ব্রতী হতেন। আতাপনা তিন প্রকারের হতে পারে—জঘন্য, মধ্যম আর উৎকৃষ্ট। মুনি তাঁর শারীরিক শক্তি অনুসারে ব্রত নিতেন। স্থূল উপকরণের দ্বারা ভোজনের যে পূর্তি হতো, সূর্যের তাপ থেকে সহজেই সেই পূর্তি হয়। সূর্যের তাপ থেকেই মুনি পূরো ভোজন পেতেন। আতপ সেবন করার সময়ে মুনি পরিধানে

কেবল একটি নেংটি কাপড় রাখতেন, দেহের অধিকাংশ অংশই রৌদ্রে অনাবৃত রাখতেন। সমস্ত রোমকূপ দিয়ে সূর্যের রশ্মি শরীরে প্রবিষ্ট হতো, আর তা অনেক কেন্দ্রকে সক্রিয় করে তুলত। আজকাল লোকে শরীরের ওপর পোষাকের বোঝা চাপায়, সে বোঝা ভেদ করে হাওয়াও যায় না, আলোও যায় না। ফলে শরীর তাপ আর আলো পায় না।

সূর্যের তাপ আমাদের আহারের খাদ্যের পূর্তি কেবল তখনই করতে পারে যখন তৈজস সক্রিয় থাকে। তৈজস নিষ্ক্রিয় থাকলে সূর্যের আতপ কার্যকর হয় না। আমাদের তৈজস শরীরের শক্তি জাগ্রত হওয়া দরকার। তৈজস শরীরের দুটি কার্য আছে—

১। শরীর-তন্ত্রের সঞ্চালন।

২। অনুগ্রহ আর নিগ্রহ বা উপঘাত।

আমরা জানি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে কোন সভার দিকে তাকান তো সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই অপূর্ব আনন্দ বোধ করে ও নিজেকে ধন্য মনে করে। প্রসন্নতা-ভরা দৃষ্টিতে কারো কিছু মেলে না। ওই বিশিষ্ট ব্যক্তি কাউকে কিছু দেওয়ার চেষ্টাও করেন না—তবুও প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে সে পূর্ণকাম হয়ে গিয়েছে, তাকে খুবই কৃপা করা হয়েছে। যেন অমৃত বর্ষণ হয়ে গিয়েছে। 'ভরত বাহুবলী' মহাকাব্যে কবি পুণ্যকুশল লিখেছেন—'নৃপাঃ প্রসীদন্তি দৃশৈব নো গিরা' —রাজারা দৃষ্টির দ্বারাই প্রসন্নতা বর্ষণ করেন, বাণীর দ্বারা নয়। তাঁরা এমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন যে, সামনে যারা থাকে তারা আপনা-আপনি অনুগৃহীত হয়েছে বলে মনে করে। কেমন করে এই অনুগ্রহ তাঁদের দৃষ্টি থেকে ঝরে পড়ে? দৃষ্টি থেকেই ঝরে, কিন্তু আসলে এই অনুগ্রহ চোখে নেই। তা আছে তৈজস শরীরে। ঐ রকম ব্যক্তিদের তৈজস শরীর এতই অনুগ্রাহক, প্রভাবশালী আর তীব্র হয় যে, তাঁরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন সে দিকেই লোকে অনুভব করে যেন তারা সুধাস্নাত হয়েছে।

তৈজস শরীরের দ্বিতীয় কার্য হল—নিগ্রহ করা, উপঘাত করা।

তৈজস শরীরের নিগ্রহ করার বা উপঘাত করার প্রবল ক্ষমতাও থাকে। ঐ ক্ষমতা এমন যে, একবার যদি ঐ ক্ষমতার অধিকারী কোন দিকে ক্রুর দৃষ্টিপাত করেন, তবে হাজার হাজার লোক ভয়ে কেঁপে ওঠে। এই রকম উপঘাতক শক্তির প্রকাশ আমরাও দেখেছি। এভাবে তৈজস শরীর অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করতে সমর্থ হয়।

কার্মণ শরীর সূক্ষ্মতম শরীর। এটা কর্ম-শরীর, অন্য সব শরীরেরই মূল আধার। এই শরীর আছে বলেই তৈজস শরীর আছে, বৈক্রিয় আর আহারক শরীর আছে, স্থূল ঔদারিক শরীর আছে। যদি এই শরীর না থাকে, কোন শরীরই থাকবে না। স্থূল শরীর মৃত্যুর পরেই ছেড়ে যায়, কার্মণ কিন্তু তা নয়। যখন কারো কার্মণ শরীর ছেড়ে যায় তখন আমরা বলি—তার মোক্ষ হল, সে মুক্ত হয়ে গেল। কার্মণ শরীরের বিচ্ছেদ একবারই হয়, স্থূল শরীরের বিচ্ছেদ বার বার হয়।

একটা ছোট ঘটনার কথা বলি। একবার মাছি আর পিঁপড়ের মধ্যে বিবাদ হল। মাছি পিঁপড়েকে বলল—'তুই কোথায় কোথায় যেতে পারিস? তোর গতির তো সীমা আছে। আর দেখ, আমি সব জায়গায় যেতে পারি। যেখানে ভগবানের ভোগ লাগাচ্ছে সেখানেও যেতে পারি। আমার চলাফেরার কোন বাধা নেই।' পিঁপড়ে বলল—'যাওয়া এক কথা, আর নিমন্ত্রণ পেয়ে যাওয়া আর এক কথা। তুমি যেখানেই যাও সেখানেই তোমাকে উড়িয়ে দেয়, মেরে দেয়, গাল দেয়।'

ওই মাছির দশাই আমাদের শরীরের। যতবারই আমরা শরীর ছাড়ি, ততবারই আবার শরীর এসে জোটে। কার্মণ শরীর কিন্তু এমন নয়। এই শরীর সহজে ছাড়ে না। কিন্তু একবার যদি ছেড়ে যায় তো চিরকালের মত ছাড়ে। এই শরীর—ভাবনার শরীর, বাসনার শরীর, সংস্কারের শরীর। এই শরীর থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

স্থূল শরীরের সঙ্গেই আমাদের কাজ। সাধনার উদ্দেশ্য হল, আমরা স্থূল শরীরের শক্তিকে জাগ্রত করব, সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীরের শক্তিকেও সক্রিয় করব। স্থূল ও সূক্ষ্ম—উভয় শরীর থেকেই আমরা লাভবান হব।

মনোবিজ্ঞান চেতন মন আর অবচেতন মন—এই দুই প্রকার মনের প্রতিপাদন করেছে। চেতন মনে যত শক্তি আছে, অবচেতম মনে তার অনন্ত গুণ শক্তি আছে। চেতন মন চতুর। অবচেতন মন সবল, কিন্তু অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার। এ কাজ করতে হবে, ও কাজ করা হবে না—আপনার এ সব কথা চেতন মন শুনবে বটে, কিন্তু করার বেলায় তা সেই কাজই করবে যে কাজ তার আগে ভাল লেগেছে। অবচেতন মন সে রকম নয। অবচেতন মনকে আপনি যা বলবেন তা যদি ঐ মন ধারণা করে নিতে পারে, তবে ঐ মন সেই কাজই করবে যে কাজ তাকে করতে বলবেন। এই যে চেতন মন আর অবচেতন মনের পার্থক্য, তা স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরের পার্থক্যও বটে। স্থূল শরীরের শক্তিকে যদি এক পয়সা মনে করা যায় তো সূক্ষ্ম শরীরের শক্তিকে বলতে হবে নিরানব্বই পয়সা। এত পার্থক্য দুই শরীরের মধ্যে। সূক্ষ্ম শরীরকে জাগ্রত করার অর্থ হল—বিদ্যুৎ ভাণ্ডার নির্মাণ করা। কিন্তু আমাদের চলতে হবে স্থূল শরীরকে নিয়েই। আমাদের শক্তিকে প্রকট করার প্রথম উপায় এই স্থূল শরীর। সাধনার দৃষ্টিতে এই শরীর মূল্যবান। আবার অনেক উচ্চে দৃষ্টি দিয়ে আমরা শরীরকে বহিষ্কার করেছি, কারণ শরীরই আমাদের বাসনার দিকে প্রেরিত করে। আমাদের সাহিত্যিকরাও জিভকে, চোখকে হাজার রকমের গাল দিয়েছেন, ভাল-মন্দ বলেছেন। কোন কোন সাধক বলেছেন, চোখকে ফুঁড়ে দেওয়াই খুব বড় সাধনা, কারণ চোখই বিকৃতির শক্তিমান মাধ্যম। চোখকে না ফুঁড়লে সাধনা সম্ভব হয় না। তাঁরা বাস্তবিকই চোখ ফুঁড়তেন, আর চিরকালের জন্য অন্ধ হয়ে যেতেন।

সাধনার জন্য শরীরের উপযোগিতা কি? শরীরের দুই মুখ্য ভাগ—মস্তিষ্ক আর সুষুম্না। মস্তিষ্ক সমস্ত শরীরতন্ত্রের নিয়ামক আর সঞ্চালক। চোখ দেখে। কিন্তু দর্শন শক্তি আছে মস্তিষ্কে। কান শোনে। কিন্তু শ্রবণশক্তি থাকে মস্তিষ্কে। সমস্ত জ্ঞানের গ্রাহক ও সঞ্চালক সংস্থান হল মস্তিষ্ক। সকল স্মৃতিই সেখানে সংগৃহীত থাকে। মস্তিষ্ককে জাগ্রত

কবাই স্মৃতিকোষকে জাগ্রত করা। আমাদেব মস্তিষ্ক অতিশয় শক্তিশালী। সেখানে শতকোটি কোষ আছে, আব সেই সব কোষে অসংখ্য সংস্কাব, অসংখ্য স্মৃতি সংগৃহীত আছে। অবধান বিদ্যা স্মৃতিকোষেবই এক চমৎকারী প্রকাশ।

নন্দীসূত্রে মতিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেখানে তার বারটি প্রকার-ভেদ নির্দিষ্ট কবা হযেছে—বহুগ্রাহী, ক্ষিপ্রগ্রাহী ইত্যাদি। ঐগুলি সমস্ত মস্তিষ্কেব শক্তির দ্যোতক। তবে ঐগুলিব বিবেচনা সময-সাপেক্ষ। আজ একথা স্পষ্ট হয়ে গিযেছে যে স্থূল শরীবের শক্তির বিষযে আমাদের পুরো জ্ঞান থাকা দরকার। আমাদের শরীরে মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠবজ্জু, কণ্ঠ, ভ্রূকুটি, তালু, নাসাগ্র, নাভি, মূলবন্ধের স্থান ও পাযের বুড়ো আঙ্গুল—এগুলি মুখ্য কেন্দ্র। এগুলিকে জানা আবশ্যক। এদেব দ্বারা আমরা স্থূল শরীবকে জাগ্রত কবব, আব ঐ শরীরের যে সব শক্তি আছে তাদের থেকে লাভবান হব। এ কথা বলা যায যে, আমাদেব স্থূল শবীবের সমগ্র শক্তির লক্ষ ভাগেব মধ্যে কেবল দু-চারটি ভাগই আমরা বর্তমানে ব্যবহাব করতে সক্ষম হয়েছি, বাকি সব ভাগই সুষুপ্ত বযে গিযেছে, জাগ্রত হয নি। কিন্তু এই সুষুপ্ত শক্তির বোধ আমাদেব হওযা চাই।

ধর্ম এই কথা বলেছে, অধ্যাত্মশাস্ত্র এই নির্দেশ দিযেছে, সাধনা এই শিখিয়েছে যে—তুমি অনন্ত শক্তিব স্রোত, তুমি নিজের শক্তি-সম্পদকে দেখ, বোঝ আব অনুভব কর, বৃথাই তুমি ভিখারিব মত দুযারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছ, কেন তুমি ভিক্ষা চেযে মরছ। অবশ্য এই জ্ঞান কেবল তখনই হতে পাবে যখন আমাদের শরীর সম্বন্ধে পূর্ণ বোধ হযেছে। তাই আমবা শরীবকে উপেক্ষা করব না; শরীরেব কাছে আমাদের যেমন প্রত্যাশা, তার অনুরূপ সম্মান ও আদব আমরা শরীরকে দেব।

১৭

প্রাণ ও তার কার্যক্ষেত্র

সাধারণ জৈন বিদ্যার্থীও জানে আমাদের শরীরে দশটি প্রাণ আছে। সে তাদের পারিভাষিক নাম ও বিশেষ বিশেষ কার্যও জানে। আমাদের সমস্ত ব্যবস্থাই অহিংসার আধারে স্থাপিত। হিংসা বোঝাতে একটি শব্দ আছে—প্রাণাতিপাত। প্রাণের বিনিযোজন করা—হিংসা। প্রাণী, প্রাণ ও প্রাণের বিনিযোজন—এই তিনটি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। প্রাণী তাকেই বলি যে প্রাণকে ধারণ করে আছে। প্রাণ না থাকলে আত্মাও প্রাণী হতে পারত না। আত্মার যে প্রাণীর অবস্থা, তা প্রাণধারার কারণেই হয়েছে। প্রাণ জীবনের মুখ্য কেন্দ্র। আমাদের বুঝতে হবে, সাধনার দৃষ্টিতে প্রাণের কি মূল্য আছে। প্রাণ একটি ধারা, শক্তির এক প্রবাহ। ঐ প্রবাহ সমস্ত শরীরে প্রবাহিত রয়েছে। তার দ্বারাই জীবনের সঞ্চালন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে প্রাণ দশটি নয়, প্রাণধারা একই। কিন্তু তা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে, সেজন্য অনেক হয়ে যায়। প্রাণের মুখ্য কেন্দ্র দশটি, সেজন্য প্রাণ দশটি বলা হয়। যে জীব মাত্র এক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট তারও প্রাণ আছে, যে জীব পাঁচ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট তারও প্রাণ আছে। এ রকম স্থলে প্রাণের সংখ্যার পার্থক্য হয় বটে, কিন্তু প্রাণশক্তির পার্থক্য হয় না।

প্রাণের দশটি কেন্দ্র আছে। যদি আমরা বলি শরীরে দশটি প্রাণ আছে, তাৎপর্য এই যে, শরীরে এমন দশটি কেন্দ্র আছে যেখান থেকে প্রাণশক্তি সঞ্চালিত হতে পারে। পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বচন, কায়া, শ্বাস-প্রশ্বাস আর আয়ুষ্—এই দশটি প্রাণ। এই দশ প্রাণের স্থান কোথায় কোথায় ? যে প্রাণের দ্বারা নিজের কেন্দ্রগুলিতে শক্তি যোগায় তার অবস্থানই বা কোথায়, তার 'সেন্টার' কোথায় ? দশ প্রাণকেই শক্তি দেওয়ার কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্কে আছে। মস্তিষ্কে সমস্ত শক্তিই কেন্দ্রিত। লক্ষ্য করুন, আপনার শ্রবণের এক কেন্দ্র আছে, ঘ্রাণের এক কেন্দ্র আছে, শ্বাসের এক কেন্দ্র আছে, চিন্তন ও সংবেদনা প্রভৃতির এক কেন্দ্র আছে; কিন্তু ঐ সব কেন্দ্রই মস্তিষ্কে অবস্থিত। এর এই অর্থ যে, আমাদের ছয়টি পর্যাপ্তির কেন্দ্রই আমাদের মস্তিষ্কে আছে। পর্যাপ্তিগুলি পৌদগলিক রচনা। পর্যাপ্তি একটি সংস্থান, তাতে ক্ষমতা আছে। তার কেন্দ্রে যখন প্রাণের ধারা সঞ্চারিত হয়, তখন তা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন পর্যাপ্তি প্রাণের রূপ ধারণ করে। এজন্য আমরা মানি যে পর্যাপ্তি কারণ, আর প্রাণ কার্য। দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। মূল প্রাণ কি ? এই প্রশ্ন জটিল। এক আছে প্রাণবায়ু, আর এক আছে প্রাণ। দুটি কিন্তু একই বস্তু নয়। অনেক সময়েই আমরা প্রাণবায়ুকেই প্রাণ বলে মনে করেছি। আসলে কিন্তু ঐ দুটি পৃথক, এক নয়। যে বায়ু আমরা গ্রহণ করি তা সম্পূর্ণ প্রাণ নয়। যখন আমরা শ্বাস নিই তখন আমরা প্রাণকে টেনে নিই না, যখন আমরা শ্বাস ছাড়ি তখন আমরা প্রাণকে ছাড়ি না। যখন আমরা প্রাণায়াম করি তখন আমরা প্রাণের আয়াম, অর্থাৎ নিয়মন করি না, আমরা প্রাণবায়ুর আয়াম করি। এই যে এত শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া—এ সবই বায়ুর কাজ, প্রাণের কাজ নয়। আমাদের প্রাণ তো এক সূক্ষ্ম ধারা, যা আমাদের ভেতরে থেকে সমস্ত কার্য সঞ্চালিত করে। প্রাণ আসছে আত্মশক্তি থেকে, তৈজস শরীরের রূপে। প্রাণবায়ুর চেতনার সঙ্গে সোজাসুজি সম্বন্ধ হয় না, প্রাণ কিন্তু চেতনার সঙ্গে সোজা সম্বন্ধে জড়িত।

আমাদের তৈজস শরীর সমস্ত উষ্মা উৎপাদন করে। জীবনের সঙ্গে ঐ শরীরের নিকট সম্বন্ধ, স্থূল শরীরের সম্বন্ধ নিকট নয়। এক দিকে জীবের তৈজসশক্তি আর এক দিকে চৈতন্য, যখন এই দুই দিকের সংযোগ হয়, তখন প্রাণের উৎপত্তি হয়। প্রাণে চৈতন্যের প্রবাহ আছে, প্রাণবায়ুতে চেতনার প্রবাহ নেই। প্রাণকে এক যৌগিক শক্তি বলতে হয়।

আমাদের শরীরে এক বিশেষ কেন্দ্র আছে। যে স্থানে সুষুম্নার নিম্নস্থ প্রান্তভাগ শেষ হয় তার নিচেই সেই কেন্দ্র অবস্থিত। কেন্দ্রটি প্রাণশক্তির উৎপাদক। প্রাণশক্তিকে প্রকটিত করার ও তাকে সঞ্চারিত করার মুখ্য কেন্দ্রই ঐটি। প্রাণশক্তি সুষুম্না দিয়ে বিভিন্ন মার্গে সঞ্চারিত হয় ও মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছয়। প্রাণশক্তি ওপর থেকে নিচের দিকে যায় না, নিচ থেকে ওপরের দিকে যায়। ঐ শক্তি নিচ থেকে যত বেশি ওপরের দিকে যাবে, মানুষের শরীর ও মন ততই সুস্থ থাকবে। প্রাণশক্তির প্রবাহ যতই কম হবে মানুষ ততই শরীর ও মনে রুগ্ন হয়ে যাবে।

কর্মকার ভস্ত্রা চালায়। তাতে হাওয়া হয় এবং আগুন জ্বলে ওঠে। এক দিকে ভস্ত্রা দিয়ে হাওয়া বের হয়, অন্যদিকে আগুন জ্বলে। হাওয়া আর আগুন এক নয়। অথচ হাওয়ার যত তেজ হবে, আগুনেরও তত তেজ হবে। ঠিক এইভাবেই প্রাণবায়ু প্রাণকে উত্তেজিত করে, সহায়তা দেয়। আমরা যে মাত্রায় প্রাণবায়ু (অক্সিজেন) নেব, সেই মাত্রায় প্রাণ বিশুদ্ধ হবে, সক্রিয় হবে। যদি প্রাণবায়ু না মেলে তো প্রাণে উত্তেজনা বা সক্রিয়তা আসবে না। শরীর শাস্ত্রের দিক থেকে এর কারণ এই যে, আমাদের শরীরে রক্ত-সঞ্চালন হৃৎপিণ্ডের দ্বারা হয়, তবে ঐ রক্ত ফুসফুসে এসে তারপরে সারা শরীরে যায়। হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস—এই দুটি আমাদের রক্ত-সঞ্চালনের মুখ্য যন্ত্র। ফুসফুসে যে রক্তের শোধন হয় তার জন্য ইন্ধন চাই। ঐ ইন্ধনই হল প্রাণবায়ু-অক্সিজেন। যদি প্রাণবায়ু ঠিকমত মেলে, তবে অশুদ্ধ বায়ুকে শুদ্ধ

কবে কার্বন প্রভৃতি শবীর থেকে বেব করে দেওয়া যাবে, আর শুদ্ধ রক্ত ভেতবে প্রবাহিত হবে। আব যদি প্রাণবায়ু না মেলে তো রক্ত বিকৃতই থাকবে, আব তাব ফলে সারা শরীরেই বিকৃতি দেখা দেবে। প্রাণবায়ু বক্ত-শুদ্ধিব উপায, আব শুদ্ধ বক্তকে সাবা শরীরে প্রাণবায়ুই গতি দেয়। প্রাণেব সঙ্গে তাব সম্বন্ধ গভীব। প্রাণবায়ু রক্তের মাধ্যমে প্রাণকে উত্তেজিত করে, সক্রিয কবে। একটা ছোট গাছ যদি জলেব পর্যাপ্ত সেচন পায় তবে তা সবুজ পাতায পূর্ণ হযে বেড়ে ওঠে। সেই বকম, প্রাণবায়ুব পর্যাপ্ত সেচন পেলে প্রাণের ছোট গাছটিও পাতার সমাবোহে বেড়ে ওঠে। পুবো সেচ না পেলে ছোট গাছ শুকিযে যায। সেই বকম, মানুষও নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয হয়ে যায়।

যেখানে প্রাণবায়ু পৌঁছতে পারে না সেখানে বক্তের শোধন হয না, আব শোধনেব অভাবে দূষিত পদার্থ জমতে থাকে। যে প্রাণাযাম জানে সে সবার আগে এই বিষযে প্রযত্ন করে, কিভাবে বেশি বায়ু ফুসফুসে পৌঁছে দেওযা যায। কিভাবে শ্বাসকে দীর্ঘ করা যায।

প্রাণবায়ুকে ঠিকমত নেওযার সাধনই হল—প্রাণাযাম। যে প্রাণাযাম জানে না. সে পুবো মাত্রায প্রাণবায়ু গ্রহণ কবতে সক্ষম হয না। তিনটি ব্যাপার এখানে জড়িত—প্রাণ, প্রাণবায়ু আর প্রাণাযাম। প্রাণাযাম ছাডা প্রাণবায়ুর সম্যক গ্রহণ হয না, আবার প্রাণবায়ু ছাড়া প্রাণেব সম্যক উদ্দীপন হয না। সবশেষে আমি প্রাণাযামের কথা বলছি। প্রাণায়াম এক সাধন। এই সাধন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এব সম্যক জ্ঞান না থাকলে প্রাণবায়ুকে জানা সম্ভব হয না। যোগেব আচার্যবা এই বিষযে যা কিছু লিখে গিযেছেন আজকের বিজ্ঞান তাব সঙ্গে একমত হতে চলেছে।

আমি প্রাণ থেকে আবম্ভ করেছিলাম, তারপরে প্রাণবায়ুর কথা বলেছিলাম, এখন প্রাণাযামে এসে পৌঁছেছি। এবার উল্টো পথে যাত্রা শুরু করছি। আমি প্রাণাযাম থেকে আবম্ভ কবছি। আমাদের প্রাণাযামেব অভ্যাস উপযুক্ত হওযা দরকাব। তাহলে প্রাণবায়ু স্বযং

প্রসাধিত হবে। প্রাণবায়ুকে কি মাত্রায় নেওয়া দরকার, প্রাণবায়ু কতদূর পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে—এসব বিষয়েরও জ্ঞান থাকা চাই। প্রাণবায়ু ঠিকমত নিতে পারলে প্রাণকে সক্রিয় করার ক্ষমতা জাগ্রত হবে। প্রাণশক্তিকে আশ্রয় করে যোগী ব্যক্তি বিচিত্র কাজকর্ম করে দেখাতে পারেন। তৈজস শরীরের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করার ক্ষমতা আছে। তৈজসশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি নির্যাতন করতে পারেন, বিনষ্ট করতে পারেন, মারতে পারেন—আবার অনেক রকম অনুগ্রহও করতে পারেন, দিতেও পারেন। ঐ রকম ব্যক্তির দেওয়ার ক্ষমতাও থাকে। এ সবই আসলে প্রাণশক্তির ক্রিয়া; প্রাণের সম্বন্ধ আছে তৈজসের সঙ্গে। এসব ক্রিয়া তখনই হয়, যখন প্রাণায়াম থেকে প্রাপ্ত প্রাণবায়ুর অগ্নি প্রাণকে এতটা উদ্দীপ্ত করে—প্রাণকে এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত করে—যে, প্রাণের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকটিত হয়ে যায়। সুতরাং এদিক থেকে প্রাণায়ামের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

প্রাণের সমস্ত কেন্দ্র মস্তিষ্কে, কিন্তু প্রাণধারার দুটি পথ হতে পারে। একটি পথ বাইরে, আর একটি পথ ভেতরে। বাইরের পথই আগের পথ। এই পথ দিয়ে গেলে প্রাণশক্তি আমাদের শরীর-তন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলে। আমাদের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তা এর থেকেই উৎপন্ন হয়। তা অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা দেয় না। এই পথে প্রবহমান প্রাণশক্তি আমাদের দশটি প্রাণ-কেন্দ্রকে সক্রিয় করে, আর আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলে। যখন আমরা প্রাণশক্তির প্রবাহকে এই পথ থেকে অপর পথে ঘুরিয়ে দিই, তখন ভিন্ন প্রকারের শক্তির উৎপত্তি হয়।

প্রাণধারা প্রবাহিত হওয়ার ভেতরের পথকে বলা হয়—মহাবীথি। এই শব্দ আচারাংগ থেকে এসেছে—'পণয়া বীরা মহাবীহিঁ'। জানি না সূত্রকার কি অভিপ্রায়ে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন, জানি না ব্যাখ্যাকারদের অভিপ্রায়ই বা কি। কিন্তু এই রকম মনে হয় যে, এই সূত্র প্রাণধারাকে পৃষ্ঠরজ্জু দিয়ে উর্ধ্বগামী করে দেওয়ার সূত্র। এর

অর্থ যে বীর হয়, তাকে মহাপথ দিয়ে চলতে হয়। 'হঠযোগ প্রদীপিকায়' সুষুম্নার এক পর্যায়বাচী নাম 'মহাপথ'। অনুমান করি, মহাবীথি আর মহাপথ একই কথা। বীর সেই ব্যক্তিই, যে মহাবীথি ধরে চলতে পারে। সুষুম্নার পথ দিয়ে যাওয়া সত্যিই বীরের কাজ। সাধারণ মানুষ এ পথে চলতে পারে না। সুষুম্নার পথ দিয়ে প্রবহমান প্রাণধারা সুষুম্নার কোণে যে শক্তি আছে তাকে সংগ্রহ করে নেয় ও অধিকতর শক্তিশালী হয়ে যায়। প্রাণধারার এই দুটি পথ—একটি অগ্রগামী বা বাইরের, অপরটি পৃষ্ঠরজ্জুগামী বা ভেতরের।

যে সাধক প্রাণায়াম করে, প্রাণবায়ুর মর্ম বোঝে, সেই সাধক প্রাণবায়ুকে উত্তেজিত করতে পারে। আবার কুম্ভক করে সুষুম্না মার্গে ধাক্কা লাগায়, আর প্রাণকে ওপরে নিয়ে যায়। প্রাণ যতই জ্ঞান-কেন্দ্র পর্যন্ত, সহস্রার পর্যন্ত পৌঁছয়, ততই আমাদের বৌদ্ধিক ও আন্তরিক বিকাশ হয়। প্রাণধারা যদি মনের সঙ্গে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তবে ভাবাবেগ আর কামনা-বাসনায় আমরা ভরে উঠি। প্রাণ আর মনের সম্বন্ধ অতি গভীর। প্রাণধারা নিম্নগামী হলে মনও নিম্নগামী হয়, প্রাণধারা ঊর্ধ্বগামী হলে মনও ঊর্ধ্বগামী হয়। আবার মন নিম্নগামী হলে প্রাণধারাও নিম্নগামী হয়, মন ঊর্ধ্বগামী হলে প্রাণধারাও ঊর্ধ্বগামী হয়। এজন্য মন ও প্রাণ উভয়কেই ঊর্ধ্বগামী অবস্থায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

১৮

আহার অনাহার

আমাদের জীবনের সকল কর্ম-প্রবৃত্তির আধারই হল শরীর, আর শরীরের আধার—আহার বা ভোজন। আহার ছাড়া শরীর চলে না, আবার শরীর ছাড়া কর্ম-প্রবৃত্তি হয় না। এই যে আঙ্গুল হেলাচ্ছি, এ কাজও আহার ছাড়া সম্ভব হয় না। আহার গ্রহণ না করে চিন্তা করা যায় না, কথা বলা যায় না, শ্বাস নেওয়া যায় না। আপনারা মনে করবেন না যে, পাঁচ ঘণ্টা আগে আমি যে আহার করেছিলাম তারই শক্তিতে এখন আঙ্গুল নাড়ছি। এখন যদি আঙ্গুল হেলাই, বুঝতে হবে এখনই আহার পেয়ে সে কাজ করতে পারছি। এখন যে আমি কথা বলে যাচ্ছি, তা সঙ্গে সঙ্গে আহার পাচ্ছি বলেই বলতে পারছি। এখন যে আমি চিন্তা করছি, তা সঙ্গে সঙ্গে আহার পাচ্ছি বলেই করতে পারছি। শরীরের প্রবৃত্তি যে ক্ষণে হয়, তার পূর্বক্ষণেই আমাদের আহার নিতে হয়। আহার নেওয়ার পরেই আমাদের প্রবৃত্তি হতে পারে। 'আহার' শব্দের অর্থ—বাইরে থেকে নেওয়া। বাইরে থেকে কিছু না নিয়ে কোন প্রবৃত্তিই হতে পারে না।

গৌতম মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভন্তে! এক সমর্থ মুনি আছেন। তিনি বৈক্রিয় রূপ নির্মাণ করেন। বৈক্রিয় শক্তির প্রয়োগ

করেন। তিনি নিজের থেকেই নানা রূপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি কি আহার না নিয়ে, পুদ্গল গ্রহণ না করে, এসব করতে পারেন?

মহাবীর বললেন—গৌতম! তুমি খুবই শক্তিশালী, কিন্তু বাহ্য পুদ্গল না নিয়ে তিনি এসব করতে পারেন না। তিনি বাইরে থেকে আহার নিয়েই এসব করছেন।

আমি স্বীকার করি আপনারা আহার সম্বন্ধে আমার এসব কথা পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না। না পারার কারণও আছে। আমাদের মুখ দিয়ে খাওয়া হয় যে খাদ্য তাকেই কেবল আমরা আহার বলে মানি, অন্য কোন আহার আমাদের আহার বলেই মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অন্য রকম। মুখ দিয়ে খাওয়া হয় যে পদার্থ তা আমাদের বহু শক্তি দেয়, তার থেকে অধিক শক্তি দেয় অন্য অনেক তত্ত্ব, যা আমরা আহার রূপেই গ্রহণ করে থাকি। আহারের অর্থ—খেয়ে চেটে খেয়ে, আহরণ করে খেয়ে আমরা মুখ দিয়ে নিই। কিন্তু কতবার? সাধারণত দুবার, আর খুব বেশি হলে দশ-বিশ বার। কিন্তু এ সবই ভুল কথা। সূক্ষ্ম তত্ত্ব এই যে, আমরা প্রতিক্ষণই আহার নিয়ে থাকি, আর ঐ আহার ছাড়া আমাদের জীবন চলে না। জৈন পরিভাষায় এই আহারের সংজ্ঞা—'লোম আহার'। যে আহার মুখ দিয়ে নেওয়া হয় তা 'কবল আহার', আর যে আহার শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়ে নেওয়া হয় তা 'লোম আহার'। বাস্তবিক পক্ষে, এই দ্বিতীয় প্রকারের আহারই আমাদের জীবনের আধারভূত আহার। এই আহার ছাড়া জীবন চলে না। মুখ দিয়ে কিছু না খেয়েও আমরা ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বৎসর বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু 'লোম আহার' ছাড়া বেঁচে থাকতে পারব না।

প্রথম আহার 'কবল আহার', দ্বিতীয় আহার 'লোম আহার'। আবার তৃতীয় প্রকারের আহারও আছে, তাকে বলে 'মনো আহার' বা 'মানসিক আহার'। এই আহারের জন্য শরীরের প্রয়োজন নেই, কবল বা গ্রাসের প্রয়োজন নেই, রোমেরও প্রয়োজন নেই। মন সংকল্প করা

হল, আর অমনি পূর্ণ আহার হয়ে গেল। এই হল মনোভক্ষী আহার, মানসিক আহার। সুতরাং আহাব হল তিন রকমের—কবল আহাব, রোম আহার আব মনো আহাব। সমগ্র আহার আমাদের শরীরকে নতুন স্বরূপ প্রদান করবে, আর আমাদের আহার সম্বন্ধে স্থূল ধাবণা দূর করবে। আজ আহার বিষয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে। তার ফলে মানুষ অনেক অস্বস্তিতে ভুগছে। কাবণ, সবাই বুঝে নিয়েছে যে, মুখ দিয়ে যা খাওয়া হয় তা শরীর ধাবণের পক্ষে পর্যাপ্ত। এই পর্যাপ্ততার ধারণা কিন্তু ভুল। আজ 'সংতুলিত আহার' অর্থাৎ সুষম বা সুসমঞ্জস আহার, কথাটি বহুল প্রচলিত। সংতুলিত আহাবের অর্থ, —সেই আহার, যাতে সব তত্ত্বই সংতুলিত মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। আহারশাস্ত্রবিদের এই অভিমত। যোগশাস্ত্রজ্ঞদের অভিমত কিন্তু ভিন্ন। তাঁদের মতে সংতুলিত আহাব তাকেই বলা যায়, যাতে এই চারটি তত্ত্বই পাওয়া যায়—যথা, খাদ্য, তেল, বায়ু আর প্রকাশ অর্থাৎ সূর্যেব তাপ। শবীবশাস্ত্রীরা যে সংতুলিত আহারেব কথা বলেন তার পবিধিব মধ্যে আছে শুধু খাদ্য আর তেল, অর্থাৎ চাবটি তত্ত্বেব মধ্যে তাতে আছে প্রথম দুটি তত্ত্ব, কিন্তু শেষ দুটি তত্ত্ব নেই। আমি বলব সেই আহার সংতুলিত হতে পারে না, যাতে বায়ু আর প্রকাশের (রৌদ্রের) কোন স্থান নেই। আপনারা প্রশ্ন করতে পাবেন, খাদ্য আর তেলেই তো ক্ষুধাব উপশম হয়, জঠবাগ্নি শান্ত হয়, তবে বায়ু আর রৌদ্রের প্রযোজন কি? ওগুলি দিয়ে কি পেট ভরবে? আর যদি ওগুলিতেই পেট ভরে, তবে তো বিশ্বেব সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, আজকের সব অভাবই মিটে গেল। কথাটা ঠিকই বটে। আমি এমন বলব না যে, আপনাবা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করুন ওগুলিতে পেট ভরে। তবে আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে আমার সব কথা শোনার পরে আপনাবা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এগুলিতেও পেট সত্যিই ভরে।

আমি প্রথমে রৌদ্রের কথা বলছি। রৌদ্র বা প্রকাশ আমরা

সূর্যের কাছ থেকে পাই। আমাদের শরীরের ভিটামিন 'ডি'-র বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এই ভিটামিন 'ডি' সূর্যের রশ্মি থেকে যত ভালভাবে পাওয়া যায় অন্য কোন উৎস থেকে তত ভালভাবে পাওয়া যায় না। আমাদের শরীরের চামড়ার আশপাশে এমন এক দ্রব্য থাকে যার ওপরে সূর্যের রশ্মি পড়লেই ভিটামিন 'ডি' স্বতই উৎপন্ন হয়। সূর্যের রশ্মি ভিটামিন 'ডি'-র পূর্তি করে। শরীরের ওপর পতিত সূর্যের রশ্মি ক্যালসিয়ম ও ফসফরাসেরও পূর্তি করে। এই দুটি দ্রব্যই শরীরের পক্ষে আবশ্যক। প্রাকৃতিক চিকিৎসাশাস্ত্রের এই অভিমত যে, মানুষের প্রতিদিন কিছু সময় জঙ্গলে গিয়ে বস্ত্রহীন হয়ে থাকা উচিত, নগ্ন হয়ে ঘোরা উচিত ও সূর্যের তাপ সেবন করা উচিত। এতে শরীরের অনেক অভাব পূর্ণ হয়। সাধনার ক্রম অনুসারে নগ্নতার স্থান ছিল, নগ্নতা অনাবশ্যক ছিল না বা মূর্খতার পরিচায়ক ছিল না। নগ্নতা খুবই আবশ্যক ছিল, এবং অনেক বিচার-বিবেচনা করেই তার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল। শারীরিক আর মানসিক সাধনার দিক থেকে নগ্ন থাকায় যে লাভ হতো, সবস্ত্র থাকায় সে লাভ হতো না। উত্তরাধ্যায়ন সূত্রে স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে, নগ্নতা (প্রতিরূপতা) থেকে লঘুতা হয়, লঘুতা থেকে অপ্রমাদ, জিতেন্দ্রিয়তা, বিপুলতপঃ প্রভৃতি লাভ হয়।

এখন শারীরিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিষয়টি বিবেচনা করি। নির্বস্ত্র থাকলে সূর্যকিরণ আমার সারা শরীরে পড়তে পারে। ঐ রৌদ্র আমার আহারের পূর্তি করে। বিজ্ঞানেরও এই অভিমত। রৌদ্র খাদ্যের পূরক তত্ত্ব। যে ব্যক্তি আতাপনা নেয়, রৌদ্র সেবন করে, তার আহারের মাত্রাও কমে যায়। আতাপনা সম্বন্ধে যত তথ্য জৈন সাহিত্যে পাওয়া যায় অন্যত্র তা পাওয়া যায় না। ঐ সাহিত্যে বলা হয়েছে, যে আতাপনা নেয় তার আহারের মাত্রা—আহারের আবশ্যকতা কমে যায়। সে অধিক ভোজন করতেই পারে না, কারণ তার আহারের অনেক আবশ্যকতাই রৌদ্র থেকে মিটে যায়। আতাপনার

মূল্য কত, আতাপনার মূল্য কত গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা ভুলেই গিয়েছি। আজকের আহারশাস্ত্রবিদেরাও স্বীকার করেন, যে ব্যক্তি রৌদ্র ও বায়ু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে, সে জেনেশুনে বিপদ ডেকে আনে। তাঁরা বলেন—জঙ্গলে চলে যাও, সমস্ত কাপড় ফেলে দাও, নেংটি রাখারও প্রয়োজন নেই। মাটির ওপর শুয়ে পড়, শরীর যদি রৌদ্রে জ্বলে যায়, জ্বলতে দাও—কোন ক্ষতি হবে না। যদি জ্বলন থেকে বাঁচতে চাও তো শরীরের ওপর একটা পাতলা কাপড়ের আবরণ রাখ। এই হল আতাপনার ক্রিয়া। একে হঠযোগের ক্রিয়া মনে করা মূর্খতা। এটা জীবনধারণের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া।

এখন আমি বায়ু সম্বন্ধে বিচার করব আমরা যা খাই, তাতে প্রাণবায়ুর যোগ না থাকলে তার মূল্য কম হয়ে যায়। যে পুরোমাত্রায় প্রাণবায়ু নেয় না, তার বেশি মাত্রায় আহার নেওয়ার আবশ্যক হয়। যে পুরোমাত্রায় প্রাণবায়ু গ্রহণ করে, তার আহারের মাত্রা কমে যায়।

যদি এই বিষয় সম্বন্ধে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারি যে, আমাদের শরীরে প্রধানত চারটি তত্ত্ব আছে—পৃথ্বী, জল, অগ্নি আর বায়ু। শরীরের এই চারটিরই প্রয়োজন আছে। এগুলি ঠিকমত যোগাতে হবে। খনিজ দ্রব্যের রূপে পৃথ্বীতত্ত্বের প্রয়োজন হয়। আমাদের শরীরের জন্য লৌহ আবশ্যক, সীসা আবশ্যক, রৌপ্য আবশ্যক, স্বর্ণ আবশ্যক—অনেক ধাতুই আবশ্যক। আমরা দুধ পান করি—দুধের মধ্যে অভ্র আছে। আমরা জিরা খাই—জিরার মধ্যে লৌহ আছে। মাতৃদুগ্ধে উৎকৃষ্ট রৌপ্য থাকে। আমরা শাকসব্জি খাই, তাতে অনেক মূল্যবান খনিজ থাকে। মানুষ স্বর্ণভস্ম, রজতভস্ম, লৌহ ভস্ম ইত্যাদি ঔষধ রূপে গ্রহণ করে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ উপযোগী হয় না, তার বেশিরভাগই বৃথা চলে যায়। সেজন্য বলা হয়, প্রয়োজনীয় খনিজগুলি ভস্মরূপে না নিয়ে স্বাভাবিক আহার থেকে নেওয়ার চেষ্টা কর। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে এসেছে। যেমন খনি থেকে পাওয়া খনিজ আমাদের দেহের সঙ্গে একরস হয় না, তেমনি গাছপালা

থেকে পাওয়া খনিজও পুরোপুরি একরস হয় না। এর থেকে যদি আমরা মানসিক আহার রূপে, কেবল মানসিক সংকল্পের দ্বারা, কোন দ্রব্য বিকশিত করে নিতে পারি, তবে তা সহজেই আমাদের সঙ্গে একরস হয়ে যায়। এই তথ্য প্রয়োগ করে দেখতে হয়, তবে প্রয়োগ দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ হতে পারে। মনোভঙ্গী আহারের ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই সূক্ষ্ম। তবে সংকল্পের দ্বারা বিকশিত করার শক্তি অর্জন করতে পারলে আমরা মন থেকেই অনেক তত্ত্বের পূরণ করতে পারি। মনের দ্বারা পূরণ করা যদি কঠিন হয়, তবে আমরা সহজতর পথে বায়ুর দ্বারা পূর্তি করার চেষ্টা করব।

ভগবতী সূত্রে বলা হয়েছে, মানুষ ছয় দিক থেকে আহার গ্রহণ করে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্ধ্ব আর অধঃ—এই ছয় দিক থেকেই মানুষ আহার পায়। আজ একথা কেবল পাঠের বিষয়রূপে গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ আছে। অনুসন্ধান আর চর্চার অভাবে আমরা এ কথার অর্থ আজ বুঝতে পারি না। কেন, আমরা কি পায়ের দিক থেকেও আহার সংগ্রহ করি না? নিশ্চয়ই করি। বলা হয়েছে—যখন হেঁটে বেড়াবে, খালি পায়ে হাঁট। আবার সড়ক দিয়ে হেঁট না, মাটির ওপর হাঁট। যদি সড়ক—বিশেষত পাকা সড়ক—আর জুতো দিয়ে ব্যবধান রচনা কর, তবে পৃথ্বী থেকে সাক্ষাৎ যে আহার মেলে, তা আর পাবে না। খালি পায়ে মাটির ওপর ঘুরে বেড়ালে পৃথ্বী থেকে সমস্ত তত্ত্ব টেনে নেওয়া যায়। আমরা নিজেদের মাথাকেও কাজে লাগাতে পারি। সৌর মণ্ডল থেকে প্রাণশক্তির উত্তেজক যে তত্ত্বটি বিকীর্ণ হচ্ছে তা আমরা মাথা দিয়ে দেহের মধ্যে টেনে নিতে পারি। এর থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, কোন্ কোন্ দিকে মাথা রেখে শুলে কি কি লাভ হয়—এই সম্বন্ধে যে তথ্য প্রচলিত আছে, তার মধ্যেও সারবত্তা আছে। এতদিন তো আমরা এই তথ্যকে কেবল লোক-প্রসিদ্ধি বা অন্ধানুকরণ বলে মনে করেছি। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পরে এই তথ্য সত্য বলে নির্ণীত হয়েছে। ফরাসী ডাক্তার শোয়ার খাটের মাথার

দিক পরিবর্তন করে অনেক রোগীর চিকিৎসা করেছেন এবং এই পদ্ধতিতে রোগমুক্তি করতে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছেন। এর বৈজ্ঞানিক কারণও আছে। সৌরমণ্ডল থেকে যে প্রবাহ আসছে তা আমার মাথাকে আকর্ষণ করে ও নিজের দিকে টেনে নেয়। যে প্রবাহের দিকে মাথা থাকে, সেই প্রবাহের তত্ত্বই মাথার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এজন্য এই পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

আহারের অর্থ কেবল খাওয়াই নয়। প্রকৃত অর্থ নেওয়া, টেনে নেওয়া, আহরণ করে নেওয়া। মুখ দিয়ে, পা দিয়ে, নাক দিয়ে, মাথা দিয়ে, পা দিয়ে, চাই কি সারা শরীর দিয়ে আমরা যা কিছু বাইরে থেকে গ্রহণ করছি, তা সবই আহার।

এভাবে আমরা ওপর থেকে, নিচ থেকে, আশপাশ থেকে, ডাইনে থেকে, বাঁয়ে থেকে আহার নিয়ে থাকি। আমরা সব দিক থেকেই, সব বিদিক থেকেই, আহার নিয়ে থাকি। বায়ুর আহার আমরা বায়ুর মাধ্যমেই পাই। বায়ু থেকে লভ্য আহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখব যে, গাছপালা আহার করে আমরা যে তত্ত্ব সংগ্রহ করি কেবল বায়ুর থেকেই তা আমরা লাভ করতে পারি। কারণ বায়ুমণ্ডলে সব তত্ত্বের পরমাণুই জমা আছে।

আরও দুটি বিষয় আছে। বিষয় দুটি অবশ্য সংতুলিত আহারের শ্রেণীতে পড়ে না, কিন্তু ঐ আহারের পরিপূরক হিসেবে তাদের উল্লেখ করা আবশ্যক। বিষয় দুটি—উপবাস আর মানসিক প্রসন্নতা। এদের বাদ দিলে, আহার অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। আপনারা আহার করবেন অথচ উপবাস করবেন না, অনাহারে থাকা অভ্যাস করবেন না—সে ক্ষেত্রে আহার কষ্টের কারণ হতে পারে, জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। আমরা আহার করলাম ক্ষুধার সমস্যা সমাধান করার জন্য, অথচ সেই আহার থেকে অনেক সমস্যার উৎপত্তি হল। যে লোক কেবল আহার করে, উপবাস করে না, সে উপবাসের মর্ম বুঝতে পারে না। ফলে সে আহারজনিত সমস্যার প্রতিকার করতে পারে না। প্রকৃত

তথ্য এই যে, আহারের সঙ্গে অনাহারের ও উপবাসের যোগ একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে উপবাসের অর্থ একেবারে না খাওয়াও হতে পারে, আবার আহারের মাত্রা কমিয়ে দেওয়াও হতে পারে।

আহারের সময় মনকে চিন্তামুক্ত রাখলে পাচন ক্রিয়া ভাল হয়। প্রসন্নতার অর্থ হর্ষ নয়। শোক যেমন একটা আবেশ, হর্ষও তেমনি এক আবেশ। প্রসন্নতা আবেশ নয়। প্রসন্নতা চিত্তের নির্মলতা। যেমন প্রসন্ন আকাশের অর্থ নির্মল আকাশ, মেঘ-মুক্ত আকাশ। যে চিত্ত হর্ষ, ভয়, শোক প্রভৃতি আবেশের দ্বারা আক্রান্ত নয়, সেই চিত্ত প্রসন্ন। সেই চিত্তের বৃত্তিগুলি শান্ত। যে আহার করছে, তাকে কেবল আহারের কাজেই মগ্ন থাকতে হয়। সে জন্য চিত্তের প্রসন্নতাও ভোজনের এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব।

১৭

ভাবনা

নদীর অপর তট সামনে। এক ব্যক্তি ঐ তটে যেতে চায়। নদী গভীর, অথচ সে সাঁতার জানে না। তাকে অবশ্যই নৌকোয় বসে অপর তটের দিকে যেতে হবে। অপর তটে যাওয়ার সাধন বা উপায় হল—নৌকো। নৌকো ছাড়া সেখানে পৌঁছনো যাবে না। আমরা যে তটে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে সন্তুষ্ট বোধ করছি না। সামনে যে তট দেখতে পাচ্ছি সেখানে যেতে চাই। কিন্তু যাওয়া সহজ নয়, অনেক অসুবিধে আছে। নদী যেমন গভীর তাতে পায়ে হেঁটে আমরা ওপারে যেতে পারব না। আমাদের নৌকো চাই। সেই নৌকোই হল—ভাবনা। ভাবনার সাহায্য নিয়ে, ভাবনার নৌকোয় বসে, দূরে যে তট দেখা যাচ্ছে সেখানে পৌঁছব। এমন তটই থাকতে পারে না যেখানে ভাবনার নৌকোয় চড়ে পৌঁছনো যাবে না। এই হল ভাবনার প্রয়োজন, ভাবনার মহত্ব।

প্রশ্ন এই যে, ভাবনা কি? কোন বিচার বা চিন্তা বারবার মনে আলোড়ন করাই ভাবনা। ধ্যানের তিন অঙ্গ—ধারণা, ধ্যান আর সমাধি। এই হল মহর্ষি পতঞ্জলি-কৃত বিভাগ। আমরা বলি—ভাবনা, ধ্যান আর সমাধি। ধারণা আর ভাবনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ধারণার কাজ হল, মনকে কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা। বিষয়টি তখন ধ্যেয় হয়। ধারণা পুষ্ট হলে ধ্যান হয়ে যায়। ধ্যান পুষ্ট হলে সামাজিক সমাধি হয়ে যায়। একই ধ্যানের—একই বিষয়ের—তিন রূপ হল ঃ প্রথমে এক রূপ, মধ্যে আর এক রূপ ও শেষে আরও এক রূপ। এই হল ধারণা বা ভাবনার স্বরূপ। ভাবনাব অর্থ—সবিষয় ধ্যান। এটাই ভাবনার পাবিভাষিক নাম। যখনই আপনাদের মনে কোন বিষয় উপস্থিত হয়, আপনাবা কোন বস্তুকে ধ্যেয় বলে নির্বাচন করে নেন, তখনই আপনারা সবিষয় ধ্যান করেন—আর তাকেই ভাবনা বলাও যায়। ভাবনা, সবিষয় ধ্যান আর জপ—এগুলির মধ্যে কোন ভেদ নেই, তিনটিই এক। তবে, প্রত্যেকের উপযোগিতা বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। তাৎপর্যের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। জপের অর্থ এই যে, যা জপ্য, যার জপ করা হচ্ছে—সেই জপ্য বস্তুর প্রতি জপকারী ব্যক্তিব তন্ময় ও একাগ্র হয়ে যাওয়া। ভাবনার অর্থ—ভাব্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি তন্ময় ও একাগ্র হয়ে যাওযা। ধারণার অর্থও একই—যার ধারণা করা হচ্ছে তার প্রতি তন্ময় ও একাগ্র হয়ে যাওযা। সবিষয় ধ্যানও তাই। বিষয়ের প্রতি বা ধ্যেযের প্রতি তন্ময় ও একাগ্র হয়ে যাওযাই সবিষয় ধ্যান। জপ, ভাবনা, ধারণা আর সবিষয় ধ্যান—এই চারটি শব্দই একই পর্যায়ের। এদের মধ্যে তাৎপর্যের ভেদ নাই, আছে কেবল নামের ভেদ।

ভাবনা নৌকোর মত। ভগবান মহাবীর বলেছেন—যে ব্যক্তির আত্মা ভাবনা-যোগের দ্বারা বিশুদ্ধ হযেছে, সে যেন জলে নৌকো পেযেছে। যে যখনই চায় ওপাবে পৌঁছতে পারে। এখন, এই নৌকো কি করে ব্যবহার করা যায—এই প্রশ্ন থেকে যায়। ভাবনার দ্বারা ভাবিত হওযা আবশ্যক। আপনারা ভাবিত না হওযা পর্যন্ত সেই স্থিতিতে পৌঁছতে পারবেন না। আগমে 'ভাবিতাত্মা' শব্দটি ব্যবহার করা হযেছে। ভাবিতাত্মা হতে না পারলে লক্ষ্য বস্তুর প্রাপ্তি হয় না। ভাবিতাত্মা হলে পরে, যা হতে হবে তা-ই হওযা যায়।

এ সবই একাগ্রতার বিস্ময়জনক ফল। আমরা যা হতে চাই, তাই ঘটে যায়, মনকে যে রূপে বদলাতে চাই মন সেই রূপেই বদলায়। মন কেবল এক আকারের নয়, তাব অসংখ্য পর্যায় আছে। মন ভিন্ন ভিন্ন আকারে বদলাতে পারে। আমরা যেমন চাই তেমন আকাবই মন গ্রহণ কবতে শুরু করে। এটা মনের নিজস্ব বিশেষত্ব। তন্ময়তা ও একাগ্রতার সঙ্গে আমরা যা ভাবনা কবি তা অবশ্যই হতে থাকে। এ বিষয়ে কখনও অন্যথা হয না। তবে, একাগ্রতা ও স্থিরতার প্রয়োজন। মন যখন বদলায় তখন সঙ্গে সঙ্গে শরীবও বদলায়।

ফবাসী দেশে একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আমেবিকার এক যুবক সেই দেশে এক পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন বাস করেছিল। ঐ পরিবারের সঙ্গে তার গাঢ় সম্পর্ক হল। ঐ পরিবারে এক বয়স্কা কন্যা ছিল, তার সঙ্গে যুবকের প্রণয় হল। কিন্তু বিয়ের প্রশ্ন উঠলে যুবক বলল—'আমি তো এখনই বিয়ে কবতে পারব না। যতদিন আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারি ততদিন পত্নীর ভার বহন করতে পাবব না। আমি আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন হয়ে বিবাহ করব।' কন্যাটি এই কথা মেনে নিল। যুবক আমেরিকায় চলে গেল, যুবতী দেশেই বইল। কিন্তু যুবতীর মনে এক চিন্তা এল, 'পাঁচ-সাত বছর পবে যখন যুবক আমাকে বিয়ে করতে আসবে, তখন হয়ত আমার রূপ ও রঙ বিবর্ণ হযে যাবে, আমার যৌবনে ভাটা পডবে। সে প্রতিদিন ভাবনা আবম্ভ করল। সে এক আয়নার সামনে দাঁড়াত আর চিন্তা করত—'আমি আজ যেমন আছি, তেমনি থাকব।' এই ভাবনায় সে তন্ময় হয়ে যেত। এইভাবে পনের বছর কেটে গেল। এদিকে যুবক নিজের পাযে দাঁড়াল, তার আর্থিক অবস্থা ভাল হল। সে আত্মনির্ভর হয়ে গেল। তার মনে যুবতীর স্মৃতি অনুক্ষণ জাগ্রত ছিল। সে ফরাসী দেশে চলে এল। কিন্তু অন্য অনেক রকম চিন্তাও তার মনে এল। সে ভাবল, যুবতীর অবস্থা কেমন হবে? সে কেমন আছে? তার রূপ-যৌবনই

বা কেমন? যা হোক, সে যুবতীব সঙ্গে মিলিত হল। সে দেখল তার শবীরেব লাবণ্য, তাব সৌন্দর্য ও কমনীয়তা, পনের বছব আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। তিলমাত্র পার্থক্যও হয় নি। সে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হল। দুজনেই সুখী হল। এই হল ভাবনার আশ্চর্যজনক ক্ষমতার এক উদাহরণ।

একেই ভাবনা-যোগ বলে। যে ব্যক্তি যে প্রকার ভাবনায় নিজেকে ভাবিত কবে, সে সেই প্রকারেই পরিবর্তিত হযে যায। ভাবনার এই রকম কত প্রয়োগই যে পৃথিবীতে হয়ে থাকে, তা কে জানে। জৈন পবম্পরায় ভাবনা-যোগকে বিশেষ মহত্ত্ব দেওয়া হযেছে। আপনারা তাব আধ্যাত্মিক মূল্য দেবেন কি না দেবেন আপনারাই জানেন, কিন্তু এই তথ্য স্পষ্ট যে ভাবনাকে আশ্রয় কবে মানুষ নিজেকে গড়তে ও ভাঙ্গতে পাবে।

জাপানের ধ্যান সম্প্রদায় (জেন সম্প্রদায) ভাবনার অনেক রকম প্রয়োগ করে। তাদেব কেউ হযতো আখডায নেমে ভযঙ্কব নিষ্ঠুর ষাঁড়েব সঙ্গে লডাই কবে। সে খালি হাতে আখড়ায় নামে। তার কাছে কোন অস্ত্রই থাকে না, লাঠি পর্যন্ত থাকে না। ষাঁড় দৌড়ে সামনে এসে যায। সে তাকে লাল নিশান দেখায়। লাল কাপড় দেখলেই ষাঁড় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হযে যায। সে তখন অতি বেগে তার দিকে ছুটে যায় ও তাকে ভয়ঙ্কর আক্রমণ কবে। কিন্তু নিতান্ত কৃশকায সাধকও ভাবনা ও সংকল্পের শক্তিতে সেই ষাঁড়কে পবাস্ত করে মাটিতে আছাড় দিযে ফেলে দেয়। তার ভাবনাব রূপ হয় এ রকম—'আমি ষাঁডের সঙ্গে লডব। আমি নিশ্চযই ষাঁড়কে পবাস্ত করব।' এই ভাবনার সাহায্যে সে এমন শক্তি অর্জন কবে যে, সে ঐ ভযঙ্কর, উত্তেজিত আক্রমণকারী ষাঁড়কে শান্ত করে দেয়, যেন তাকে ছাগল বানিযে দেয। ভাবনার এ রকম প্রযোগ আজও হযে থাকে। কেবল অতীতেই হযত হতো, একথা ঠিক নয। আজও কিছু লোক এ রকম প্রয়োগ করে থাকে।

এক মঠ ছিল। সেই মঠে ছোট বড় অনেক সাধক সাধনাব অভ্যাস করত। সেখানে এক মল্লযুদ্ধের (কুস্তিব) আযোজন করা হল। দুই পালোয়ানকে আমন্ত্রণ করা হল। তাদের একজন ছিল পুষ্ট ও বলিষ্ঠ, অপব জন কম শক্তিশালী। মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। বলিষ্ঠ পালোয়ান কম-জোবী পালোযানকে চিৎ করে দিল। সাধকদেব মনে এক চিন্তার উদয় হল। তারা দুর্বল পালোয়ানকে সাহায্য করতে ইচ্ছা করল। কযজন সাধক চোখ বন্ধ করে এই ভাবনায তন্ময় হয়ে গেল যে, এই পালোয়ানের জয় চাই। কিছু সময় গেল। সকলে দেখতে পেল, দুর্বল পালোয়ান বলিষ্ঠ পালোয়ানকে মাটিতে ফেলে দিল ও তার বুকে চেপে বসল।

ভাবনা অন্য ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছতে পাবে, অন্য ব্যক্তির ওপবেও প্রভাব বিস্তার করতে পাবে। অপরের বিপদের শান্তি আনা ও রোগেব প্রতিকার করা, অপরের হৃদয়েব পরিবর্তন কবা বা চিন্তাধাবার পরিবর্তন করা—এ সবই ভাবনার প্রয়োগ। ভাবনার দ্বারা এ সবই কবা যায। ভাবনার মাধ্যমে নিজেব পবিবর্তন, অন্যের পবিবর্তন, আশপাশের ব্যক্তির পরিবর্তন, এমন কি সমস্ত বাতাববণেব পরিবর্তন করা সম্ভব। এক ব্যক্তির শরীব দুর্বল, তাব শবীর সুস্থ করার জন্য ভাবনা কবা যায়। এক ব্যক্তির মস্তিষ্ক দুর্বল, তার মস্তিষ্ক সবল করার জন্য ভাবনা করা যায। এক ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষীণ, হৃদয় দুর্বল, চিন্তা অপবিত্র—তার সব কিছু সুস্থ ও স্বাভাবিক করার জন্য ভাবনা করা যায়। অসংখ্য প্রকারের ভাবনা হতে পারে। আজকের চিকিৎসকবা—বিশেষত জার্মান দেশের চিকিৎসকবা—রোগীকে ঔষধ না দিয়ে 'অটো সাজেসন' (Auto suggestion) দ্বাবা আবোগ্য করতে চেষ্টা করেন। তাঁবা বলেন—'জঙ্গলে চলে যাও। সেখানে এক গাছের নিচে বসে সমাধিস্থ হয়ে যাও, আব নিজেকে বোঝাও—আমি সুস্থ আছি, আমি সুস্থ হযে যাচ্ছি।' এই চিকিৎসকরা মনে করেন, এই পদ্ধতিতে রোগী রোগমুক্ত হয়ে স্বাস্থ্য ফিবে পায।

এ সবই সামান্য কথা। যখন আমরা সাধনার দৃষ্টিতে বিচার কবি তখন আমবা বুঝতে পারি যে, কি প্রকার ভাবনা আমাদের কবতে হবে —তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

জৈন পরম্পরায ভাবনা সম্বন্ধে অনেক বিচাব করা হযেছে। সব ধর্মেই ভাবনা সম্বন্ধে বিচার করা হয়েছে, তবে জৈন সাহিত্যে এই বিষয়ের উল্লেখ অনেক বেশি। ভাবনা প্রধানত এই চাব প্রকাবের—

১। জ্ঞান ভাবনা।
২। চারিত্র ভাবনা।
৩। তপ ভাবনা।
৪। বৈবাগ্য ভাবনা।

যে ব্যক্তি সাধনাব ক্ষেত্রে প্রবেশ কবছে, তাকে সবার আগে জ্ঞান ভাবনার দ্বারা নিজেকে ভাবিত করতে হয়। ভাবনার অর্থ বিচাব বা চিন্তার পুনবাবৃত্তি নয়, বিচাবেব স্থাপন ও দৃঢ়ীকবণই ভাবনার অর্থ। অভ্যাসকালে বিচারকে পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করতে হয। বিচারের পুনবাবৃত্তি আব বিচারের স্থিরীকবণ—এই দুটি ব্যাপারেবই আবশ্যকতা আছে। যদি আপনারা একই বিষযের বাব বার আবৃত্তি করেন, তবে তা ভাবনায় পরিণত হয়। আপনি তার দ্বারা ভাবিত হবেন, আর ঠিক তদনুসারে কাজ কববেন। এক ব্যক্তি দিনে দশ-পনবো বাব দরজা খোলে আর বন্ধ কবে। ফলে সে ঐ ক্রিযাব দ্বারা ভাবিত হয়ে যায়, প্রভাবিত হয়ে যায়। যখনই সে ঘরে প্রবেশ করে তখনই—দবকাব থাকুক বা না থাকুক—তার মন ঐ ক্রিয়ার দিকেই হয। সে দরজা খুলুক বা না খুলুক, তার স্মৃতি কিন্তু ঐ ক্রিযাতেই সংলগ্ন হয়। কারণ সে ঐ ক্রিয়ার দ্বারা ভাবিত হয়েছে। দু ভাবেই ব্যক্তি প্রভাবিত হতে পাবে, বিচার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, আবার কার্যের দ্বারাও প্রভাবিত হতে পাবে। বিচার ও কার্যের পুনরাবৃত্তি—এই দুটি ভাবনার মূল।

প্রশ্ন উঠবে, ভাবনার দ্বারা আমরা কি করে আমাদেব পরিবর্তন

করব ? প্রক্রিয়া 'এই প্রকাব—আপনাব প্রথমে ধ্যেয় কি, তা নির্বাচন করুন। আপনারা স্থির করুন আপনারা কি হতে চান বা কি করতে চান। আপনারা কবি হতে চান, কি দার্শনিক হতে চান, কি লেখক হতে চান, কি সাহিত্যিক হতে চান—যা চান তাই হতে পারেন। যা আপনাদের হতে হবে তা-ই আপনাদের ধ্যেয়। এবার, যাকে ধ্যেয করেছেন তাকে বাস্তবে পরিণত কবার জন্য আপনাবা ভাবনা অভ্যাস করুন। প্রশ্ন করতে পারেন, অভ্যাস কখন করব, কেমন কবে কবব ? আপনাবা নির্জন স্থানে চলে যান। শরীবকে শিথিল করে বসুন, মনকেও শিথিল করুন। মনে কোন উত্তেজনা বাখবেন না, আকুল-ব্যাকুল হবেন না। এটা প্রারম্ভিক স্থিতি মাত্র, কিন্তু এটা প্রয়োজন। যা আপনারা ধ্যেয় বলে পছন্দ করেছেন তাকে স্থূল মন থেকে হটিয়ে অবচেতন মনে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত আপনাদের 'হওয়ার' ভাবনা সফল হবে না। আপনারা বলতে পাবেন—'ঐ রকম ভাবনা তো অনেক করেছি, কিন্তু সফল হই নি।' অসফলতার কারণ, আপনাদের কোথাও বোঝার ভুল হয়েছে। ভাবনার তাৎপর্য হল, চেতন মনকে ভুলিয়ে দিযে অবচেতন মনকে জাগ্রত করা। চেতন মনের চিন্তাকে অবচেতন মনের কাছে গচ্ছিত রেখে অবচেতন মনেই তাকে স্থাপন করে দেওয়া—এই হল ভাবনা, ভাবনার অভ্যাস। তা দিন আপনাদের কথা অবচেতন মন পর্যন্ত পৌঁছবে না, ততদিন হাজার-দশ হাজাব বার প্রযত্ন করলেও, শব্দের আবৃত্তি করলেও, সফলতা মিলবে না। সফলতা লাভ করতে হলে আপনাদের শরীরকে বিসর্জন দিতে হবে, অর্থাৎ শরীরকে একেবারে শিথিল করে দিতে হবে ও চেতন মনকে শান্ত করতে হবে। তাব পবে আপনাবা ধ্যেয়ের আবৃত্তি করতে থাকুন—প্রথমে কিছুটা নিম্ন কণ্ঠে, পরে উচ্চ-কণ্ঠে আবৃত্তি করুন। এই ক্রম দশ মিনিট ধবে চলবে। তার চেযে কম সমযে সফলতা অসম্ভব। প্রতিদিন এই ক্রম অনুসারে আবৃত্তি করুন। স্মরণ রাখবেন, কখনও

যেন ক্রমভঙ্গ না হয়। আপনারা ধ্যেযকে অনুসরণ কবে আচবণ করুন। নিশ্চিতভাবেই আপনাবা লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। ক্ষেত্র বিশেষে সময় কম বা বেশি লাগতে পারে, কিন্তু লক্ষ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত। কোন ব্যক্তিই ভাবনা ছাড়া প্রকৃত ধার্মিক হতে পাবে না, ধ্যানের উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে না। শারীবিক, বৌদ্ধিক, মানসিক প্রভৃতি সর্ববিধ বিকাশের ক্ষেত্রে ভাবনার সর্বাধিক মহত্ত্ব আছে।

যে কোন লক্ষ্য পূবণ কবতেই অনেক বকম উপক্রম করতে হব। মনে করুন, আমরা নির্মোহ হতে চাই। এই লক্ষ্য পূরণ কবতে হলে আমাদের সব মোহজনক বস্তুকে ছাডতে হবে। যে বস্তু মোহ উৎপন্ন কবে, মনকে মূঢ় করে, তাকে সবিযে দিতে হবে। ধ্যেয়ের অর্থই হল ভাবনা।

২০

অধ্যাত্মের সাধনা

এক ব্যক্তি বিচারকের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—'সত্য কি? ভ্রান্তিই বা কি?' বিচারক উত্তর দিলেন—'আমি যা বলি তাই ভ্রান্তি। তুমি যে তা মান না, সেটাই সত্য।'

আমরা সংসারে সত্য আর ভ্রান্তির চক্রে পড়ে পাছি। ধর্মের সকল পথই সত্যকে খোঁজার জন্য। আদিকাল থেকে মানুষ সত্যের খোঁজ করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্তিও চলেছে। ঐ রকমই চলবে। ভ্রান্তি যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলত তবে ধর্মের আজ কোন অপেক্ষাই থাকত না। কিন্তু যেমন যেমন ধর্মের বিস্তার হয়েছে, তেমন তেমন ভ্রান্তিরও বিস্তার হয়েছে। সত্যকে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যেই আমরা ধর্ম আর অধ্যাত্মের চর্চা করি। মানুষ সোনার মূল্য করতে পারে, কিন্তু মাটির মূল্য করতে পারে না। কারণ মাটি এত সহজলভ্য যে প্রত্যেক ব্যক্তি তা অনায়াসে পেতে পারে। তবে প্রকৃত সত্য এই যে, সোনার তুলনায় মাটির মূল্য হাজার গুণ বেশি। সোনা মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে, মাটি যে কত মৃত্যুপথযাত্রীকে রক্ষা করেছে তা কে জানে। তবুও মাটির মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, কারণ মাটি সহজেই সুলভ। আমরা রুটির মূল্যাঙ্কন করি, কারণ আমরা জানি

স্ফূর্তি আমাদের জীবন। পরন্তু যে প্রাণ সত্যই আমাদের জীবন তার মূল্যাঙ্কন আমরা কখনও করি না। অথচ প্রাণই আমাদের সকল স্বাস্থ্য। সাধনার পদ্ধতি মূল্যাঙ্কনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মতভেদের প্রশ্ন থাকে সেখানে হাজার সম্প্রদায় গড়ে ওঠে. লোকে বলে, এত সম্প্রদায় না থাকুক। আমি এই ভাবে চিন্তা করি যে, হাজার সম্প্রদায়ই হোক—প্রত্যেক ব্যক্তির একটা সম্প্রদায় হোক। কেবল অধ্যাত্মই এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে সম্প্রদায় ভেদ হয় না। সাধনা আর অধ্যাত্মের ক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায়-ভেদ নেই। সাধনার পথে সবচেয়ে বড় যোগ হল ধ্যান। ধ্যানের অর্থই নির্বিকল্পতা, যেখানে কোন বিকল্প নেই, বিবাদ নেই। এখানে মতবাদের প্রশ্নই ওঠে না। সাধনায় মুখ বন্ধ হয়ে যায়, কান বন্ধ হয়ে যায়, চোখ বন্ধ হয়ে যায়—সে ক্ষেত্রে বিবাদের প্রশ্ন উঠবে কি করে? আমাদের যে নৈতিকতার পুঁজি আছে তার প্রকৃত পশ্চাৎপট—অধ্যাত্ম। অধ্যাত্মের আধারেই নৈতিকতা বিকশিত হতে পারে। আজ আমাদের সমস্ত ধ্যানই শরীর-কেন্দ্রিত হয়ে গিয়েছে। মন কিন্তু মূল। অথচ সেই মনকে আমরা উপেক্ষা করে চলেছি। মনই সেই তত্ত্ব, যা আমাদের সব-চেয়ে বেশি প্রভাবিত করে।

একদিন মহাত্মা বুদ্ধ ভ্রমণ করছিলেন। সঙ্গে এক শিষ্য ছিল। সে প্রশ্ন করল—'ভন্তে! ধ্যানের শক্তি কি, আমি জানতে ইচ্ছা করি।' বুদ্ধ শুনলেন. কিন্তু উত্তর দিলেন না। পথে এক কুয়ো পড়ল। এক পিপাসার্ত পথিক সেখানে এল। কুয়োর পাশে দড়ি-বাঁধা এক বালতি ছিল। পথিক বালতিটি কুয়োয় নামিয়ে দড়ি টেনে তুলল। বালতি ওপরে চলে এল, কিন্তু বালতিতে জল ছিল না, ওটা ছিল খালি। পথিক আবার বালতি কুয়োয় নামাল, টেনে তুলল। কিন্তু এবারেও দেখা গেল বালতি খালি। পথিকের পিপাসার জল জুটল না। আসলে বালতির নিচে ছিদ্র ছিল, ফলে জলপূর্ণ বালতি ওপরে আসতে আসতেই খালি হয়ে যাচ্ছিল।

বুদ্ধ আরও এগিয়ে গেলেন। আবার এক কুয়ো দেখা গেল, তার পাশেও দড়ি-বাঁধা বালতি ছিল। এক পিপাসার্ত পথিক এল। বালতি দিয়ে জল টেনে তুলল। জল পান করল। তার পিপাসার শান্তি হল।

বুদ্ধ শিষ্যকে বললেন—'বৎস! তুমি জানতে চাও ধ্যানের শক্তি কি? ধ্যানের শক্তি এইভাবে বর্ণনা করা যায়—যে ব্যক্তি ধ্যান করে না, সে খালিই থেকে যায়, কখনও ভরে ওঠে না। তার ছিদ্র থেকে যায়। সে কখনও পূর্ণ হতে পারে না। যা কিছু তার ভেতরে আসে, তা সবই ছিদ্রপথে বেরিয়ে যায়। যে ধ্যান করে, তার ভেতরে যা প্রবেশ করে, তা হাজার গুণে বাড়ে।' এই হল ধ্যানের শক্তি—ধ্যানের মহত্ত্ব। আমার শরীরের, আমার মস্তিষ্কের কত শক্তিই না আছে। তাদের বিকাশ করার পথ—সাধনা। সাধনা ছাড়া তারা বিকশিত হয় না। সমস্ত সাধনার পথই শক্তি-বিকাশের পথ।

২১

ইন্দ্রিয় সংযম

এক কবি ছিলেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর বাস ছিল আমেরিকায়। তাঁর নাম ছিল 'ইউন্‌কো'। একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ আকাশে মেঘ জমল, আর দেখতে দেখতে মুষল-ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। বৃষ্টির তেজ প্রবল ছিল। কবিকে থামতে হল। তাঁর কাছে এক স্বলিখিত ডায়েরি ছিল, যাতে তিনি অনেক কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর কোন এক স্থানে যাওয়া দরকার ছিল, অথচ বৃষ্টিতে ডায়েরি ভিজে যেতে পারে বলে তাঁর ভয় হল। পাশেই এক দোকান ছিল, এক বুড়ো দোকানদার সেখানে বসে ছিল। তিনি তার হাতে ডায়েরিটা দিয়ে বললেন—'দেখ, আমি তোমার কাছে এই ডায়েরি দিলাম। তুমি এটা ভাল করে রাখবে। কাল ফেরার পথে নিয়ে যাব। বৃষ্টি এসেছে। আমার কাছে ছাতা পর্যন্ত নেই। ডায়েরিটা ভিজে যাবে, তাই তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু সাবধানে রেখ।' দোকানদার ডায়েরিটা নিয়ে রেখে দিল।

পরের দিন কবি তাঁর ডায়েরি নেওয়ার জন্য দোকানে এলেন। তিনি দেখলেন দোকানদার ডায়েরি থেকে পাতা ছিঁড়ছে, আর তা দিয়ে গ্রাহকদের পুরিয়া বেঁধে দিচ্ছে। অবাক হয়ে তিনি দোকানদারকে বললেন, 'আরে! এ কি করছ? ডায়েরিটা এভাবে কেন নষ্ট করছ?'

বৃদ্ধ বলল—'ক্ষমা করুন, আমাব ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি বড় ভুলো স্বভাবের। আমার স্মরণই ছিল না এটা আপনাব ডায়েরি। তবে ব্যস্ত হবেন না। আমি এর ফালতু পাতাই ছিঁডেছি। যে পাতাগুলি আপনি লিখে শেষ কবেছেন সেগুলিই ছিঁড়েছি। যে পাতাগুলি সাদা, যেগুলিতে কিছুই লেখা হয়নি, সে পাতাগুলি যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

দোকানদাব তাব নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই এ কথা বলছিল। সে এই ভেবেই তুষ্ট ছিল যে, সাদা পাতা একটাও ছেঁড়েনি। কবির মনে কি ভাব হল—কে কল্পনা করবে? কবির কাছে সাদা পাতার চেয়ে লেখা পাতার মূল্য অনেক বেশি ছিল। সেই পাতাগুলিতে তিনি অনেক নতুন কবিতা লিখেছিলেন। হয়ত সেই কবিতাগুলি এতই উৎকৃষ্ট ছিল যে তাঁকে তা যশের শিখবে পৌঁছে দিতে পারত। তিনি খালি পাতা দিয়ে কি কববেন?

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ব্যাপারেও ঐ বকম ঘটনা ঘটছে। এক ইন্দ্রিয় হযত খালি পাতাব মতই আছে, আর এক ইন্দ্রিয় লেখা পাতার মত হযে গিয়েছে। কোনটিকে আমরা বেশি মূল্য দেব? আমাদের ইন্দ্রিয়েব সঙ্গে যে রাগ-দ্বেষের ধারা বয়ে চলে, তার থেকে ইন্দ্রিয়ের ওপব রাগের অঙ্কন পড়ে, দ্বেষেব অঙ্কনও পড়ে। ক্রমে অনন্ত অঙ্কন ইন্দ্রিযকে ছেয়ে ফেলে।

যে লোক ইন্দ্রিয সম্বন্ধে চিন্তা করে, জানার চেষ্টা কবে, পরম্পবাগত সংসাবকে লক্ষ্য করে বা ইন্দ্রিয়কে অধিক মর্যাদা দেয, সে ভাবে যত কিছু অঙ্কন পড়েছে, সবই বহুমূল্য। যদি তা শেষ হযে যায়, সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। অঙ্কন মুছে গেলে সবই মুছে যাবে। ইন্দ্রিয় যে সুখ এনে দেয, সে সুখ যদি না থাকে, তবে কি-ই বা অবশিষ্ট বইল? এই শ্রেণীব লোক চায, রাগ-দ্বেষের ধারায় এতকাল যা কিছু লিখিত হয়েছে, যা কিছু অঙ্কিত হয়েছে, তা চিবকালই অক্ষুণ্ণ থাকুক। এই এক দৃষ্টিকোণ বটে।

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ পূর্বোক্ত দোকানদারের। তার বিচারে সাদা পাতাই কাজে লাগে, লেখা পাতা অকেজো। খালি পাতাব মূল্য আছে, কারণ তাব ওপর লেখা যেতে পারে। লেখা পাতার মূল্য নেই, কারণ সে পাতা ভরে লেখা তো হয়েই গিয়েছে, আব নতুন কিছু তো তাতে লেখা যাবে না। এটা কিন্তু এক মহত্ত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ। অবশ্য কবিব তা পক্ষে প্রিয় হবে না, ইন্দ্রিযবাদীর কাছে এই দৃষ্টিকোণ প্রিয় হয় না। কিন্তু সাধকের পক্ষে এই দৃষ্টিকোণ প্রিয় ও মনোজ্ঞ। খালি পাতাই কার্যোপযোগী, অর্থাৎ পাতা খালিই রাখব, খালি কবে নেব। তাব ওপর কখনও কিছু লিখব না। তাকে খালি থাকতেই দেব। ইন্দ্রিয-জ্ঞানের ধাবার সঙ্গে যে বাগ-দ্বেষের ধারা চলে, সেই রাগ-দ্বেষের ধাবাকে রুদ্ধ করব, অবলুপ্ত করব। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান তা হলে খালিই থাকবে। তাব সঙ্গে রাগ-দ্বেষ জুড়ে দেব না, তার ওপর কোন অঙ্কনই পড়তে দেব না। একেই বলে ইন্দ্রিয়-সংযম।

দুটি মত আছে। মত দুটি সম্বন্ধে ভাবতীয় যোগী ও সাধক-সম্প্রদায বহুল আলোচনা করেছেন।

কোন কোন সাধক বলেন, ইন্দ্রিযকে কাজে লাগিও না। চোখ দিযে দেখো না, চোখ বন্ধ রাখ। কান দিযে শুনো না, কানে তুলা কি কর্ক ঢুকিযে দাও। নাক দিযে ঘ্রাণ নিও না, নাক বন্ধ কবে রাখ। জিভ দিয়ে স্বাদ নিও না, সরস খাদ্য কখন গ্রহণ করো না—রসহীন, স্বাদহীন দ্রব্যই আহার কর—যাতে রস না আসে। কিন্তু সহজেই প্রশ্ন হয়, এসব কি সম্ভব? রাত্রি-দিন কি চোখ বুঁজে থাকা সম্ভব হয়? যাব দেখার শক্তি আছে, দৃষ্টি আছে, সে যদি চোখকে কাজে না লাগায তো পবিণতি কি হবে? শোনার জন্যই কান। কান বন্ধ কবে রাখলাম, কিছুই শুনলাম না, তাতে কি বড় উপলব্ধি হবে? আর, কখনও কিছু শুনব না—এ রকম সম্ভবও নয।

আর এক মত আছে। কোন কোন সাধক বলেন, ইন্দ্রিয়দের নিজ-নিজ কাজ আছে। তারা সেই কাজ করুক। চোখ, কান, নাক, জিভ

—প্রত্যেককে কাজে লাগাও। দেখ, শোন, ঘ্রাণ নাও, স্বাদ নাও, স্পর্শ কর—সব কিছুই কর। কিন্তু সেই সঙ্গে যে রাগ-দ্বেষের ধারা উপস্থিত হয়, তাকে তোমার ইন্দ্রিয়ের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দিও না। সেই ধারা যেন পৃথক ভাবেই চলে। তা হলে কোন বিপদ হবে না।

এই হল দুই মত। এক, বিষয়কে নিরোধ করা; আর এক, রাগ-দ্বেষকে নিরোধ করা। এক, ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে কোন কাজই না নেওয়া; আর এক, ইন্দ্রিয়ের কাজ থেকে কাজ নিয়েও তার সঙ্গে রাগ-দ্বেষকে যুক্ত হতে না দেওয়ার। মত দুটি ভিন্ন ভিন্ন। এখন চিন্তার বিষয়, সাধনার দৃষ্টিতে কোন্‌টি আদরণীয়? ইন্দ্রিয়ের কাজ না নেওয়াই ভাল, না রাগ-দ্বেষের সংযোগ বন্ধ করাই ভাল? কেউ বলবেন প্রথমটি ভাল, আবার কেউ বলবেন দ্বিতীয়টি ভাল। আমি কিন্তু বলতে পারব না প্রথমটি ভাল কি দ্বিতীয়টি ভাল। দুটিরই নিজ নিজ স্থান আছে, মহত্ত্ব আছে।

এক ঘটনা মনে আসছে। এক ব্যক্তি এক সাধুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—'মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য কি ঘর ছাড়া নিতান্ত আবশ্যক?' সাধু উত্তর দিলেন—'ঘর ছাড়া মোটেই দরকার নয়। যদি আবশ্যক হতো তো জনক ঘরে থেকেই কি করে বিদেহ হলেন? আদর্শ গৃহে থেকে ভরত কি করে কৈবল্য প্রাপ্ত হলেন? ভগবান ঋষভের মাতা মরুদেবার কি করে মোক্ষ মিলল? মরুদেবা সাধ্বী হয়ে যান নি, ভরত গৃহত্যাগী হন নি, জনক রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হন নি। তবুও মরুদেবা মুক্ত হয়ে গেলেন, ভরত কেবলী হলেন, আর জনক বিদেহ হয়ে গেলেন।'

কিছু দিন পরে আর এক ব্যক্তি ঐ সাধুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ! মোক্ষের জন্য ঘর-সংসার ছাড়া আবশ্যক নয় কি?' সাধু বললেন, 'খুবই আবশ্যক, নিতান্তই জরুরী। যদি সংসার ত্যাগ না করেও মোক্ষ মেলে, তবে শুকদেব যে রকম সন্ন্যাসী ছিলেন সে রকম সন্ন্যাসীর জন্ম হয় কি করে? জৈন, বৌদ্ধ, বৈদিক নির্বিশেষে আমাদের ভারতীয় পরম্পরায় হাজার হাজার সন্ন্যাসী হয়েছেন, মুনি হয়েছেন,

ভিক্ষু হয়েছেন, তাঁরা সন্ন্যাসী হলেন কেন? কেন তাঁরা ঘর ছেড়ে এসে সাধনা করছেন? মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য গৃহত্যাগ নিতান্ত আবশ্যক।'

একবার এই দুই ব্যক্তি কোন স্থানে একত্র হল। একজন বলল, 'মহারাজ বলেছেন মোক্ষলাভ করার জন্য ঘর ছাড়া আবশ্যক নয়।' দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, 'এ তুমি মিথ্যা বলছ। আমি ঐ সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছেন, মোক্ষ লাভ করার জন্য ঘর ছাড়া নিতান্ত আবশ্যক।'

এই ভাবে দুজনের মধ্যে বিবাদ হল। দুজনেই নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত সত্যিই বলছিল। যাক্, বিবাদ বেড়েই গেল, কোন সমাধান হল না। তখন তারা দুজনে সেই সাধুর কাছে গেল। তাঁকে, বলল 'মহারাজ! আপনিই আমাদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়েছেন। আমরা আপনাকে একই প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু আপনি উত্তর দিয়েছেন দুটি। আর ঐ উত্তর দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ। এর সমাধান কি?'

সাধু বললেন—'তোমরা দুজনেই বোকা। আমার অভিপ্রায় বুঝতে পার নি।' তারপর প্রথম ব্যক্তিকে সম্বোধন করে সাধু বললেন—'দেখ, ঘর ছাড়ার মত মনোবৃত্তি তোমার ছিল না। তুমি সত্যিই ঘর ছেড়ে সাধনা করতে চাও নি। সেজন্যই আমি বলেছিলাম, মোক্ষ লাভের জন্য ঘর ছাড়া আবশ্যক নয়। তুমি ঘরে থেকেই সাধনা করতে পার। দ্বিতীয় ব্যক্তির মনোবৃত্তি ঘর ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, সেজন্য আমি তাকে বলেছিলাম, মোক্ষ লাভের জন্য ঘর ছাড়া আবশ্যক। আমি তাকে কি করে বলব, তুমি ঘরেই থাক? তোমার মনোভাবনা যে দিকে ছিল সেদিকেই আমি তোমাকে প্রেরিত করেছি। আর ওর মনোভাবনা যেদিকে ছিল সেদিকেই আমি ওকে প্রেরিত করেছি। ওকে সে দিকেই যেতে বলেছি। এতে অসুবিধে কি হল?'

এই এক ঘটনা। আমরা সব ক্ষেত্রে বলতে পারব না যে ঘর ছাড়াই ভাল, আবার এ ও বলতে পারব না যে ঘর না ছাড়াই ভাল। যার যেমন

যোগ্যতা, যেমন ক্ষমতা, যেমন প্রস্তুতি, যেমন মনোবৃত্তি, তাকে তদনুসারে তার পথেই চলতে দেওয়া উচিত।

কেউ কেউ বলেন, চোখ বন্ধ করে বসে না থাকলে রূপের প্রতি যে আকর্ষণ আছে তা কখনও মিটবে না। রূপের প্রতি যে আসক্তি আছে তার এমনই নিবৃত্তি হবে না। সেজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই দু-চার ঘণ্টা চোখ বন্ধ করে বসে থাকা উচিত। কেবল এরকম করলেই চক্ষু-সংযম সম্ভব হতে পারে।

আবার কেউ কেউ বলেন—এটা দুর্বলতা, এটা ক্লীবতা। বরং আমাদের প্রযত্ন করতে হবে যে, রূপ দেখেও আমাদের মনে যেন আকর্ষণের উৎপত্তি না হয়, বিকারের ভাব যেন না জাগে। চোখের কাজই দেখা। তবে, দেখার সঙ্গে আমরা রাগ-দ্বেষের চেতনা যেন না জুড়ে দিই, তা-ই হবে আমাদের সাধনা। আমাদের মনে যেন প্রিয়তা-অপ্রিয়তার ভাব, ভালমন্দের ভাব প্রবেশ না করে।

আমি বলি, প্রথমটি এক পথ, দ্বিতীয়টি আর এক পথ। দ্বিতীয়টি শ্রেষ্ঠ আর প্রথমটি অপকৃষ্ট, কিংবা প্রথমটি শ্রেষ্ঠ আর দ্বিতীয়টি অপকৃষ্ট—এমন বলা যায় না। দুটিই পথ। যার যেমন রুচি সে তেমন পথে চলবে। এক পথ আর এক পথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এমন কথার অর্থ হয় না। আসল কথা, ব্যক্তির রুচি, যোগ্যতা ও ক্ষমতা কি? দুটি পথই আছে, তার যে কোন একটিকে ধরে লক্ষ্যে পৌঁছনো যেতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তির এমন ক্ষমতা জাগ্রত হয়ে থাকে যে, সে চোখ খোলা রাখলেও তার মনে প্রিয়-অপ্রিয় বা রাগ-দ্বেষের ভাব উদিত হয় না, তার পক্ষে চোখ বন্ধ রাখার কোন প্রয়োজনই হয় না। চোখ বন্ধ রাখা তারই পক্ষে প্রয়োজন যার এমন ক্ষমতা জাগ্রত হয় নি, এবং ফলে যে মনে উদীয়মান প্রিয়তা-অপ্রিয়তার বা রাগ-দ্বেষের ভাবকে রোধ করতে অক্ষম।

মুখের ওপর পর্দা রাখার প্রথা আগে চলিত ছিল, এখনও আছে।

প্রশ্ন হতে পারে, পর্দা কে রাখবে—স্ত্রী না পুরুষ ? এমন কথা নয় যে, স্ত্রী-ই পর্দা রাখবে, পুরুষ রাখবে না। পর্দা সে-ই রাখবে যার দৃষ্টি নির্বিকার নয়, যার দৃষ্টি সংযত নয়, তা সে স্ত্রীই হোক আর পুরুষ হোক। চোখ বন্ধ করে রাখা চোখের ওপর পর্দা রাখার মতই। ইচ্ছা হয় চোখ বন্ধ রাখা, ইচ্ছা হয় চোখের ওপর কাপড়ের আবরণ রাখা—দুই একই কথা। পর্দা আবরণ মাত্র। যার এমন ক্ষমতা হয়েছে যে, তার দৃষ্টিতে বিকার আসে না, রূপ-অরূপের প্রতি রাগ-দ্বেষ হয় না, তার ক্ষেত্রে পর্দার কোন আবশ্যকতা থাকে না। তার চোখ বন্ধ করে সাধনা করার আবশ্যকতাও নেই।

এক পথ—ইন্দ্রিয়-বিষয়ের নিরোধ। আর এক পথ—রাগ-দ্বেষের ধারা অবরোধ। এই দুটির সংযুক্ত নাম—ইন্দ্রিয়-প্রতিসংলীনতা। প্রতিসংলীনতার অর্থ—নিজের মধ্যেই লীন হয়ে যাওয়া। ইন্দ্রিয়-প্রতিসংলীনতা হল—চেতনার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের লীন হয়ে যাওয়া।

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। আমরা জেনে রেখেছি—চোখের কাজ দেখা, কানের কাজ শোনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে কিন্তু ব্যাপার তা নয়। বাস্তবে ঐ রকম কোন ভাগ নেই। জ্ঞানের ধারা একই। তা ভাগে ভাগে বিভক্ত নয়। আমাদের ব্যবহারের সুবিধের জন্যই আমরা বিভাগ কল্পনা করে নিয়েছি।

জৈন পরম্পরায় চব্বিশ প্রকার 'লব্ধি'-র উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে এক লব্ধি হল—সংভিন্নস্রোতোলব্ধি। যে সাধক যোগীর এটা উপলব্ধ হয়ে যায়, যে সাধক সাধনার দ্বারা চেতনার বিকাশ অত্যুচ্চ স্তরে নিয়ে যান, সেই সাধক যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করিয়ে নিতে পারেন। তিনি চোখ দিয়ে শুনতে পারেন, কান দিয়ে দেখতে পারেন—আঙ্গুল দিয়েও দেখতে পারেন, শুনতে পারেন। তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ের কাজের কোন বিভাজন নেই। যে কোন ইন্দ্রিয়ই সব ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এর থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞানধারা এক ও অবিভাজ্য।

'সংভিন্নস্রোতোলব্ধি' কথাটির শব্দার্থ হল—যে স্রোত আছে, তার সমস্তই ভিন্ন হয়ে যায়, খুলে যায়। ফলে এমন অবস্থা আর থাকে না যে, কান দিয়েই শুনতে হবে বা চোখ দিয়েই দেখতে হবে। তখন যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই শোনা যায় বা দেখা যায়।

আজ বিজ্ঞানের দ্বারাও এই তত্ত্ব সম্ভব বলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেবল কানের দ্বারাই শুনতে হবে—এমন কোন বিধান নেই। কেবল অভ্যাসের দ্বারাই আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছেছি, যেখানে কানের মাধ্যম ছাড়া আমরা শুনতেই সক্ষম হই না। তা না হলে, শোনার শক্তি হয়ত দাঁতেই অধিক পরিমাণে থাকত। আপনারা চোখ দিয়ে নয়, আঙ্গুল দিয়েই হয়ত দেখতে পারতেন। রুশ দেশে রোজা কুলেশোবা নামে এক স্ত্রীলোক আছেন। তাঁর আঙ্গুলে অদ্ভুত ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে। চোখে পট্টি বেঁধে তিনি আঙ্গুলের সাহায্যেই পুস্তক পড়তে পারেন। আঙ্গুল পাতার ওপর বোলান, আর পড়ে যান। যে কোন জিনিস তাঁর কাছে আনলে তিনি তার ওপর ডান হাতের আঙ্গুল ফেরান আর বলে দেন ঐ জিনিসের ওপর কি লেখা আছে বা কি ছাপানো আছে। তাঁর আঙ্গুল আয়নার পিছনেও দেখতে পায়। তিনি কোন বস্তুকে স্পর্শ না করেও তার পরিচয় বলে দিতে পারেন। অবশ্য অন্ধও পুস্তক পড়ে, তবে সে উঁচু করে প্রস্তুত অক্ষরই পড়তে পারে। ঐ রকম অক্ষর পড়ার বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য তাকে পূর্বে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। সে সাধারণ পুস্তক পড়তে পারে না। কিন্তু ঐ রুশীয় স্ত্রীলোক সাধারণ পুস্তকই আঙ্গুলের মাধ্যমে পড়তে পারেন।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির এই যে বিভাজন—অমুক ইন্দ্রিয় দিয়ে শুনতে হবে, অমুক ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখতে হবে, অমুক ইন্দ্রিয় দিয়ে রসাস্বাদ করতে হবে, ইত্যাদি—তা আমাদের নিরন্তর অভ্যাসের কারণেই হয়েছে। কিন্তু এই বিভাগ যথার্থ নয়। যার চেতনা বিকশিত হয়ে যায় তার ক্ষেত্রে এই বিভাগ আর থাকে না।

আমরা দেখতে পাই, কোন ব্যক্তির মিষ্টান্নের প্রতি অনুরাগ আছে,

আবার কারও ঐ মিষ্টান্নের প্রতি দ্বেষ বা ঘৃণা আছে। কেউ কেউ এক বস্তু পছন্দ করে, আবার কেউ কেউ অন্য বস্তু পছন্দ করে। কোন ব্যক্তির যদি এক বস্তুর প্রতি অনুরাগ থাকে তো অন্য ব্যক্তির ঐ বস্তুর প্রতি দ্বেষ থাকে। ইন্দ্রিয়গুলি যেন রাগ-দ্বেষকে বণ্টন করে দিয়েছে। কিন্তু রাগ-দ্বেষ কি বণ্টন করা যায়, খণ্ড খণ্ড করা যায়? আমি বুঝি, এমন করা যায় না। রাগ-দ্বেষের একই ধারা। আমাদের চেতনার ধারাও এক। অনেক রকম পার্থক্যও যে দেখা যায়, তা কেবল অভ্যাসের কারণে, বাতাবরণের কারণে আর সংস্কারের কারণে। এক বিশেষ পরিস্থিতিতে যে রকম অভ্যাস, বাতাবরণ আর সংস্কার গড়ে ওঠে, তাই সমস্ত বিভাগের বা পার্থক্যের সৃষ্টি করে।

কারও রসাস্বাদনের শক্তি প্রবল হয়, কারও শ্রবণশক্তি প্রবল হয়, আবার কারও দর্শনশক্তি প্রবল হয়। রাগ-দ্বেষের ধারা এক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রুচির যে সৃষ্টি হয়, তার মূল কারণই সংস্কারের বিকাশ—বিভিন্ন সংস্কারের বিকাশ। আমরা কোন এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করি, অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে যাই। এটা 'স্পেশালাইজেশনের' কথা। কোন ইন্দ্রিয়ের যদি কোন বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক হয়, তবে রাগ-দ্বেষের ধারা সেদিকেই প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে।

চাষের জন্য ক্ষেতে জল নেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়, তা আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন। বড় খাল থেকে ছোট ছোট নালা কেটে সমস্ত ক্ষেতে জল নিয়ে যাওয়া হয়। যেসব নালা দিয়ে জল নেওয়ার আবশ্যকতা থাকে না, চাষী কখনও কখনও সেই সব নালার মুখ মাটির বাঁধ দিয়ে বন্ধ করে। তখন জল আর সেসব বিভিন্ন নালা দিয়ে ছড়িয়ে না পড়ে এক দিকেই চলে। যে জল ভিন্ন ভিন্ন নালাতে বণ্টিত হয়ে প্রবাহিত ছিল, সেই জল এখন এক ধারাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির স্থিতি ঠিক এই রকম। রাগ-দ্বেষের ধারা সব ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই চলছিল, এখন আমরা কতকগুলি

ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করে সেই ধারাকে একই ইন্দ্রিয়ের দিকে প্রবাহিত করে দিলাম। এখন সমস্ত প্রবাহ পূর্ণবেগে এক দিকেই চলল। এবার আমাদের সংস্কার বলবান হতে আরম্ভ করল।

আমাদের সমস্ত শরীরে রক্তের সঞ্চার আছে, সমস্ত অবয়বেই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু আমি যখন শরীরের কোন এক বিন্দুতে ধ্যান কেন্দ্রিত করে সংকল্প করি যে ঐ বিন্দুতে রক্তের প্রবাহ অধিক হোক, তখন সত্যিই রক্তধারা সেখানে অধিক মাত্রায় প্রবাহিত হতে আরম্ভ করবে। প্রাণধারা সেখানে প্রবাহিত হতে থাকবে। প্রাণধারার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ধারাও এসে যাবে। এই ভাবে যে দিকে আমার মন যাবে, সংকল্প যাবে, প্রাণধারাও সেদিকেই যাবে। রাগ-দ্বেষের ধারাও সেদিকে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করবে। ফলে, সংস্কার বলবান ও পুষ্ট হতে থাকবে। রাগ-দ্বেষের ধারার মধ্যে কোন ভেদ নেই, পার্থক্য নেই। চেতনার ধারার মধ্যেও ভেদ নেই, পার্থক্য নেই। আমরা সংকল্পের দ্বারা ঐ ধারাকে গতি ও পুষ্টি দিয়ে ভেদের সৃষ্টি করি।

আমরা যদি ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করতে চাই তো ইন্দ্রিয়-বিষয়ের নিরোধ আর রাগ-দ্বেষের ধারার নিরোধ—এই দুই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

সকলের ইন্দ্রিয়-অভ্যাস এক রকম নয়। কারও চক্ষু-ইন্দ্রিয় প্রবল। কারও শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় প্রবল, আবার কারও রসনা-ইন্দ্রিয় প্রবল। কারও ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় প্রবল হল তো অন্য কারও স্পর্শ-ইন্দ্রিয় প্রবল। ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করার পূর্বে ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে নির্ণয় করতে হবে, কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি—কোন বিষয়ের প্রতি—তার আসক্তি প্রবল। এইভাবে নির্ণয় করার পরে, তাকে নির্ণীত ইন্দ্রিয়কে সংযম করার পথে অগ্রসর হতে হবে। এই সংযম অভ্যাস এই ভাবে করতে হবে—যে ইন্দ্রিয়ের আসক্তি প্রবল, সেই ইন্দ্রিয়ের দিকে রাগ-দ্বেষের ধারাকে যেতে না দেওয়ার অভ্যাস করতে হবে। সর্বদা অবহিত থেকে নিরন্তর অভ্যাস চালিয়ে যেতে হবে। সাফল্য কতটা হচ্ছে, সে বিষয়ে সকালে

ও সন্ধ্যায় আত্ম-নিরীক্ষণ করতে হবে। এই যথেষ্ট। আর কিছু করার আবশ্যকতা হবে না। এতটা জাগরূকতা এসে গেলে ইন্দ্রিয়-সংযমের পথ খুলে যাবে। কেবল সাধনার দৃষ্টিতে নয়, জীবনের দৃষ্টিতেও ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক। স্বাস্থ্য, ব্যবহার প্রভৃতি সব কিছুর জন্যই ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজন আছে।

প্রাচীনকালে এমন উল্লেখ দেখা যায় যে, রাজাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযম অত্যন্ত আবশ্যক। যে রাজা ইন্দ্রিয়-সংযমে অপটু, তাঁর পক্ষে যথার্থভাবে রাজ্যপালন সম্ভবই নয়। ইন্দ্রিয়-লোলুপ রাজা কি করে বৃহৎ সাম্রাজ্য চালনা করবেন? যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হল, তখন তখন হয়ত রাজা অন্তঃপুরে বিলাস-ব্যসনে ডুবে আছেন। তাহলে রাজ্য রক্ষা কেমন করে হবে? রাজার পক্ষে সংযত-ইন্দ্রিয় হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সমাজে যাঁরা প্রধান ব্যক্তি তাঁদের পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই আবশ্যক। যে অত্যধিক ইন্দ্রিয়-চর্চা করে সে নিজের জীবনই নষ্ট করে ফেলে। তিন রকম অবস্থা হতে পারে—যোগ, অযোগ আর অতিযোগ। মহর্ষি চরকের অভিমত, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের যোগ অর্থাৎ ব্যবহার না করে, ইন্দ্রিয়ের কাজ গ্রহণ না করে, তার ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় তার কাজ করা বন্ধ করে দেয়। আপনার চোখের ব্যবহার বন্ধ যদি করে দেন তো চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যাবে। সব ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেই এই এক নিয়ম। আপনারা হাত ভাঁজ করে রাখুন, কিছু দিন পরে দেখবেন হাতকে আর সোজা করতে পারছেন না—তার নমনীয়তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অযোগ বা অব্যবহারে যেমন শক্তি নষ্ট হয়, অতিযোগ বা অত্যধিক ব্যবহারে শক্তি তেমনই নষ্ট হয়। সেজন্য বলতে হয়, 'যোগই' উত্তম পথ। ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহার হওয়া চাই। ইন্দ্রিয়ের কাজ গ্রহণ করলাম, তারপরে বিশ্রাম করলাম। যতটা কাজ, ততটা বিশ্রাম। যতটা কাজ গ্রহণ করা দরকার ততটা কাজই গ্রহণ করলাম—তার অধিক বা অল্প নয়। এই হল যোগ। এটাই আয়ুর্বেদের অভিমত,

অর্থাৎ স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া অভিমত। এর তাৎপর্য এই যে, চোখের কাছ থেকে দেখাব কাজ নেওয়া চোখেব অসংযম নয়। কানের কাছ থেকে শোনার কাজ নেওযা কানেব অসংযম নয। অসংযম তখনই হয়, যখন এদেব সঙ্গে রাগ-দ্বেষ জুড়ে দেওয়া হয। ইন্দ্রিয় সংযমের প্রকৃত অর্থ হল—আপনারা ইন্দ্রিয়েব মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করুন, কিন্তু সেই জ্ঞান যেন বিশুদ্ধ জ্ঞান হয়—তাব সঙ্গে যেন আর কিছু জুড়ে না দেওযা হয। বিশুদ্ধ জলই যেন প্রবাহিত হয়, তার সঙ্গে যেন কোন আবর্জনা বা নোংরা জিনিষ যুক্ত না হয। একেই ইন্দ্রিয-সংযম বলে। জল প্রবাহিত হবে, না এক জায়গায পড়ে থাকবে—সেটা আমাদেব চিন্তার বিষয় নয। জল প্রবাহধারায় চলতে পাবে অথবা এক জায়গায় স্থিব থাকতে পারে। আমাদের কেবল এই চিন্তাই হবে, জলের সঙ্গে যেন আবর্জনাও না চলে, ধুলো-বালি যেন না মেশে। এই ব্যবস্থা করতে পারলেই যথেষ্ট হবে। এর জন্য যদি আমাদের কোন নালা বন্ধ কবে দিতে হয় তো তা বন্ধ করতে হবে। যদি কোন নালা ওপর থেকে ঢাকতে হয, যাতে কোন আবর্জনা বা নোংবা জিনিষ তাতে না ঢোকে, তবে তাই করতে হবে। মুল কথা—জল যেন পরিষ্কার থাকে, তার স্বচ্ছতা যেন নষ্ট না হয। এই হল ইন্দ্রিয়-সংযম। যদি আমরা এই বিষযে সতর্ক থাকি যে, কোনক্রমেই যেন আমাদের ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সঙ্গে বাগ-দ্বেষের ধারার সংযোগ না ঘটে, তাহলে ইন্দ্রিয়-সংযমের পথ স্বতঃই প্রশস্ত হযে যাবে।

ইন্দ্রিয়-অসংযমেব ফল সঙ্গে সঙ্গেই মেলে। এক ব্যক্তি একদিন এত অধিক পরিমাণে ভোজন করল যে সেদিন সন্ধ্যায়, বা তাবপবে দুই-একদিন ধবে, তাব ভোজন করার প্রযোজনই রইল না। সে একবাবে গলা পর্যন্ত ভোজন কবল। তাব ফল সে তৎক্ষণাৎ পেল। পরিণামেব জন্য তাকে পরেব জন্ম পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হল না। প্রায়ই খবরের কাগজে পডা যায—অমুক শহরে একশ লোক মদ পান করে মারা গিয়েছে। ঐ মদ বিষাক্ত ছিল। তার ফল তখনই

ভুগতে হল। আমাদের সব হিসেব-নিকেশ বর্তমান কালেই হয়ে চলেছে।

আমাদের ভেতরে এমন এক 'কম্পিউটার' আছে যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব রাখে, গণনা করে। সমস্ত হিসেবই আমাদের ভেতরে হচ্ছে।

এক ব্যক্তি অত্যন্ত ধনী। কিন্তু তার ধনী হওয়ার মূলে আছে কুটিল ও কপট প্রচেষ্টা। সে অন্যকে ঠকায়, ধাপ্পা দেয়, ভেজাল চালায়, চুরি করে। ধন তার হাতে স্তূপীকৃত হল। আমরা তাকে বহু মান দিলাম, কারণ সে ধনী। বাইরে থেকে তাকে খুবই প্রসন্ন দেখাবে। এবার তার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখুন। তাকে বড়ই দুঃখী বলে মনে হবে। তার আত্মা কাঁদছে। সংসারে তার অনেক ছিদ্র। তার ছেলে তার কথা শোনে না, তার স্ত্রী তার ওপর সন্তুষ্ট নয়। তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছে। দুশ্চিন্তায় তার প্রতি মুহূর্ত কাটছে। কুটিলতা কপটতার পরিণাম তাকে এখানেই ভোগ করতে হচ্ছে। তার ধন আছে, কিন্তু সুখ নেই, আত্মতোষ নেই, শান্তি নেই।

পরিণামের এই সূক্ষ্ম হিসেব-নিকেশ ভেতরে ভেতরে হয়েই চলেছে। আমরা প্রত্যক্ষভাবে তা দেখতে পাই না। ওটা স্বতঃ-চালিত ব্যবস্থা।

মার্কস বলেছেন, বাদ, প্রতিবাদ আর সমবাদ—এই তিনটি এক সঙ্গে চলে। বাদের সঙ্গেই প্রতিবাদের উৎপত্তি হয়। বাদ যে কোন পদ্ধতিতেই হোক—প্রতিবাদ অবশ্যই হবে। সংঘর্ষ অবশ্যই হবে। আমরা মনে করি, এই প্রতিবাদ বা সংঘর্ষ আজই উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। প্রতিবাদের উৎপত্তি সেই দিনই হয়েছিল, যেদিন বাদ উৎপন্ন হয়েছিল। শিশু যে দিন জন্মায়, যে ক্ষণ তাকে জন্ম দেয়, সেই দিন-ক্ষণ মৃত্যুর প্রারম্ভেরও সূচনা করে। শিশুর মৃত্যুর প্রারম্ভ হয়ে যায়। আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি ষাট বছর হয়ে মারা গিয়েছে, অমুক ব্যক্তি আশি বছরে পৌঁছে মারা গিয়েছে। তা কিন্তু ভুল। যে ব্যক্তি ষাট কি আশি বছর বেঁচে থাকতে পারে, সে কখনই মরতে পারে না। সে মৃত্যুর অতীত হয়ে যায়। যে শিশু নতুন জীবন পেয়ে

ছু দিন না মরে বেঁচে থাকতে পারে, সে আর কখন মরে না ; সে অমব হয়ে যায়। আসলে কিন্তু এ রকম হয না। এই জগতে চিরকাল বেঁচে থাকাব ব্যবস্থা নেই। প্রাণী যে দিনে যে ক্ষণে জন্মায সেই দিন সেই ক্ষণ থেকে মরতেও আরম্ভ করে। সে প্রতি ক্ষণেই মরে, তাই আমবা একদিন বলতে পাবি—সে মরে গিয়েছে। একটা ঘড়া পড়ে আছে। আমরা একটা পাথব ছুঁড়ে মারলাম, ঘডাটা ফেটে গেল। আমবা লাঠি দিয়ে ঘডাকে আঘাত করলাম, ঘড়াটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হযে গেল। আমবা বললাম—'ঘড়াটা একটু আগেই অখণ্ড ছিল, এখন ফেটে গেল, ভেঙ্গে গেল।' সত্যিই কি ঘড়াটা এখনই ফেটে গেল ? না, তা নয। ঘডাটা প্রতি ক্ষণেই ফাটছিল, তাই এখন ফেটে গেল। যখনই ঘডাটা অস্তিত্ব লাভ করেছিল, যখনই ঘডাটা বানানো হযেছিল তখনই যদি সেটা না ফাটত, তবে পাথর বা লাঠির ঘাযে কখনই সেটা ফাটত না। ঘড়া চিরস্থাযী হযে যেত, কখনই বিনষ্ট হতো না। এই ভাবে পৃথিবীতে প্রত্যেক বাদের সঙ্গে প্রতিবাদ, প্রত্যেক জন্মের সঙ্গে মৃত্যু, প্রত্যেক অস্তিত্বের সঙ্গে নাস্তিত্ব, সংযুক্ত আছে।

বাদেব প্রতিবাদ আসে, তারপবে আসে সমবাদ। সমবাদীর অর্থ হচ্ছে—পুষ্টি প্রদানকারী। সমবাদী পুরাতন ব্যবস্থার পবিবর্তন আনে, নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। একটি তথ্য এই যে, আমাদের ভেতরে যে ক্রিয়া হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে। কোন ব্যক্তি উত্তম আহার কবছে। সে ভাবছে, আজ অমৃত আহাব করলাম। কিন্তু সেই অমৃতের সঙ্গে কি বিষেব মাত্রাও নেই ? অবশ্যই আছে। কেউ দুধকে অমৃত ভাবে, কেউ শাক-সবজিকে। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রেও অমৃতের সঙ্গে বিষেব মাত্রা মিশ্রিত আছে। দুধে বিষ আছে, শাক-সবজিতেও বিষ আছে। এমন কোন খাদ্য নেই যা কেবলই অমৃত, বিষের সম্পর্কশূন্য। আবাব এমন খাদ্যও নেই যা কেবলই বিষ, অমৃতের সম্পর্কশূন্য। অমৃত ও বিষ এক সঙ্গেই থাকে। যেখানেই জীবনের ক্রিযা হয়, সেখানেই মরণের প্রতিক্রিয়া হয। জন্ম যদি এক

ক্রিয়া হয় তো মৃত্যু তার প্রতিক্রিয়া। স্বাস্থ্যকে যদি ক্রিয়া বলা যায়, রোগকে বলতে হয় প্রতিক্রিয়া। উভয়কে আলাদা করা যায় না, তবে মাত্রা-ভেদ অনুসারে আমরা এদেব আলাদা-আলাদা করেই নিই। ধনী ব্যক্তিব ধনেব মাত্রা দেখে আমরা বলি, এ ব্যক্তি এত পাপ করেও এত উন্নতি করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমরা তাব অন্তরের অবস্থা দেখি, তার সুখ দেখি, তার শান্তি দেখি, তবে হয়ত বলব যে, সে লোকসানে ডুবে গিয়েছে। ধন হয়েছে তো কি হয়েছে? সে না পেয়েছে শান্তি, না পেয়েছে সুখ, না পেয়েছে প্রসন্নতা। কাবণ, হিসেব যে এক সঙ্গেই চলছে। পরলোকের কথা ছেড়েই দিন। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ইহলোকে, বর্তমান কালেই হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করাব, পবিণাম প্রদান করার, হিসেব-নিকেশ নিষ্পন্ন করার যে অব্যর্থ 'কমপিউটার'—তা আমাদের ভেতরেই আছে। এর জন্য কোন বাহ্য সত্তাকে আমন্ত্রণ জানাবাব আবশ্যকতা নেই।

২২

অপ্রমাদ

এক লোক তার সারা দিনের করণীয় কাজ একটি কাগজে লিখে রাখত। একদিন সে তার নিয়ম অনুসারে সেই দিনের কাজ কাগজে লিখে রাখল। তারপব কাজের সময় যখন এল তখন সে কাগজখানি এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। কিন্তু কাগজ আব খুঁজে পেল না। এমন সময় তার এক বন্ধু সেখানে এল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এ তুমি কি কবছ?' সে বলল, 'আমি মনে করতে পারছি না, এখন আমাব কোন্ কাজ করার কথা।' বন্ধু বলল, 'কেন, তুমি তো কাগজে লিখে রেখেছ। কাগজ উঠিয়ে দেখে নাও না।' সে বলল, 'কাগজটা যে কোথায় বেখেছি তা ভুলে গেছি। মনে করতে পারছি না। কাগজই তো খুঁজছি।'

কাজের কথা স্মবণ রাখার জন্য কাগজ, আবার কাগজের কথা স্মরণ বাখার জন্য তৃতীয় কোন মাধ্যম দরকার। ভুলো স্বভাব এমনই যে, কেবল কাগজে কাজ চলে না, সেই কাগজ সামলে রাখার ব্যবস্থাও দরকাব। এ তো বড় সমস্যা! কিন্তু কেন এমন হয? এমন হওয়ার কাবণ—প্রমাদ। প্রমাদেব অর্থ—বিস্মৃতি। 'কি', 'কি প্রকারে', 'কেন'—এসব কিছুর বোধ আমাদেব থাকে না। আমরা সবই ভুলে যাই।

জীবনে অপ্রমাদ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু না ভুললেও কাজ চলে না; ভোলাও আবশ্যক। মানুষ নেশা করে—মদ খায়, ভাঙ খায়। কিন্তু তার পরিণতি কি? মদ বা ভাঙ কোন সুস্বাদু পদার্থ নয়। তবুও মানুষ লোলুপ হয়ে তা সেবন করে। এর কারণ কি হতে পারে? যারা মদ খায় তারাও বলে, মদ খাওয়ার সময় মুখ বিকৃত হয়—মদের গন্ধ অসহ্য লাগে। খেতে সুস্বাদু নয়, অথচ আমাদের খেতেই হয়, না খেলে চলে না—এরও অবশ্য একটা কারণ আছে। সেই কারণ হল—মানুষ একলা থাকতে চায়। নেশা তাকে ভুলিয়ে দেয়।

আমাদের সামনে দুটি দিক আছে। এক দিক সম্পর্কের, আর এক দিক একাকীত্বের। ব্যক্তির সম্পর্ক হয় পরিবারের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে, সমব্যবসায়ীদের সঙ্গে, সামাজিক, ধার্মিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সঙ্গে। গ্রামের সঙ্গে, রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক হয়। অনেক প্রয়োজনে, অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে, অনেক শ্রেণী ও অনেক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক হয়। কেবল প্রাণীদের সঙ্গেই যে সম্পর্ক হয় তা নয়, শরীরের সঙ্গে, পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে, ঘর-বাড়ির সঙ্গে ও আরও অনেক বস্তুর সঙ্গেও সম্পর্ক হয়। যে ভাবে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ঠিক সে ভাবেই বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভাবনার সঙ্গেও সম্পর্ক হয়। এ সবই সম্পর্ক। একদিকে ব্যক্তি একাকী, অপর দিকে তার এই প্রকার সম্পর্কের বহুলতা। সম্পর্ক চিন্তা উৎপন্ন করে। যত সম্পর্ক, তত চিন্তা। সম্পর্ক থেকে চিন্তা বাড়ে। চিন্তা বাড়লে মনে হয় দুঃখও বাড়ছে। বস্তুত, দুঃখ কি? আমি তো মনে করি, সম্পর্কই দুঃখ। দুঃখের অর্থই হল, কোন না কোন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক। সম্পর্ক হয়েছে কি দুঃখও হয়েছে, সম্পর্ক নেই তো দুঃখও নেই। সম্পর্ককে ছেড়ে দুঃখের কল্পনাও করা যায় না। এক ব্যক্তি শান্ত হয়ে অবস্থান করছে। তার মন শান্ত, চিন্তা-ভাবনাও শান্ত। হঠাৎ সে এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল,

'যে তার প্রতি অনুকূল নয়, কিন্তু প্রতিকূল, যে তার অপ্রিয়, যে অতীতে তাকে ঠকিয়েছে বা অপমানিত করেছে। তাকে দেখা মাত্রই শান্ত ব্যক্তির শান্তি ভঙ্গ হল। তার মন ক্রোধে ভরে উঠল। সে অশান্ত হয়ে গেল, দুঃখী হয়ে গেল। তার এই দুঃখের হেতু কি? সম্পর্কই হেতু। দুঃখের অর্থই হল সম্পর্ক, আর সম্পর্কের অর্থই হল দুঃখ বা চিন্তা। কোন ব্যক্তি সব সময় চিন্তিত হয়ে থাকতে পারে না। যখন সে চিন্তিত থাকে তখন তার মনে অস্থিরতা আসে, ব্যাকুলতা আসে, উত্তেজনা আসে। এই অস্থিরতা, এই ব্যাকুলতা তাকে একলা হয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে বা বাধ্য করে—যেন তাকে বলে, 'তুমি একলা হয়ে যাও, তাহলে কোন চিন্তা থাকবে না, কোন ব্যাকুলতা থাকবে না।'

বোধ হয়, চিন্তামুক্তির জন্যই মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের প্রচলন হয়েছিল। লোকে চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, সম্পর্ককে ছিন্ন করার জন্য, দুঃখ থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য নেশা করে, মাদক বস্তুর প্রয়োগ করে। যখনই কেউ মদ্য পান করে, তখনই সে একলা হয়ে যায়, তার সব সম্পর্ক টুটে যায়, বাইরের কোন বোধ আর থাকে না। সে অনুভব করতে আরম্ভ করে, সে একলা হয়ে গিয়েছে, আর এই একলা হওয়াতেই বড় সুখ। মদ্যপান করার মধ্যে সত্যিই কোন সুখ থাকতে পারে না। আসলে মদ্যপান একাকীত্বের একটা নিমিত্ত মাত্র। এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখই হল—একাকীত্ব। কিন্তু লোকে একলা হতে পারে না, কারণ সে এত সম্পর্কের সৃষ্টি করেছে আর সেই সব সম্পর্কের দরুণ চিন্তা-সূত্রের জঙ্গল এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, সে নিজেকে আর আলগা করতে পারে না—পৃথক করে নিতে পারে না। তার এমন ক্ষমতা নেই যে সে ঝটকায় জাল ছিঁড়ে বের হতে পারে। সে তো ধ্যানের প্রয়োগ জানে না, সে যে ধ্যানের অভ্যাস করে নি। সে ধ্যানের দ্বারা আপনাকে একলা করার, সম্পর্ককে ছিন্ন করার, কৌশল আয়ত্ত করে নি; তাই সে মদিরা ও

অন্যান্য মাদক বস্তুর সাহায্য নিয়ে আপনার একাকীত্বের অনুভব করার চেষ্টা করে। লোকে মনোরঞ্জনের বিষয় পেলে রসবোধ করে, কিন্তু কেন? সে কেন সিনেমায় যায়, সার্কাস দেখে, নাট্যাভিনয় দেখে, বেড়াতে যায়, পিকনিক করে? এ সবেরই কিন্তু ঐ এক হেতু। সে ভাবে, সারাদিন তো অফিসের কাজে, কি দোকানে বসে কাটল— এখন চল, একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়া যাক—চিন্তায় তো ডুবে আছি, চল, কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা যাক। সে এইভাবে সারা দিনের শ্রম ও সকল চিন্তাকে ভুলতে চায়, বিস্মৃত হতে চায়। তার এই চেষ্টার দ্বারা সে কিছু সময়ের জন্য সকল সম্পর্ক থেকে, ও সেই সঙ্গে সকল চিন্তা থেকে, মুক্ত হয়।

মানব সমাজের সব চেয়ে বড় সমস্যা, সম্পর্ক-জনিত চিন্তা। বাইরে থেকে যখন এত চিন্তা এসে জড়িয়ে ফেলে, তখন বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও তার উৎপত্তি আছে। তার উৎপত্তি স্থল—স্ব-বিস্মৃতি, অর্থাৎ নিজেকে নিজের ভুলে যাওয়া। যখন আপনি দ্বিতীয় কিছুর স্মরণ রাখতে থাকেন, তখন আপনি নিজেকে ভুলতে বাধ্য হন। আপনি নিজেকে না ভুললে অন্য কিছুর স্মৃতি রাখতে পারবেন না, আবার অন্য সব কিছুর স্মৃতি বিসর্জন না দিলে নিজের স্মৃতি রাখতে পারবেন না। নিজের বিস্মৃতি না ঘটলে পরের স্মৃতি থাকে না; আবার পরের বিস্মৃতি না হলে, নিজের স্মৃতি থাকে না। হয় আপনি নিজেকে ভুলবেন নয়তো পরকে ভুলবেন। হয় বাহ্য সম্পর্ককে কম করতে হবে, ছিঁড়ে ফেলতে হবে, নয়তো আপনার নিজের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককেই ছিঁড়তে হবে, নিজের সম্পর্ক-সূত্রকেই কাটতে হবে। এর অর্থ হল, আপনাতে আপনার যে একত্ব ছিল, আপনাতে আপনার একাকীত্বের যে অনুভব ছিল—তা ফেলে দিয়ে, সেখানে বাইরের সঙ্গে অজস্র সম্পর্ক যোজনা করা। এরই নাম—আত্ম-বিস্মৃতি। বাহ্য সম্পর্কই আত্ম-বিস্মৃতির কারণ। যে লোক দ্বিতীয় কিছু সম্বন্ধে জাগরূপ হয়, সাবধান হয়, সে নিজের সম্বন্ধে সুপ্তবৎ হয়ে যায়, অসাবধান হয়ে যায়।

সক্রেটিস প্রাচীন গ্রীসের এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন। একদিন পথে যেতে তিনি সামনে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। সে ছিল এথেন্সের এক প্রসিদ্ধ মদ্যপ। সক্রেটিস দেখলেন সে ব্যক্তি নেশায় চুর হয়ে আছে, কোন মতে টলমল করতে করতে চলছে। তিনি তাকে বললেন, 'সামলে চল, খানাখন্দে পড়ে যাবে।' মদ্যপ সে কথা শুনল, সে তো নেশায় চুর হয়ে আছে। সে বলল, 'আরে মহাত্মা! আমাকে কি শেখাচ্ছ? টলমল করে চলছি তো কি হয়েছে? খানায় যদি পড়ি, তাতেই বা কি হয়েছে? কাপড় যদি নোংরা হয়—হলই বা, আবার ধুয়ে নেব। আমি মদ্যপ, আমি নেশাখোর—সারা শহর তা জানে। যা কিছু হোক, তার জন্য আমার চিন্তা নেই। কিন্তু তুমি মহাত্মা ব্যক্তি। তুমি সামলে চল। তুমি যদি টলতে টলতে খানায় পড়, তোমার একূল ওকূল দুকূল যাবে। খুব সামলে চল, যেন পা পিছলে না যায়। আমাকে আর কেন জ্ঞান দিতে যাচ্ছ?'

এই হল এক দার্শনিক আর এক মদ্যপের মধ্যে কথাবার্তা। মদ্যপ এক বড় রহস্যের উদ্ঘাটন করেছে, এক সার কথা শুনিয়েছে। তার তাৎপর্য হল—যে মদ্যপ, যে নিজেকে ভুলেছে, যে একাকীত্বের আশায় নেশা করেছে, সে যদি টলমল করে, তার পা যদি পিছলে যায়, তবে কোন ক্ষতি বা দুঃখের কারণ হয় না। কিন্তু যে সাধক, যে আপনাকে আপনার মধ্যে পাওয়ার জন্য সাধনা করছে, যে একাকীত্বের সাধনায় রত আছে, তাকে তার নিজের চিন্তা নিয়েই থাকতে হয়, পরের চিন্তা করতে হয় না। সে জন্য মদ্যপ সক্রেটিসকে বলেছিল—'তুমি নিজের চিন্তা কর, আমার চিন্তা ছেড়ে দাও। তুমি যদি পিছলে পড়, তোমার পবিত্রতা নষ্ট হবে, তা কখনও আর ফিরে পাবে না। তুমি আর নির্মল থাকবে না। তুমি আত্ম-বিস্মৃতির গর্তে পড়ে যাবে।'

এই যে আত্ম-স্মৃতির কথা, জাগরূকতা আর সাবধানতার কথা—এগুলি বাস্তবিক পক্ষে সাবধানতার মহান সূত্র। এগুলিই হল—অপ্রমাদ। আমি একলা আছি, এই বিচার-সূত্রকে আত্মসাৎ করে

নেওয়া খুবই বড় সাধনা। এই সূত্র যখন আত্মগত হবে, তখন ব্যক্তি সকল সংকট ও দুর্ভোগ পার হয়ে যাবে, সকল ঝঞ্ঝাট ও সমস্যার অতীত হযে যাবে। এই সব সমস্যা বৈয়ক্তিক, সামাজিক বা জাগতিক হতে পারে। যে ব্যক্তি আপনার মধ্যে আপনার একাকীত্ব অনুভব করে সে এই সব সমস্যাই পার হয়ে যায়। কিন্তু যার একাকীত্বের অনুভব নেই, সে আর এই সব সমস্যা পার হতে পারে না। আর যেহেতু সে সমস্যার পার পায় না, সেহেতু তার মদ চাই, ভাঙ চাই, বিড়ি-সিগারেট চাই, আরও নানা রকমের মাদক বস্তু চাই। এগুলি সবই তার কাছে বিস্মৃতির মাধ্যম। যে আপনা-আপনি একলা হওয়ার রহস্য অবগত হয় নি, উপায় উদ্ভাবন করতে পারে নি— সে এই সব বাহ্য সাধনাকেই নিজের করে নেয়। কিন্তু এই সব বাহ্য সাধন উপকারের বদলে অপকারই করে। এদের থেকে ক্ষতিই হয়।

অপ্রমাদ আত্ম-স্মৃতির এক শক্তিযুক্ত সাধনা। এর অর্থ হল— আপনাতে আপন একাকাত্বের অনুভব করার অভ্যাস। এটা সাধনার পরম সূত্র তো বটেই, ব্যবহারেরও এটা মহান সূত্র। এ ছাড়া ব্যবহারিক জীবন সুখী ও আনন্দময় হয় না। আপনি যতদিন আপনাতে আপন একাকীত্ব অনুভব করতে সমর্থ না হবেন ততদিন চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন না। আমি কথাটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। ধরুন, এক পরিবার আছে। সেই পরিবারে পিতা মনে করে, পুত্রের ওপর তার অধিকার আছে; স্বামী মনে করে, স্ত্রীর ওপর তার অধিকার আছে। সম্পর্ক আছে বলেই পিতা আপন দায়িত্ব বোধ করে, আর মনে করে পুত্রের ওপর তার অধিকার আছে। স্বামীর ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা। কিন্তু যেখানে সম্পর্ক আছে, দায়িত্বের সেখানে চিন্তা নিশ্চযই উৎপন্ন হবে। এখন হযেছে কি, পিতা একদিন বসে আছে, তার খুব পেপাসা হযেছে, অথচ ছেলে জলের গেলাস হাতে নিয়ে আসে নি। আগের দিন যে সময়ে বাপকে জল খাইয়েছিল আজ সেই সময়ে জল নিয়ে আসে নি। পিতা অমনি ভাবতে আরম্ভ

করলেন, ছেলের আমার দিকে মন নেই। সে খাওয়ার জল আনল না? এই রকম চিন্তাই পিতার মনে উৎপন্ন হল। কিন্তু কেন হল? ছেলের পক্ষে এটা কি খুবই জরুরী যে, সে জলের গেলাস হাতে নিয়ে আসবে? আচ্ছা, জরুরীই বটে, কর্তব্য তো বটেই। কিন্তু এমন তো হতে পারে যে সে ভুলে গিয়েছে, ঠিক সময়ে তার কথাটা মনে হয় নি। পিতার পক্ষে কি নিতান্তই এটা দরকার যে সে এই ব্যাপারটা নিয়ে এতটা ভাবতে থাকবে, নিজেকে এতটা দুঃখী বোধ করবে? সত্যিই তার এত চিন্তাতুর হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবুও সে চিন্তাতুর হয়, কারণ তার একাকীত্বের অনুভব নেই।

একাধিক স্তরে আমাদের জীবন চলে। তাদের এক স্তরে আমরা অনুভব করি, আমাদের পরিবারে অনেক সদস্য আছে—চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন সদস্য আছে। কিন্তু তাতে একটা অসুবিধা হতে পারে। আমরা যদি কেবল বাইরে থেকে মনে করি যে আমরা পঞ্চাশ জন, তবে সব ঠিকই আছে। কিন্তু যদি আমরা ভেতর থেকেও ভাবতে থাকি আমরা পঞ্চাশজন, আমরা একলা নই, তবে অনেক সমস্যার উৎপত্তি হবে।

আমাদের অনুভূতি দুই স্তরেই হওয়া দরকার। এক ব্যবহারের স্তর, যে স্তরে আমাদের অনুভব হয় আমরা একলা নই, আমরা পঞ্চাশজন আছি। আর এক যথার্থতার স্তর, যে স্তরে আমাদের অনুভব হয় যে আমরা প্রত্যেকে একলা, আমাদের আর কেউ নেই। যদি এই দুই অনুভূতি এক সঙ্গে চলে তবে কোন সমস্যা বা অসুবিধা হয় না। কিন্তু যখন আমাদের অনুভূতি একাঙ্গী হয়, তখন প্রচুর সমস্যা দেখা দেয়। যখন কোন ব্যক্তি ব্যবহারের স্তরের সঙ্গে যথার্থতার স্তরকে মিশিয়ে ফেলে, তখন বিপদ হয়। যতক্ষণ সে জানে ব্যবহারের দিক থেকে সে পঞ্চাশ, কিন্তু যথার্থতার দিক থেকে সে এক—সে একলা, ততক্ষণ কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু যখনই সে মনে করে যেহেতু ব্যবহারে সে পঞ্চাশ, সেহেতু যথার্থই সে পঞ্চাশ,

সে একলা নয়, তখনই নানা সমস্যা এসে যায়। আজ পিতা বৃদ্ধ হয়েছে, অর্থোপার্জনে অসমর্থ হয়েছে। পরিবারের যে স্বার্থ তার দ্বারা সাধিত হতো, তা বন্ধ হয়েছে। এমন অবস্থায় তার প্রতি পরিবারের লোকদের উপেক্ষা আসতে পারে। তারা তাঁর কথাকে আর তেমন গুরুত্ব দেয় না। তখন সে ভাবতে থাকে, 'আরে, এ কি ব্যাপার। বিশ বছর আগে আমার সারা পরিবার আমার ইশারায় চলত, আমি ভ্রূকুটি করলে সকলে ভয়ে কাঁপত, একবার ডাকলে সকলে আমার সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াত। আর আজ কেউ আমার কথা শোনে না। আদর করা দূরে থাকুক, ছোট-বড় সকলে আমাকে তিরস্কার করে, আমাকে উপেক্ষা করে।' এইসব ভেবে বৃদ্ধ দুঃখী হয়ে যায়, চিন্তাতুর হয়ে যায়। একদিকে তার বিশ বছর আগেকার স্মৃতি কাজ করছে, অন্য দিকে তার বর্তমান পরিস্থিতি। যখনই সে তার আগেকার পরিস্থিতি বর্তমানের সঙ্গে জুড়তে চেষ্টা করে, তখনই তার দুঃখের অবধি থাকে না। তার মনে হয়, 'এই কি বেঁচে থাকা? কি হয়ে গেল? দুনিয়াই বদলে গেল, না যুগ পালটে গেল?'

এটা আমার কল্পনামাত্র নয়। অনেক লোকেরই এই রকম পরিস্থিতি, এই রকম অনুভব। নিজের প্রমাদের জন্যই লোকে দুঃখী হয়। সে যদি যথার্থতার দিক থেকে প্রমাদী না হত, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সে দুঃখ বোধ করত না। তার প্রমাদ এই যে, যা কেবল ব্যবহারের বেলায় সত্য, তাকেই সে যথার্থ সত্য বলে মেনে নিয়েছে। এই ভুলই তার দুঃখের কারণ হয়েছে। ব্যবহারের সত্য এই যে, পিতার প্রতি পুত্রের কি কথা, দূরের লোকও 'যে আজ্ঞা' বলে উপস্থিত হয়, আদেশ মানে, আদর দেখায়, চোখের ইশারায় ওঠে-বসে। যেমনি স্বার্থের বন্ধন টুটে যায়, তেমনি পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। সব কিছুই বদলে যায়। এখন আমাদের যদি স্পষ্ট অনুভূতি থাকত, জীবনের প্রতি অপ্রমত্ততা থাকত, জাগরূকতা থাকত, তবে আমরা স্পষ্টই অনুভব করতাম যে, আগে আমাদের যে ভূমিকা ছিল, সেখানে

আমরা অন্য অনেকের জন্য ছিলাম, আব সেজন্য তখনকার ব্যবহার ছিল এক রকম; আর এখন আমাদের যে ভূমিকা, সেখানে আমবা অন্য কারও জন্য নয়, কেবল নিজের জন্য, সুতরাং এখনকার ব্যবহার হবে অন্য বকম। দুই ব্যবহারের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ হবে, আকাশ-পাতাল ফারাক হবে। এই যে আমরা মনে করছি 'এটা আমার'—এর মূলেই আছে আমাদের আত্মা সম্বন্ধে বিস্মৃতি। তুমি কি করে ভাবতে পার, এটা তোমার নিজস্ব? কখনও নিজস্ব কিছু হয না। বস্তুত এই বিপবীত অনুভূতি হওয়া চাই যে, আমি একলা, আমি কেবল আমিই, আমার কেউ নেই। এটাই যথার্থ, এটাই প্রকৃত সত্য। এই আমাব পবিবার, এই আমার পত্নী, এই আমার পুত্র, এই আমার ভাই, এই আমার মিত্র—এসবই আমাদের ব্যবহারের ভূমি। ব্যবহাবের ভূমিতেই ব্যবহাবের বোধ থাকে, ব্যবহারের অনুভূতি থাকে, সম্পর্কেব বোধ থাকে। কিন্তু যখন চরম ও পরম সত্যের প্রশ্ন ওঠে, তখনই অনুভূতি হয় যে প্রকৃতপক্ষে আমি একলা, আমার কেউ নেই, আমিও কারও নই। যদি কারও এই অনুভূতি তীব্র হয়, তবে তার বয়স ষাট হোক, সত্তর হোক, পরিবারের লোকেরা তাকে উপেক্ষা করুক—কোন কিছুতেই সে আর দুঃখী বোধ করবে না, চিন্তাপীড়িত হবে না। সে তখন ভাববে, 'আমি যখন অন্যেব কাজে লাগতাম তখন পরিবারের লোকেরা আমাব খাতির করত, বন্ধুরা পরামর্শ নিত। আজ তো আমি অন্য কারও জন্যই নই, তবে ওরাই বা আমাকে খাতির করবে কেন? আর ওদেব খাতির আমি চাইও না।' এই চিন্তাই তাব দুঃখ মোচন করবে।

তেরাপন্থ সংঘে এক সন্ত ছিলেন, তাঁর নাম ছিল মগনলালজী স্বামী। তাঁকে মন্ত্রী-মুনি বলা হত। তাঁব জীবনী পড়লে মনে হয়, তাঁব মত বুদ্ধিমান, বিবেকী, তত্ত্বজ্ঞ ও অধ্যাত্মরত ব্যক্তি অতি বিরল। তাঁর সত্তর-আশি বয়স হয়েছিল, কোন মুনি যদি তাঁকে জলপান করাতেন, তবে খুবই ভাল, যদি না করাতেন, তবে তাও কিছু

খাবাপ নয়। আমি তাঁকে কখনও ক্রোধ প্রকাশ করতে দেখিনি। যখন কোন মুনি নিজেব ভুল বুঝতে পেবে তাঁকে বলতেন, 'ক্ষমা করুন, আমাব ভুল হযে গিয়েছে, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আপনাকে জলপান কবাতে পাবি নি'; তখন মন্ত্রী-মুনি উত্তর করতেন, 'ভুল হযেছে তো কি হযেছে, এমন কিছু মারাত্মক ভুল তো নয়। আমার যদি পিপাসা পেত, সামনে যাকে দেখতাম তাব কাছ থেকে জল চেযে নিতাম। তা সম্ভব না হলে, এটা সামান্য কষ্ট মনে করে সহ্য কবে যেতাম। ব্যাপারটা কিছু গুরুতর নয।' এই বকমই ছিল তাঁব কথা। এব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি ছিলেন নিজের মধ্যে লীন হযে যাওযা আত্মসমাহিত ব্যক্তি। তিনি এই বকম মনে করতেন যে, কেউ যদি কাবও জন্য কিছু করে তা নিজ গুণেই কবে। এমন নয যে তার ঋণ আছে, যা তাকে শোধ কবতেই হবে। এই রকম অনুভূতি সেই ব্যক্তিরই হতে পারে যে বাস্তবিকই অনুভব করেছে যে, সে একলা। যে একাকীত্বের এই সূত্র আবিষ্কার করেছে, জীবন-যাপনের এই কৌশল আযত্ত করেছে, সে প্রকৃতপক্ষে সুখী জীবনেব অধিকারী হযেছে। যে এই সূত্র আবিষ্কার কবতে পারে নি, সে অন্যের মধ্যে হাজার দোষ দেখতে পায়। সে সর্বদা অনুযোগ করে, 'ও এটা করে নি, ও এই বকম করেছে, ও ঐ রকম কবেছে'—ইত্যাদি। তার অভিযোগেব অন্ত থাকে না। অভিযোগেব ভাব তখনই আসে যখন ব্যক্তিব আত্ম-বিস্মৃতি হয়, অর্থাৎ ব্যক্তি যখন নিজেকে ভুলে যায।

অপ্রমাদের সূত্র হল—আত্ম-স্মৃতি অর্থাৎ নিজের নিজেকে স্মবণ রাখা, এই ধারণাকে পুষ্ট কবা যে, আমি একলা আছি—'একোঽহম্'। একত্ব ভাবনার যে সংস্কাব আমাদেব মধ্যে আছে, তাকে দৃঢ করতে হবে। এই ভাবনা পুষ্ট হলে আত্ম-স্মৃতিব ক্ষেত্রে প্রবেশ কবা যায়, অপ্রমত্ত থাকার অভ্যাস হয। এখানে আর একটা ব্যাপার বুঝতে হবে। 'আত্মার স্মৃতি' বলে ঠিক কোন কথা হয না। আত্মা তো আমাদের

স্বভাব, আমাদের স্বরূপ। স্বভাবের স্মৃতি তারই হতে পারে, যা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। স্বভাব বিস্মৃত হতে পারি না, সুতরাং তার স্মৃতিও সম্ভব নয়। এ কথা সত্যি বলেই মানতে হবে। প্রকৃত তথ্য এই যে, আমরা এক ব্যবধান রচনা করে বসেছি; আর এই ব্যবধানের দরুণ ভুলেই গিয়েছি, আমরা কে বা কি। আমরা বাহ্য বস্তুর ওপর, অনাত্মীয় বিষয়ের ওপর, আত্মীয়তা আরোপ করি, অথচ নিজের আত্মার দিকে দৃষ্টি দিই না। এই যে বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক—এটাই প্রমাদের বড় কারণ। বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাই অপ্রমাদের সাধন। আমাদের অজ্ঞানের কারণে, ভুল দৃষ্টিকোণের কারণে, মতিভ্রমের কারণে, মানসিক বাচিক ও কায়িক চঞ্চলতার কারণে, প্রমাদ উৎপন্ন হয়। নিদ্রাও প্রমাদের হেতু হতে পারে। নিদ্রার সময়ে ব্যক্তি নিজেকে বিস্মৃত হয়। নিদ্রায় যে অবস্থা হয় তার সঙ্গে নেশার অবস্থার খুব বেশি পার্থক্য নেই। দুই অবস্থাতেই আত্ম-বিস্মৃতি হয়। নিদ্রা ভুলে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু তাও প্রমাদ, প্রমাদের হেতু ও প্রমাদের উৎপাদক। এই কারণে সাধনের জন্য সাধকের নিদ্রা জয় করা দরকার। নিদ্রাবিজয় সাধনার আবশ্যকীয় অঙ্গ। ইন্দ্রিয়ের লোলুপতাও প্রমাদের কারণ, সেজন্য ইন্দ্রিয় সংযম সাধনার অঙ্গ। ইন্দ্রিয়-সংযম সাধককে অপ্রমত্ততার দিকে নিয়ে যায়। যতক্ষণ অপ্রমাদের সাধনা করা না হয়, ততদিন অধ্যাত্মের অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই যায় না। অপ্রমাদ সাধনার এক সশক্ত সূত্র। প্রমাদ হল ভয়, অপ্রমাদ অভয়। ভগবান মহাবীর বলেছেন, 'সব্বও পমত্তস্স ভয়ং'—প্রমাদীর চার দিকেই ভয় ঘিরে থাকে। সর্বত্রই তার পক্ষে ভয় আর ভয়, এক ক্ষণের জন্যও সে অভয়ের দশা পায় না। তার প্রতি ক্ষণই ভয়ের মধ্যে কাটে। সকলের মধ্যেই সে অবিশ্বাসের গন্ধ পায়। আপন ধন-ভাণ্ডারের চাবি কাউকেই দেয় না, তার মনে ভয় থাকে কেউ হয়ত তার ধন নিয়ে পালিয়ে যাবে। নিজের ছেলেকেও সে চাবি দেবে না, কারণ তার ভয় আছে যে, ছেলে ধন-ভাণ্ডারের

চাবি পেয়ে গেলে তাকে আর মানবে না, তাকে তোয়াক্কা করবে না। সে তার স্ত্রীকেও চাবি দেবে না, কারণ সে ভাববে, চাবি দিলে মা ও ছেলে দুজনে মিলে তার দুর্দশা ঘটাবে, তাকে একেবারে হেনস্থা করে ছাড়বে। সুতরাং অন্তিম কাল পর্যন্ত সে কারও হাতে চাবি ছাড়বে না, কারণ তার যে ভয় থাকবে। এই ভয়ই প্রমাদ।

কেউ কেউ একেই জাগরূকতা বলে। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এই জাগরূকতার পশ্চাতে ভয়ই ক্রিয়া করছে। এর পরে এরা আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করবে, এই রকম ভয়-মিশ্রিত চিন্তা যদি না থাকত, তবে এই প্রকার জাগৃতিও আসত না। এই জাগৃতির কারণই যে ভয়। কখনও কখনও আমি এরকম ঘরে বাস করেছি, যে ঘরের আলমারিতে লাখ টাকার টাকার মাল পড়ে থাকে। সে ঘরে কোন পাহারাদার নেই, চৌকিদার নেই, কেবল আমিই আছি। বাড়ির মালিক সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। সে জেগে নেই, কারণ তার এই ভয় নেই যে, মুনি তার ধন বের করে নেবে। তার মনে কোন ভয় নেই, তাই সে জেগে থাকে না, সুখেই নিদ্রা যায়। যেখানে ভয় নেই, সেখানে পরম নিশ্চিন্ততা।

এক আশ্চর্য এই যে, লোকে এই ভেবে চলে যে, তারা পঞ্চাশ জন কি একশ জন—যেন তারা এই পঞ্চাশ কি একশ জন মিলে একই ব্যক্তি। অথচ তাদের প্রত্যেকের মনেই অপর প্রতিটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে। কোন ব্যক্তিই অপর ব্যক্তিকে মনের সব কথা খুলে বলে না, কাউকে কিছুটা বলে, অপর কাউকে আর কিছুটা, এই রকম। যে কোন পরিবারের কর্তাই সেই পরিবারের কোন সদস্যকে পরিবার-সংক্রান্ত সব খুঁটিনাটি বিষয় জানায় না, কাউকে খানিকটা জানায়, আর কাউকে আর খানিকটা জানায় —কিন্তু কাউকেই সবটা জানায় না। তার মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে, সেখানে পৃথক পৃথক ভয়ও আছে। মূলে এ সবেরই উৎপত্তিস্থল ভয়। ভয় হলে জাগতে হয়, ভয় না থাকলে জাগার প্রয়োজন হয়

না। এই ভয় আবার উৎপন্ন হয় বাহ্য সম্পর্ক থেকে। বাহ্য সম্পর্ককেই নিজেব বলে মেনে নিয়েছি, তাই ভয় হয়—পাছে সেই সম্পর্ক টুটে যায়। এই ভযেব জন্যই নানা প্রকার প্রমাদ এসে উপস্থিত হয।

এই বকম অবস্থায় অপ্রমাদের উপায় হল, একাকীত্বেব অনুভূতি। অবশ্য সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন ব্যক্তি ব্যবহাবের ভূমিতে বাস করতে পারে না। আমি একথা বলছি না যে, ব্যবহারকে তুলে দিতে হবে। তা কোন ব্যক্তি করতে পারে না। ব্যবহার ত্যাগ করে কোন ব্যক্তি জীবন ধাবণ কবতে পারে না। সংসার ত্যাগ চলবে না। এই সব কথায় ব্যবহাব বন্ধ হবে না, বরং আরও মধুর হযে উঠবে। বাস্তবিকই যদি আপনি আপনার মধ্যে আপন একাকীত্ব অনুভব করতে পারেন তবে অনেক কঠিন অবস্থা থেকে বেঁচে যাবেন। আপনাকে চিন্তা আর দুঃখের শিকার হতে হবে না। অন্যেব ব্যবহার দেখে আপনি জড়িয়ে পড়বেন না, বা দুঃখী হবেন না। তখন আপনার নিজের ব্যবহাব অন্যের কাছে মধুব লাগবে। আপনার মস্তিষ্কে তখন যে চিন্তা-সূত্র ক্রিয়াশীল হবে তা হল—আমি একলা। যখন কোন সমস্যা আপনার সামনে আসবে তখন এই চিন্তাসূত্র ধরেই সমাহিত থাকবেন। সমস্যা আপনাকে পীডিত করবে না। যে সমস্যা ষোল আনা ছিল, তা এক আনা মাত্র হযে যাবে। তা আপনি ব্যবহারেব ভূমিতে সমাধান করে নিতে পারবেন। যদি একাকীত্বেব এই আলম্বন-সূত্র আপনার কাছে না থাকে, তবে ছোট সমস্যাও বড় বলে মনে হবে। সহজে তার সমাধান হবে না। বস্তুত অপ্রমাদের সাধনা কি ব্যক্তিগত জীবন, কি ব্যবহারিক জীবন—দুই ক্ষেত্রেই সমান ভাবে লাভপ্রদ ; দুই ক্ষেত্রেই তা সমস্যার সমাধান হতে সক্ষম। এই সাধনা সমস্যা মোচন কবে, আবার আমাদেব এক পা এক পা করে এগিযে যেতেও সাহায্য করে।

আমরা সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত হই, আবার সম্পর্ক থেকে পালিযে যাই, সম্পর্ক এড়িযে যাই। যুক্ত হওয়া আর পালিযে যাওযা—এই দুই ব্যাপারই ঠিক। জুড়ে যাওয়া ভাল, ভেগে যাওযাও ভাল। সমূহের

মধ্যে থাকাও ভাল, একলা থাকাও ভাল। এদের মধ্যে কোন একটাই কেবল ঠিক, এমন বলা যাবে না। কারণ আমাদেব ব্যবহাবেব জীবন যাপন করতেই হয়। আমাদের ব্যবহারের একটা স্তর আছে—যেখানে আমাদের শবীর থাকে, আমাদেব জীবন থাকে। সে স্তব আমাদেব আবশ্যক তো বটেই। আমাদেব রুটি খেতে হয়, কাপড় পরতে হয়, ঘব বানাতে হয, ঘবে থাকতে হয—এ সবই তো আমাদের অপরিহার্য। এই পবিস্থিতিতে আমবা সম্পর্ক ত্যাগ করতে সমর্থ হব কি করে? সব সম্পর্কের সাহায্যই আমাদের নিতে হবে। কিন্তু যখনই আমরা বাস্তবিকতাব জগতে বাস কবি, প্রকৃত সত্যেব জগতে বাস কবি, যথার্থতার জগতে বাস কবি, তখনই আমবা প্রত্যেকে একলাই বাস করি। তখন আমাদের একলাই থাকতে হবে। অন্যথায় অনেক কঠিন ভার আমাদেব বহন কবতে হবে। এব কোন বিকল্প নেই।

আশ্চর্য ভিক্ষু ভাবি সুন্দর একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'গণের মধ্যে থেকেও তুমি একলা থাক।' কথাটা স্ব-বিবোধী বলে মনে হতে পাবে। শাসনের অধীন থাকব, সমূহের মধ্যে থাকব, আবার একলাও থাকব—এ কেমন করে সম্ভব? হয সমূহের মধ্যে থাকতে হবে, নয একলা থাকতে হবে। একই সঙ্গে তো দু ভাবেই থাকা যায় না। কথাটাব মধ্যেই যে বিরোধ আছে। অসংখ্য সাধু-সাধ্বীর মধ্যে থাকব, আবার একলাও থাকব—কথাটা স্ব-বিবোধী তো বটেই। কিন্তু সেরকম মনে হলেও, কথাটার সত্যিই কোন বিবোধ নেই। তার তাৎপর্য বুঝতে হবে। তাৎপর্য এই যে, তুমি সংঘে থাক, তোমার সেবা অপর সাধুকে দাও, আবার আবশ্যক হলে তার কাছ থেকে সেবা নাও। তুমি তার সহযোগিতা কর, আব প্রয়োজনে তার সহযোগিতা প্রার্থনা কব। তুমি লোককে বোঝাও, উপদেশ দাও, তাদেব কাছ থেকে যা নেওযার আছে, তা নাও। কিন্তু কারও সঙ্গে গাঁটছড়া বেধো না, কাবও সঙ্গে দল বেধো না।

গণ মেঁ রহুঁ নির্দাব অকেলো,
কিণ্ সুঁ হী নহীঁ বাঁধু্ঁ কীলো।

'আমি গণে থেকেও একলা থাকব, কারও সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধব না, কাবও সঙ্গে দল বাধব না।' এই কথার তাৎপর্য, সহযোগের স্তরে তুমি একলাই থাক। আর যদি কেবল সমূহেব মধ্যেই থেকে যাও, সংগঠনের মধ্যেই থেকে যাও, তবে তোমার সাধনাও শেষ হযে যাবে। কেবল সংগঠনের ভার, সংগঠনের চিন্তা যদি তোমার মাথায় থাকে তো তোমার সাধনার সমাপ্তি ঘটবে। তোমাকে সাধনাও করতে হবে, আর তোমার আবশ্যকতা-পূর্তির জন্য সংগঠনকেও বাঁচিযে রাখতে হবে। এই দু দিক রক্ষা হলেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হয। কেবল একলা থাকাই সব নয়, আবার কেবল সংগঠনের মধ্যে থাকাও সব নয। তেমনি কেবল পরিবারেব মধ্যে থাকাই সব নয়, আবাব কেবল একলা থাকাও সব নয়। যেখানে সুখ-সুবিধা, সহযোগ প্রভৃতি দেওয়া-নেওযার প্রশ্ন আছে, সেখানে ব্যক্তি পরিবারের মধ্যেই থাকে, সম্পর্ক জোড়া দেয় আর অনেকের মধ্যেই বেঁচে থাকে। যেখানে যথার্থতার অনুভব করা প্রয়োজন, সম্পর্ক থেকে উৎপন্ন জটিল সমস্যার সমাধান করা আবশ্যক, সেখানে একলা থাকতে হবে, একাকীত্বের বোধ দৃঢ় করতে হবে। এই দুই ভাব এক সঙ্গে মিললে জীবন পবিপূর্ণ ও অখণ্ডিত হয়। তখন আমরা আর এ পাড়েও জড়িযে যাব না, ও পাড়েও জড়িয়ে যাব না; দুই তটই পার হযে চলে যাব।

৩

২৩

জ্ঞান ও সংবেদন

সংবেদন এবং অহং—উভয়ে সাথে সাথে চলে। রাজা শুনলেন নগরে এক শক্তিশালী সাধু এসেছেন। বড়ই বিচিত্র তাঁর কার্যকলাপ। হাজার হাজার লোক আসছে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে তাঁর যশোগান। রাজা তাঁর কাছে নিজের লোক পাঠিয়ে প্রার্থনা জানালেন সাধুজী যেন রাজাকে একবার দর্শন দেন। সন্ন্যাসী বললেন—'আমি রাজার প্রাসাদে যেতে পারব না, রাজা যদি দর্শন করতে চান তবে এখানে এসে অনুগ্রহ করে দর্শন করুন।' প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধা ছিল রাজার, সন্ন্যাসীর নয়। ক্ষুধিত লোকেরই ভোজ্যের কাছে আসতে হয়। পিপাসা ছিল রাজার, সন্ন্যাসীর নয়। পিপাসিত লোককেই পানীয়ের কাছে আসতে হয়। তখন রাজা স্বয়ং সন্ন্যাসীর কাছে গেলেন এবং তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন। সন্ন্যাসী প্রাসাদে এক দিন থাকলেন, দুদিন থাকলেন, মাস ভোর থাকলেন। তিনি চলে যাবার নামও করেন না। রাজা ভাবলেন, 'এ কেমন? আমি কোন্ আপদ ডেকে আনলাম? আমি তো ভেবেছিলাম বনবাসী লোক, দু-এক দিন প্রাসাদে থেকে চলে যাবেন। কিন্তু তিনি তো এখান থেকে চলে যাবার নামও করেন না।' এক দিন রাজা সন্ন্যাসীকে বললেন, 'মহারাজ, চলুন আমরা বনে বেড়িয়ে আসি।' সন্ন্যাসী এবং রাজা ভ্রমণ করতে বের হলেন। তাঁরা চলতে

চলতে নগর থেকে বহু দূর গেলেন। বাজা বললেন, 'আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। এবাব চলুন প্রাসাদেব দিকে ফিবে যাই।' সন্ন্যাসী বললেন, 'আব প্রাসাদে ফিরে যাব কেন? আমি তো বনের দিকেই চলেছি।' তখন রাজা বললেন, 'মহাবাজ, আপনিও প্রাসাদে থাকতেন আব আমিও প্রাসাদে থাকতাম। তবে আপনার আর আমার মধ্যে প্রভেদ কি আছে?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি প্রাসাদে ছিলাম, কিন্তু আমাব মনের মধ্যে প্রাসাদ ছিল না, আর তুমি প্রাসাদে থাক, প্রাসাদ তোমাব অন্তর অধিকার করে আছে। তোমার আমার মধ্যে এই প্রভেদ। আমি বনে থাকলেও প্রাসাদে অবস্থান কবি, প্রাসাদে থাকলেও বনে বাস করি। আমি যখন বনে থাকি তখনও নিজেব ভাবে নিমগ্ন থাকি, যখন প্রাসাদে থাকি তখনও নিজের ভাবে নিমগ্ন থাকি। আমার মনে আমার অন্তবে প্রাসাদ ছিল না। প্রাসাদে বাস করা বা বনে বাস করা আমাব অন্তরের ব্যাপার নয়। আমার কাছে উভযই সমান। তোমার পক্ষে দুই-ই সমান নয। তোমাব কাছে জঙ্গল জঙ্গল এবং প্রাসাদ প্রাসাদ বটে।'

সম্পত্তি থাকা বা না থাকা—উভযের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। পার্থক্য কেবল অন্তরে, সম্পত্তির বোধ হওয়াব এবং না হওযায।

একবার গৌতম ভগবান মহাবীবকে জিজ্ঞাসা করেন—'ভন্তে, ছয খণ্ডের অধিপতি চক্রবর্তী বাজা এবং সূক্ষ্ম জন্তু উভযে কি সমান?'

মহাবীর বললেন, 'হ্যাঁ, উভযে সমান।'

'ভন্তে, আপনার কথায় বড়ই আশ্চর্য বোধ করছি। দুই-ই সমান হতে পাবে কি করে? কোথায চক্রবর্তী সম্রাটের ঈশ্বর্য ও প্রভুত্ব আব কোথায ক্ষুদ্র প্রাণীব জীবন!'

'গৌতম! বাজচক্রবর্তীর মধ্যে যতটা আকাঙ্ক্ষা আছে প্রাণীর মধ্যেও ততটাই আকাঙ্ক্ষা আছে। ঐশ্বর্য বা প্রভুত্ব থাকা বা না থাকা আলাদা প্রশ্ন, কিন্তু আকর্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে উভযেই সমান। যতটা

আকর্ষণ চক্রবর্তী সম্রাটে আছে ততটাই আকর্ষণ প্রাণীতে আছে।' উভয়ের মধ্যেই অবিরতি সম পরিমাণে বিদ্যমান। যেখানে উভয়ের অবিবতিব সমতা সেখানে উভয়ে সমতাপ্রাপ্ত হয়েছে।' কি গূঢ় তাৎপর্য-পূর্ণ কথা। যখন সংবেদনা জাগ্রত হয তখন বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায। যখন সংবেদনাব সংহরণ হয তখন অন্তর্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যখন মনেব সংবেদন বৃদ্ধি পায় তখন অহং উৎপন্ন হয। যদি মনে সংবেদন না থাকে তবে সম্পত্তি বা ঐশ্বর্যের পবিগ্রহ ঘটে না। যখন সম্পত্তিপবিগ্রহ ঘটে তখন মনে সংবেদনা জেগে উঠে।

দুটি ব্যাপার আছে—একটি জ্ঞানের ধাবা, অপরটি সংবেদনা। আমবা যেন জ্ঞানের ধারাকে জ্ঞানেব ধাবা রূপেই থাকতে দিই। আর চেতনার জ্যোতিবশ্মিকে যেন চেতনার জ্যোতিবশ্মি রূপেই সংবক্ষিত কবি। একেই বলে সাধনা, এরই নাম আত্মদর্শন। এরই নাম প্রকাশ। একেই আমাদেব জানতে হবে, মানতে হবে এবং এর মধ্যেই থাকতে হবে। তাতে কোনও অসুবিধা বা বিঘ্ন হবে না।

যখনই জ্ঞানেব ধারা সংবেদনার গুরুত্বাকর্ষণের ক্ষেত্রে এসে পড়ে তখনই তা সংবেদনায় পরিণত হয়। তাতে ভাব এসে যায, আর তা ভেতর থেকে বাইরেব দিকে প্রবাহিত হয়। অন্তরীক্ষযাত্রী যখন অন্তরীক্ষেব সীমার মধ্যে থাকে তখন সে ভারশূন্য। তখন সে কালের সীমাকেও লঙ্ঘন করে। কিন্তু যখন সে পৃথিবীব গুরুত্বাকর্ষণের সীমার মধ্যে চলে আসে তখন সে ভারি হযে যায় এবং কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হযে যায। এই ভাবে যতক্ষণ আমাদেব চেতনার ধারা, আমাদের জ্ঞানেব ধারা, বিশুদ্ধ রূপে প্রবাহিত হতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সাধনা, তথা পবিত্রতা। যখনই তা হৃদযাবেগেব গুরুত্বাকর্ষণের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখনই বাসনা, লোভ, বঞ্চনা, মান প্রভৃতি সমুদয় দোষ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি বিষয়ের ওপরে আমাদের ধ্যান

কেন্দ্রিত করা প্রয়োজন। প্রথম কথা হল, আমাদের চেতনাকে চেতনা রূপেই থাকতে দেব। আর দ্বিতীয় কথা—আমরা চেতনাকে সংবেদনায় পরিণত হতে দেব না। চেতনাকে চেতনা রূপে সংরক্ষণের প্রধান উপায়—শুদ্ধ উপযোগ। জ্ঞানকে জ্ঞানরূপে জানা ও দেখা, সহজ আনন্দকে অনুভব করা, অনন্ত শক্তিকে উপলব্ধি করা, এই চেতনাকে চেতনার পরিধির মধ্যে সংরক্ষণের রূপ। যেখানে রশ্মির পরিবর্তন ঘটে সেখানে চেতনারও পরিবর্তন ঘটে। তার মূল কারণ হৃদয়াবেগের গুরুত্বাকর্ষণ। চেতনার ওপরে হৃদয়াবেগের ভার পড়লে চেতনা আর চেতনা থাকে না। তা বিকৃত হয়ে যায়। আমাদের চেতনায় স্থিতির ক্ষণই আমাদের জাগরূকতার ক্ষণ। সেই ক্ষণই আমাদের সাধনার ক্ষণ, তথা আমাদের আত্মদর্শনের ক্ষণ। ঐ ক্ষণ আমাদের চেতনার অভিমুখী হওয়ার ক্ষণ। যখন চেতনা হৃদয়াবেগ দ্বারা ভাবগ্রস্ত হয় তখন বাসনা, বঞ্চনা তথা অহমের ক্ষণ। তখন আমাদের সামনে সমস্যা এসে যায়। সংবেদনা সমস্যা উৎপাদন করে। ভয়, ঘৃণা, বাসনা, লোভ, আবেগ সবই এক একটি সমস্যা। এ সমস্ত সমস্যার মূল—হৃদয়াবেগের গুরুত্বাকর্ষণ। তার অভাব হলে সমস্যার অভাব হয়, এবং চেতনা চেতনা রূপে স্থিত হয়।

দুই স্থিতি অত্যন্ত স্পষ্ট। এক চেতনার বিশুদ্ধ স্থিতি, চেতনার ভাবাবেগসম্বলিত স্থিতি। সাধকের জাগরূক থাকা প্রয়োজন। তার চেতনাকে চেতনার সীমার মধ্যে থাকতে দিতে হবে। সেটাই সাধনা। ঐ হল আত্মার উপাসনা। যে লোক চেতনাকে চেতনা রূপে থাকতে দিতে পারে সে ভাবাবেগের গুরুত্বাকর্ষণ থেকে বাঁচতে পারে। সে-ই বাস্তবে আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

২৪

জপ ও মৌনতা

দুটি লোক নদীব ধারে এল। তাবা নদী পার হতে চায। তারা দেখল নদীর কিনাবায একটি নৌকো আছে। একজন বলল—'নাবিক তো নেই, কিন্তু নৌকো পডে আছে। কাজেই আমরা নদী পার হতে পারব।' দ্বিতীয় জন বলল—'এরকম হওযা সম্ভব নয়। নদী পার হতে হলে কেবল নৌকো থাকলেই যথেষ্ট নয। নাবিকও চাই, দাঁডও চাই, নৌকো চালনার কৌশলও জানা চাই। এইসব হলে তবে নদী পার হওযা সম্ভব হয।' প্রথমজন বলল, 'এ বকম কি করে হতে পারে? জীবন-ভোর শুনছি নদী পার হতে হলে নৌকোয় চড়ে পার হও। নৌকো পড়ে আছে। অন্য কোন বস্তুর কি আবশ্যকতা আছে?' দ্বিতীয় লোকটি তাকে বোঝাল, কিন্তু সে তার কথা মানল না। সে নৌকো পাড় থেকে খুলল, তাতে একাই বসল। জলেব এক ঢেউ এসে লাগল, আর নৌকো এগিযে চলল। নৌকো নদী পার হওয়াব উপায, কিন্তু আজ ঐ যাত্রীব পক্ষে নৌকো তাব ডোবার কারণ হল। যে পার হওযাব উপায, সে কখনও কখনও ডোবাব কাবণ হতে পারে। বাস্তবে যে পার করতে পাবে এবং যে ডোবাতে পারে—দুই ভিন্ন নয়, একই হয়ে থাকে। যে তারক,

সে-ই নিমজ্জক আর যে নিমজ্জক, সে-ই তাবক। বাস্তবে এ দুটি স্বতন্ত্র নয। তাদের প্রভেদ সংযোগেব প্রভেদ। নৌকো চলল, লোকটি শান্তভাবে বসে থাকল। জলেব খুব তোড ছিল, স্রোত প্রবল ছিল। নৌকোটি টলমল করে চলতে লাগল। কিছু দূর যাওযাব পরে নৌকোটি উলটে গেল। আরোহী জলে ডুবে গেল।

নৌকো নদী পার করে দেয, একথা ঠিকই বটে। কিন্তু তাব অর্থ এই নয় যে শুধু নৌকো, একলা নৌকোই, নদী পার করে দেয়। তার সাথে অন্য কোন কোন জিনিসের প্রযোজন আছে। যে লোক এক অংশ আঁকড়ে ধরে কিন্তু অন্যান্য অংশকে উপেক্ষা করে, তার পক্ষে পাবপারকারী ডুবন্ত হযে যায়।

ঠিক এই রকম ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে থাকে। আমবা জানি, ওঙ্কাব বড মন্ত্র। আমরা জানি, অহম মহত্বপূর্ণ মন্ত্র। 'নমো অবহন্তাণং' বড় মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করলে সর্ব কর্মে সিদ্ধিলাভ হয। একথা ঠিক। তেমনি সত্য যেমন নৌকোয উঠে বসলেই নদীর অপর পারে পৌছানো যায়, এ কথা সত্য। মন্ত্র জপ করে সর্ব বিষযে সিদ্ধিলাভ করবে। এ কথা যথার্থ। কিন্তু শুধু মন্ত্রকে গ্রহণ করে, তাকে বছরের পর বছর জপ কবতে লাগলে, অথচ কিছু হল না, কিছুই অনুভব হল না, কোন কাজে সিদ্ধিলাভ হল না। এই রকম পরিস্থিতিতে লোকে বলে থাকে—এত বছর ধরে জপ করলাম, জপেব মালা ঘোরালাম, কিন্তু কই চমকপ্রদ কিছু তো ঘটল না। কোন কিছুই লাভ হল না। অর্থাৎ এ নৌকো পার হওয়াব উপায নয়। মনে হয এব প্রচেষ্টা ডুবিযে দেওযাব, এবং সে চেষ্টায় অনেকটা সফল হযেছে। কেউ কেউ বলে—এতদিন ধরে আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে মালা ঘোবালাম আর মন্ত্র জপ করলাম, অমুক অমুক অনুষ্ঠান করলাম, কিন্তু মনে হল কিছুই ফল হচ্ছে না। তাই আমরা মালা ঘোরানো, মন্ত্র জপ কবা সব ছেড়ে দিযেছি। মনে আব ঐ সবের ওপরে কোন বিশ্বাস নেই। তার অর্থ এই যে, ঐসব লোক মাঝ দরিযায

এসে ডুবে যাচ্ছে। এ রকম কেন হয়? ঐ বকম হওযাব কাবণ হল আমরা সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানি না, আয়ত্ত করাব চেষ্টা কবি না। আমাদের সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানতে হবে, আযত্ত কবতে হবে। মন্ত্রের মধ্যে শক্তি আছে একথা ঠিক। মন্ত্র তরাতে পাবে, কিন্তু সব কিছুই মন্ত্রেব দ্বারা হবে, এমন হয না। তার সঙ্গে অন্য আবও কিছু চাই। সবার আগে আপনি এই কথা চিন্তা করে দেখুন মন্ত্রের সঙ্গে আপনাব মনের সংযোগ হয়েছে কিনা। আপনি তো মন্ত্র জপ করে যাচ্ছেন, কিন্তু মন্ত্রের সঙ্গে আপনাব মনের যদি সংযোগ না হযে থাকে তবে কোন ফল লাভ হবে না। অর্থাৎ নদী পাব হওয়াব আগে, নৌকোয বসার আগে, আপনাকে দেখতে হবে নৌকোয নাবিক আছে কিনা। নাবিকও নেই আব আপনি নিজেও চালাতে জানেন না, সেক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবে বলা যায নৌকো আপনাকে পাব কবতে পারবে না। মাঝ দরিযায় নিযে গিয়ে আপনাকে ডুবিযে দেবে। মন্ত্রে শক্তি আছে এ কথা যথার্থ, কিন্তু আপনার মন যদি তাতে সংযুক্ত না হয, যদি মনেব সঙ্গে তাব কোন সংযোগ না ঘটে, যদি মন তার দিকে চালিত না হয, সে মন্ত্র মনকে চালিত না করে বিভ্রান্ত করবে। আমাদের সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানতে হবে। প্রথম তত্ত্ব হল, মনকে সংযুক্ত কর। মনোযোগ না করে যে কাজ কবা যায তা সম্পূর্ণ হয় না, অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়। যে লোক খাচ্ছে তার মন যদি খাওয়ার সঙ্গে সংযুক্ত না হয তবে তাব খাওযা অসমাপ্ত থেকে যায। যে লোক চলছে তাব মন যদি চলার সঙ্গে সংযুক্ত না হয তবে তাব চলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে অর্ধেক মন নিযে চলে, সম্পূর্ণ মন নিযে নয। আপনি এই বিষযে চিন্তা করে দেখুন। আপনি কি সম্পূর্ণ মন দিযে খান? কখনই নয। কখনও কি এমন হয় যে খাওযাব সময়ে আপনি খান, আব কিছুই করেন না? চিন্তা করেন না, কিছু বলেন না বা ইঙ্গিত করেন না? আপনাব মন কি সম্পূর্ণ রূপে খাওযাতে লেগে থাকে? না, কখনই না।

খেতে খেতে আপনি অসংখ্য কাজ করেন। কোথা থেকে কোথায় চলে যান। কত যাত্রাই করেন। কত রকম কল্পনা করে ফেলেন। কত রকম পরিকল্পনা করেন। আপনি পুরো মন দিয়ে খান না, অর্ধেক মন দিয়ে খান। এর তাৎপর্য এই যে, মনের এক কোণ খাওয়ার কাজে যুক্ত থাকে, আর তার হাজার কোণায় আলাদা আলাদা কাজ হতে থাকে। চলার ব্যাপারেও সম্পূর্ণ মন চলার মধ্যে থাকে না। আপনি যখন চলেন তখন আপনার মনের এক ভাগ চলার সঙ্গে সহযোগিতা করে, চলাতে সংযুক্ত থাকে। আর তার বাকি হাজার ভাগ কে জানে কোথায় উড়ে বেড়ায়। মন্ত্র জপেরও একই ব্যাপার। সম্পূর্ণ মন দিয়ে মন্ত্র জপ কই হয়? মনের এক ভাগ মন্ত্র জপের সঙ্গে লেগে থাকে, আর অবশিষ্ট হাজার ভাগ অন্যান্য নানা রকম কল্পনায় ব্যস্ত থাকে।

এক শ্রাবক ভাই বলেন যে যখন আমি অন্যান্য কাজ করতে থাকি তখন আমার মন সাধারণত সেই সব কাজে সংলগ্ন থাকে। কিন্তু যখন মালা ঘুরিয়ে জপ করতে থাকি তখন দুনিয়ার যত কল্পনা দুর্বার গতিতে মনের মধ্যে আসতে থাকে। ঐসব কল্পনা মনের মধ্যে ভিড় করে।

সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করে আমরা কোন কাজ করতে পারি না। সাধনার ব্যাপারে ঐ তো আমাদের ঘাটতি। সাধনার অর্থ কি? সাধনা থেকে আপনারা আর কিছু শিখুন বা না শিখুন, এটা অন্তত শিখে রাখবেন, যে কাজই করতে হবে সেই কাজই সম্পূর্ণ মন দিয়ে করা উচিত, সমগ্রতার সঙ্গে করা উচিত, অর্থাৎ ঐ কাজে মনকে সমগ্র রূপে নিয়োগ করা কর্তব্য। মনকে এমন ভাবে নিয়োগ করা প্রয়োজন যাতে মনের সমস্ত অংশ ঐ কাজে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মনের কোন কোণা যেন শূন্য না থাকে, যাতে তা থেকে অপসরণ করার কোনও অবসর না থাকে। তার সামনে যদি কোন শূন্য স্থান না থাকে তো বেচারা পালাবে কোথায়? এই পরিস্থিতি

যদি প্রাজ্ঞ হওয়া যায় তাহলে সাধনায় সাফল্য লাভ হয়। আপনি একে সাধনার প্রাথমিক রহস্য বা অন্তিম সাফল্য যাই বলুন এই হল সাধনার একমাত্র রহস্য। এর তাৎপর্য এই যে সাধনা দ্বারা মনকে এ রকম প্রশিক্ষিত করতে হবে যে, তাকে যে কাজে আমরা লাগাতে চাইব সে সেই কাজেই লেগে যাবে। আমরা যে কাজে তাকে লাগাতে না চাই সে কাজে সে লিপ্ত হবে না। যদি মনের ওপরে এতটা প্রভুত্ব স্থাপিত হয় তাহলে আর কোন সমস্যা উৎপন্ন হবে না। পরন্তু আমরা নিজেদের মনের মালিক হয়ে যাব। আমরা যা চাই তাই করতে পারব, যেমন করে চাই তেমনি করে করতে পারব। আমাদের মন এমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত যে আমরা তা গুণে শেষ করতে পারি না। এই খণ্ডিত মনই মানব জাতির সবচেয়ে বড় সমস্যা। ভগবান মহাবীর বলেছেন, 'অনেগচিত্তে খলু অয়ং পুরিসে'—মানুষ অনেক মন সম্পন্ন, সে একমনা নয়। তার অনেক মন। ঐ মন অনেক ভাবে খণ্ডিত। এই জন্য মানুষ কোন বিষয় পুরো মন দিয়ে চিন্তা করতে পারে না। যদি সে সম্পূর্ণ মন দিয়ে চিন্তা করতে লেগে যায় তবে নির্ঘাৎ তার নৌকো নদী পার হতে পারবে, তা ভিন্ন এ কাজ করা সম্ভব নয়।

সবার আগে দেখুন মন্ত্রের সাথে মনের সংযোগ হয়েছে কিনা। মনের সমগ্র শক্তি মন্ত্রের সঙ্গে আছে কি নেই। মন্ত্র আর মন দুটি ভিন্ন জিনিস।

তৃতীয় প্রশ্ন, আপনি মন্ত্রের অর্থ জেনেছেন কিনা। মন্ত্রের অর্থ জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। যদি আপনি মন্ত্রের অর্থ না জেনে থাকেন তাহলে আপনি যা করতে চান তা করতে পারবেন না। যা হতে চান তা ঘটা সম্ভব হবে না।

পরিবর্তনই চিরন্তন সত্য। কোনও বস্তু শাশ্বত নয়, চিরস্থায়ী নয়। সব পরিণামশীল। পরিবর্তনই সত্য। সব জিনিসই বদলায়। পরমাণু নষ্ট হয় না। যা আকার বা সংস্থান বা রূপ তা স্থায়ী হতে পারে না। সবই পরিবর্তনশীল। সব কিছুই বদলায়। মানুষও বদলে যায়।

কেবল আত্মা শাশ্বত। তাব কোন পবিবর্তন নেই। মানুষ বদলায়। সেইজন্য মানুষ যা হতে চায় সে তা হতে পাবে। সেই রূপেই সে বদলে যেতে পাবে। তাব যা সঙ্কল্প হবে সেই রূপে সে বদলে যাবে। মানুষ জীবনেব প্রথম ক্ষণ থেকে বদলাতে শুরু কবেছে। প্রতি মুহূর্তে সে বদলাচ্ছে। পবিবর্তনেব ক্রম বন্ধ হয় না। তাব ফলে মানুষেব সঙ্কল্পেব অনুরূপ পবিবর্তন হয়। আব যদি সঙ্কল্প না থাকে তবে অন্য যে কোন রূপে বদলায়। সঙ্কল্প থাকলে সঙ্কল্প অনুযায়ী পবিণতি ঘটে।

আমাদেব শবীবে যেসব কোষ আছে সেগুলি তাব সংগঠনকাবী মূল উপাদান। তাদেব দ্বাবা শবীব নির্মিত হয়। তাদেব সংখ্যা অনেক। আমাদেব শবীবে ষাট হাজাব অর্বুদ কোষ আছে। আমাদেব মস্তিষ্কে প্রতি বর্গ মিটাবে এক কোটি কোষ আছে। শবীবেব কোষ প্রতি মুহূর্তে নষ্ট হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে নতুন কোষ উৎপাদিত হচ্ছে। হাজাব হাজাব কোষ লোপ পাচ্ছে, আবাব হাজাব হাজাব কোষ নতুন জন্মাচ্ছে। পুবনো কোষ ক্ষযপ্রাপ্ত হয়, নতুন কোষ সৃষ্টি হয়। এই পবিবর্তন-চক্র নিবন্তব আবর্তিত হচ্ছে। বয়স অনুসাবে মানুষেব শবীবেব কোষগুলি যখন অতিশয় ক্ষীণ হয় এবং নতুন কোষ খুব কম জন্মে, তখন শবীব ক্ষীণ হয়, মস্তিষ্ক ক্রমশ দুর্বল হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্তেজ হয়, মস্তিষ্কেব নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে। জোযান মানুষ নিজেব শবীব, নিজেব মনকে যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে নিযন্ত্রিত কবতে পাবে। কিন্তু বুড়ো মানুষেব নিয়ন্ত্রণ কবাব ক্ষমতা ক্ষীণ ও শিথিল হয়ে যায়। তাব কাবণ ষাট বা সত্তব বছব বয়সে মানুষেব মস্তিষ্কেব ক্ষমতা শতকবা দশ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এত কোষেব ধ্বংস হয় যে মস্তিষ্কেব ক্ষমতা কমে যায়। এই হল মানুষেব শবীবেব ভেতবকাব অবশ্যম্ভাবী পবিবর্তন-চক্র। আমবা একটি চিতা জ্বলতে দেখে ভয় পেয়ে যাই। বলে উঠি, 'ওবে! চিতা জ্বলছে, মৃতদেহ পুড়ছে।' আমবা যদি নিজেদেব ভেতবে তাকাই তবে দেখতে পাব, এক নয়, হাজাব চিতা নিবন্তব জ্বলছে। হাজাব হাজাব কোষেব মৃত্যু হচ্ছে, হাজাব হাজাব কোষেব জন্ম হচ্ছে।

জন্ম এবং মৃত্যু—দুই-ই এক সাথে চলছে। একটি দিকে শ্মশান, তো অন্য দিকে প্রসূতিগৃহ। এক দিকে চিতা সাজানো হচ্ছে, মৃতদেহ পুড়ছে, অন্য দিকে নতুন নতুন চেহারা জন্মাচ্ছে, সূর্যকিরণের প্রথম স্পর্শ পাচ্ছে। বিচিত্র এই শরীর। আমরা কেবল বাইরে থেকে একে দেখি। বাইরে থেকে আমরা শ্মশানও দেখছি, প্রসূতিগৃহও দেখছি। সদ্যোজাত শিশুকেও দেখছি, মৃত্যুকবলিত বৃদ্ধকেও দেখছি। সব কিছুই বাইরে থেকে দেখছি, কিন্তু ভেতর থেকে কিছুই দেখছি না। ভেতরে এক পরিবর্তনের চক্র চলছে। সমস্ত কিছু অনবরত বদলে যাচ্ছে। তবুও কি আপনার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না? অবশ্যই হচ্ছে। ভেতরে প্রতি মুহূর্তে সংঘর্ষ চলছে। জন্ম এবং মৃত্যুর কাজ, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের কাজ অবিরাম চলছে। এ সবই স্বাভাবিক ভাবে হতে থাকে। যদি আপনি সঙ্কল্প করেন তবে এই চক্রের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। অর্থাৎ আপনি যা হতে চান তাই হতে পারেন। এসব কিছুই ঘটে প্রাণের স্তরে।

দুই বস্তু আছে—আত্মা আর প্রাণ। এক আত্মশক্তি, অপর প্রাণশক্তি। এক হল প্রাণবল, অপর হল আত্মবল। আমাদের লক্ষ্য—আত্মোপলব্ধি। আমরা আত্মার মূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে চাই, আত্মাকে পেতে চাই, মূল চেতনা পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। এই হল আমাদের মূল লক্ষ্য। এর আগে আসে প্রাণ। প্রাণের স্থান এর আগে। আত্মা পর্যন্ত কে পৌঁছতে পারে? যে প্রাণবান, যে শক্তিশালী, সে-ই শুধু আত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যার ইচ্ছাশক্তি প্রবল সে আত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যার মনোবল তথা সঙ্কল্পবল ক্ষীণ, যার ইচ্ছাশক্তি তথা প্রাণশক্তি ক্ষীণ, যে বীর্যহীন সে কখনও আত্মাকে লাভ করতে সমর্থ হয় না। আত্মাকে লাভ করার জন্য প্রাণকে শক্তিশালী করা বিশেষ প্রয়োজন। যা জপের স্তর তাই প্রাণের স্তরে চলনশীল লোকের চলার পথ। তা প্রাণকে শক্তিশালী করে। প্রাণ আমাদের বিদ্যুৎশক্তি। সব প্রাণীর মধ্যেই এই শক্তি আছে। এমন কোন

প্রাণী নেই যার মধ্যে এই শক্তি অনুপস্থিত। আমাদের সমস্ত সক্রিয়তা চঞ্চলতা, উন্মেষ ও নিমেষ, কথা ও চিন্তা, গতি ও দীপ্তি, তথা আকর্ষণ— এ সমস্তই প্রাণের আধারে ঘটে, বিদ্যুৎশক্তির আধারে ঘটে। বিদ্যুৎ-শক্তি এ সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে। আমাদের শরীরে এই বিদ্যুৎ মজুত আছে। তাকে আমরা তৈজস শরীর বলতে পারি, প্রাণ বলতে পারি। বিদ্যুৎ বৃদ্ধি করার অর্থ, মনোবল বৃদ্ধি করা। যার বিদ্যুৎ তীব্র হয় তার মনোবল বৃদ্ধি পায়। যার বিদ্যুৎ ক্ষীণ হয় তার মনোবল হ্রাস পায়।

'মানুষের ব্রহ্মচর্য পালন করা বাঞ্ছনীয়'—এটা কেবল কথার কথা নয়। এর পেছনে মস্ত বড় রহস্য আছে। আমাদের ভেতরে একটি বিদ্যুতের প্রতিষ্ঠান বা পাওয়ার হাউস আছে। তার অবস্থিতি পৃষ্ঠরজ্জুর অন্তিম বিন্দুতে। পৃষ্ঠরজ্জু যেখানে হয় সেখানে একটি কেন্দ্র আছে। পেছনের দিকে কোমরের কাছে এই কেন্দ্র অবস্থিত। সেখানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। সেটি একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র বিশেষ। যে ব্যক্তির বিদ্যুৎশক্তি ঊর্ধ্বগামী হয় অর্থাৎ ওপরের দিকে উঠতে থাকে সে বিপুল শক্তির অধিকারী হয়। ব্রহ্মচর্যের সাধনা দ্বারা লোকে নিজের ওজঃশক্তিকে ঊর্ধ্বগামী করে মস্তিষ্ক পর্যন্ত নিয়ে যায়। তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। তার প্রাণ শক্তিশালী হয়। তার মনোবল দৃঢ় হয় এবং ব্যক্তির পরাক্রম এতটা স্ফুরিত হয় যে সে যা কল্পনা করে তাই সিদ্ধ হয়। প্রাণ গেলেও কখনও সে তার সঙ্কল্প থেকে চ্যুত হয় না। যার প্রাণধারা কামনা ও বাসনার ফলে নিচের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে তার মনোবল বসে যায়, চেতনা ক্ষীণ হয়, সঙ্কল্প ভঙ্গ হয়, মন নিরাশয় ভরে যায়। পদে পদে পদস্খলন ঘটে, কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে না। এই কারণে ব্রহ্মচর্য, বাক্যের সংযম, মনের সংযম এবং একাগ্রতার সাধনা, এ সমস্তই প্রাণশক্তিকে ঊর্ধ্বগামী করার উপায়। এতে মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং ধৈর্য দৃঢ় হয়। এ অধ্যাত্ম নয়, কিন্তু অধ্যাত্মতে পৌঁছবার উপায়। ঠিক নৌকোর মত। এ সবই

নৌকো বিশেষ। এটা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র। আমাদের গতি কোন্ দিকে? এই সাধনার মাধ্যমে আমরা যেখানে পৌঁছতে চাই সেখানেই পৌঁছতে পারি। সঙ্কল্প করলাম, আর অধ্যাত্মের সাধনা হয়ে গেল—ব্যাপারটা ঠিক এ রকম নয়। যে ব্যক্তি লক্ষ্য স্থির করতে পারে, লক্ষ্য স্থির করতে জানে, সে-ই শুধু সংকল্প করার অধিকারী। শিকারী যে লক্ষ্য সন্ধান করে তাতে তার সঙ্কল্প করতে এবং একাগ্র হতে হয়। শিকারীর কি একাগ্রতার অভাব হয়? লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীর কি একাগ্রতার অভাব হয়? তাদের একাগ্রতার অভাব হয় না। সম্পূর্ণ একাগ্রতা হলে তবে লক্ষ্য-বস্তুতে তীর লাগতে পারে। যোদ্ধাদেরও সঙ্কল্প প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চার্চিল সঙ্কল্পের প্রতীকস্বরূপ 'ভি' চিহ্ন দিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেক যোদ্ধাকে বলেছিলেন, 'ভি'-কে আপনি সর্বদা মনে রাখবেন। আমরা জিতব।' ঐ 'ভি' জেতার দৃঢ় সঙ্কল্পের চিহ্ন। সৈনিকের যতটা দৃঢ় সঙ্কল্প, সাহস ও একাগ্রতা হতে পারে অন্য লোকের তা হতে পারে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে এই সঙ্কল্প, সাহস ও একাগ্রতা কি আত্মোপলব্ধি? তা কি অধ্যাত্ম? তা নয়। ওটা উপায় মাত্র। সঙ্কল্প, ইচ্ছাশক্তি, প্রাণশক্তি, মনোবল, একাগ্রতা—এ সবই এক একটি উপায়। এখন এই সাধনকে আমি কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছি, কোন্ দিকে প্রবাহিত করছি সেটা উদ্দেশ্যের ওপরে নির্ভর করে। আত্মার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যও এর ব্যবহার হতে পারে। আত্মার অভিমুখে এর প্রয়োগ হতে পারে। এ সাধন মাত্র, অর্থাৎ উপায় বা উপকরণ মাত্র। আপনি তাকে কোন্ দিকে প্রয়োগ করবেন তা আপনার উদ্দেশ্যের ওপরে নির্ভর করে।

জপও এক সাধন। তা সাধন বা উপায়, সাধনার উদ্দেশ্য বা সাধ্য নয়। জপ প্রাণশক্তির এক প্রকার প্রয়োগ মাত্র। এতে শব্দ এবং মন দুয়ের সংযোগ হয়। শব্দ এবং মনের সমুচিত যোগ হলে এক বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হয়। আমরা কথা বলি। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে

বিদ্যুতেব তবঙ্গ উৎপন্ন হয। আমবা চিন্তা কবি। আমাদেব চিন্তাব সাথে সাথে বিদ্যুতেব তবঙ্গেব উদ্ভব হয। এই সব বিদ্যুৎ-তবঙ্গেব বিস্ময়কব প্রভাব হয।

বঙ, শব্দ, মন এবং উচ্চাবণ—এই চাব মুখ্য বস্তু। আমাব চিন্তন তথা আমাব জীবনেব সঙ্গে বঙেব গভীব সম্বন্ধ। বঙ দ্বাবা চিকিৎসাব পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। 'কালাব থেবাপি' বা বর্ণ চিকিৎসা এখনও চালু আছে। এক চিকিৎসা পদ্ধতিব নাম 'কসমিক বে থেবাপি' বা বিশ্বকিবণ চিকিৎসা। এবও বঙেব সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। বঙ এবং সূর্যকিবণ উভযেব সাথে এর সম্বন্ধ আছে। সূর্যেব আলোব সঙ্গে এব সম্বন্ধ। বঙ আমাদেব শবীব এবং মনকে নানা ভাবে প্রভাবিত কবে। তাতে বোগ সাবে, তা সে বোগ শাবীবিক বা মানসিক যাই হোক। মানসিক বোগেব চিকিৎসাতেও বঙেব বিশিষ্ট স্থান আছে। উন্মাদ বোগেবও বঙেব মাধ্যমে চিকিৎসা হতে পাবে। বঙেব সামান্য বিকৃতি হলে মানুষ পাগল হযে যেতে পাবে। বঙের পূর্তি হলে লোক সুস্থ হয। শবীবে বঙেব ঘাটতি হলে অনেক বোগেব উৎপত্তি হয। 'কালাব থেবাপি' বা বর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতিব সিদ্ধান্ত এই যে, জীবাণু থেকে বোগেব উৎপত্তি হয না। বঙেব ঘাটতি থেকেই বোগেব জন্ম হয। যে বঙেব ঘাটতি হযেছে তাকে পূবণ কবে দাও, বোগী সুস্থ হবে, বোগ নিবাময হবে। বোগ হওযা বা না হওযা, মানুষেব সুস্থ থাকা বা না থাকা, সবই বঙেব আধাবে ঘটে।

আমাদেব চিন্তাব সাথেও বঙেব সম্বন্ধ আছে। যখন মানুষেব মন কুচিন্তা বা অনিষ্টকব চিন্তায পূর্ণ, যখন সে অশুভকব চিন্তা কবে, তখন ঐ সব চিন্তাব পবমাণু কৃষ্ণ বর্ণ হয। তাব লেশ্যা বা কর্মবন্ধনেব কাবণ কৃষ্ণ বর্ণ হয। যদি সে সৎ, হিতকাবী বা শুভ চিন্তা কবে তবে তাব পুদ্গল হলুদ বঙেব হতে পাবে, আবাব লাল বা সাদাও হতে পাবে। তখন তেজোলেশ্যা, পদ্ম লেশ্যা বা শুক্ল লেশ্যা হতে পাবে। অসৎ চিন্তাব পুদ্গলেব বর্ণ কালো, সৎ চিন্তাব পুদ্গলেব বর্ণ হলুদ, লাল

বা সাদা। চিন্তাব সঙ্গে বর্ণেব কত বড সম্বন্ধ। যে বকম চিন্তা তাব সেই বকম বঙ।

শবীবেব সঙ্গে বঙেব গভীব সম্বন্ধ। প্রত্যেক লোকেব শবীবেব আশেপাশে বঙেব এক আভামণ্ডল আছে। তাতে অনেক রঙ হতে পাবে। কাবও আভামণ্ডলেব বঙ কালো, কাবও নীল, আবাব কাবও লাল বা সাদা হয। আবাব কাবও নানা বঙেব আভামণ্ডল হতে পাবে। আপনাব চোখ সে বঙ দেখতে পায না। কিন্তু তা অবশ্যই আছে। এমন কোন লোক নেই যাব চাবপাশে আভামণ্ডল নেই। মানুষেব আভামণ্ডলেব প্রভাব হয তাব নিজেব ওপবে। আবাব অন্যেব ওপবেও প্রভাব হয। আপনি কোন লোকেব কাছে গিযে বসেন। বসাব সঙ্গে সঙ্গে আপনাব মনে এক পবিবর্তন হয। আপনাব মনে হয আপনি এক অপূর্ব শান্তি অনুভব কবছেন। আপনাব মন আনন্দময হয, আব আপনাব অন্তবেব অন্তঃস্থলে এক মধুব সঙ্গীত হতে থাকে। আপনি অন্য এক লোকেব কাছে গিযে বসেন। অকাবণে আপনাব মন উদাস ও উদ্বিগ্ন হযে পডে। মনেব মধ্যে ক্ষোভ ও সন্তাপেব উদ্ভব হয। সেখান থেকে তাডাতাডি উঠে যাবাব ইচ্ছা হয। এসব কেন হয? ভিন্ন ভিন্ন লোকেব পাশে বসলে ভিন্ন ভিন্ন বকম ভাবনা দ্বাবা আমাদেব মন আক্রান্ত হয। এ বকম কেন হয এবং কি কবে হয? এব কাবণ হল, প্রত্যেক লোকেব নিজ নিজ আভামণ্ডল বা আভাবলয আছে। সামনে যিনি বসে আছেন তাঁব আভামণ্ডল বা আভাবলযেব যে বঙ তাব দ্বাবা পাশে যে লোক বসে আছে সে প্রভাবিত হবে। সে ইচ্ছা করুক বা না করুক, সে সেই বঙ দ্বাবা প্রভাবিত হবে। যে লোকেব আভামণ্ডল সাদা, লাল, নীল বা হলুদ বর্ণেব, তাব পাশে এসে বসলে মন শান্ত হযে যায। শান্তিতে অন্তব পূর্ণ হয। যাব আভামণ্ডল বিকৃত, কৃষ্ণবর্ণ পুদ্গলে নির্মিত, তাব কাছে এলে মন অকাবণ দুশ্চিন্তায ভবে ওঠে, উদাস ভাব ও উদ্বেগে পূর্ণ হয, আব মনেব মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষ-অসৎ ভাবনা আসতে থাকে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায, বঙ আমাদেব প্রভাবিত

করে থাকে।

এক হল রঙ, আর এক শব্দ। আমাদের জীবনে শব্দের প্রভাব পড়ে। মনের ওপরেও শব্দের প্রভাব হয়। শব্দের স্থূল প্রভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। একবার স্বামী বিবেকানন্দকে এক ব্যক্তি বলেছিল, 'শব্দ নিরর্থক। তার প্রভাব বা অপ্রভাব বলে কিছু নেই। তা নির্জীব পদার্থ।' বিবেকানন্দ শুনলেন, কিছুক্ষণ মৌন থেকে তিনি বললেন—'তুমি নির্বোধ। বসে থাক।' যাকে এ কথা বললেন সে রেগে আগুন হয়ে গেল। তার চেহারা বদলে গেল। তার চোখ লাল হয়ে গেল। সে বলল—'আপনি এত বড় সাধু হয়ে আমাকে গাল দিলেন। কি কথা ব্যবহার করছেন তাও ভেবে দেখলেন না।' বিবেকানন্দ মুচকি হেসে বললেন—'তুমি এখনি বলছিলে, শব্দের আবার কি প্রভাব। এখন নিজে এক 'নির্বোধ' কথাটিতে এই পরিমাণ প্রভাবিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছ!'

শব্দের ভেতরে শক্তি আছে। তা মানুষকে প্রভাবিত করে। আমি এতক্ষণ তার স্থূল প্রভাবের কথা বললাম। শব্দের অনেক সূক্ষ্ম প্রভাব আছে। আজকাল শব্দের দ্বারা চিকিৎসা হয়ে থাকে। শব্দের দ্বারা অপারেশন করা হয়। অপারেশনের জন্য কোন অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না। শব্দের সূক্ষ্ম তরঙ্গ আসে, আর তার সাহায্যে চেরা-ফাঁড়ার কাজ হয়। শব্দের দ্বারা, সূক্ষ্ম ধ্বনির দ্বারা, কাপড় ধোলাই হয়। সূক্ষ্মতম ধ্বনির দ্বারা হীরা কাটা হয়। আগেকার দিনে বলা হতো হীরে দিয়ে হীরে কাটা হয়। এই সিদ্ধান্ত সবাই মানত। আজকাল সূক্ষ্ম ধ্বনির সাহায্যে হীরা কাটা হয়। যন্ত্র ঘুরতে থাকে, ধ্বনির সূক্ষ্ম তরঙ্গ নির্গত হতে থাকে এবং ক্ষণকালের মধ্যে হীরা কাটার কাজ সম্পন্ন হয়। এই হল শব্দের চমৎকারিতা। জপ এবং মন্ত্রের চমৎকারিত্ব এর থেকেও বেশি।

শব্দের উচ্চারণ ছয় রকম হতে পারে। যথা—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম এবং পরম সূক্ষ্ম। মন্ত্রবিদ আচার্যগণ বলেন, শব্দের হ্রস্ব

উচ্চাবণ পাপ নাশ কবে। দীর্ঘ উচ্চাবণে শ্রীবৃদ্ধি ও স্ত্রী লাভ হয, আব প্লুত উচ্চাবণে জ্ঞানবৃদ্ধি হয। আবও তিন প্রকাব উচ্চাবণ আছে— সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম এবং পবম সূক্ষ্ম। ওগুলি শুভ সমাপ্তি আনে, ব্যক্তিব সঙ্গে ধ্যেযেব সংযোগ কবে। আপনি দৃষ্টান্তস্বৰূপ 'অর্হ' শব্দটি নিন। ঐ কথাটি আপনি উচ্চাবণ কবেন। তাব এক হ্রস্ব উচ্চাবণ, এক দীর্ঘ উচ্চাবণ হয। আব আছে প্লুত উচ্চাবণ। আবাব সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম এবং পবম সূক্ষ্ম উচ্চাবণও হয। পবম সূক্ষ্মে এসে আপনি অনুভব কবেন আপনি লক্ষ্যে পৌছে গিযেছেন, অর্হৎকে অনুভব কবতে শুরু কবেছেন। এই ছয প্রকাব উচ্চাবণেব প্রভাব বিভিন্ন বকম হয। শব্দেব ছয প্রকাব শক্তি আমাদের জানতে হবে। শব্দেব অর্থ আব তাব উচ্চাবণ জানতে হবে।

চতুর্থ বস্তু হল মন। মনেব সঙ্গে শব্দেব সংযোগ কবতে হবে। যে শব্দ আমবা জপ কবছি তাব সাথে মনেব সংযোগ কবতে হবে। এ সবেব সমুচিত সংযোগ হলে জপেব শক্তি উৎপন্ন হয। কেবল নৌকো দিয়ে কাজ হবে না। কেবল মালা ঘোবালেই কোন কাজ হবে না। নৌকো দিযে নদী পাব হতে হলে নৌকো ছাডা আব কি কি জিনিস দবকাব তা আমাদেব জানতে হবে, বুঝতে হবে। জপেব সঙ্গে আব কি কি বস্তু প্রযোজন তাও আমাদেব বুঝতে হবে। 'ণমো অবহন্তানং' অতিশয শক্তিশালী মন্ত্র—এ কথা খুবই সত্যি, কিন্তু তাব উচ্চাবণ যদি ঠিক না হয তবে ঐ মন্ত্র কি কবে ফল দেবে? তাব উচ্চাবণ কি উদ্দেশ্যে কি বকম হওযা উচিত তা যতক্ষণ আমবা জানতে না পাবি সে পর্যন্ত আমাদেব অজ্ঞতা ও দোষেব জন্য আমবা মন্ত্র এবং জপ থেকে লাভবান হতে পাবি না, অথচ আমবা সমস্ত দোষ মন্ত্র ও জপেব ওপবে চাপিযে দিই। আমবা বলে বসি—'মন্ত্র থেকে কোন ফল হয না।' শব্দেব উচ্চাবণেব ধ্যেযকে বোঝা অত্যন্ত প্রযোজন। এই সমস্ত জিনিস জপেব জন্য অত্যন্ত আবশ্যক।

জপেব স্বৰূপ কি? ধ্যেযেব সাথে এক হযে যাওযা হল জপ।

মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তিনিরোধকে ধ্যান বলে স্বীকার করেছেন। চিত্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধ ধ্যান। ধ্যানের সম্বন্ধ চিত্তের সঙ্গে। জৈন আচার্য বলেছেন—'ধ্যান 'ত্রিবিধম্', অর্থাৎ ধ্যান তিন প্রকার—কায়িক ধ্যান, বাচিক ধ্যান এবং মানসিক ধ্যান। এ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন পরম্পরা। শরীরের শিথিলীকরণ, শরীরের স্থিরতা, তার নাম—কায়িক ধ্যান। বচনকে ধ্যেয়ের সঙ্গে যোগ করা, বচন এবং ধ্যেয় উভয়ের সমন্বয় ঘটানো, একত্ব সাধন করার নাম বাচিক ধ্যান। বাচিক ধ্যান বচনের মাধ্যমে হয়। বচনের মাধ্যমে আমরা এমন একাগ্রতা প্রাপ্ত হই, ধ্যেয় বস্তুতে এত লীন হয়ে যাই যে আমরা এবং আমাদের ধ্যেয়ের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না।

আপনি 'ণমো অরহন্তাণং' এই মন্ত্র জপ করবেন, কিন্তু যত দিন ঐ মন্ত্র আপনার মস্তিষ্কে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত না হবে, আর যত দিন আপনার এ রকম অনুভূতি না হবে যে, 'আমি স্বয়ং অর্হতে পরিণত হচ্ছি' ততদিন পর্যন্ত 'ণমো অরহন্তাণং' এই মন্ত্র থেকে আপনার ফলপ্রাপ্তি হবে না। হ্যাঁ, এটুকু লাভ অবশ্যই হবে, উচ্চারণ দ্বারা যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তার দ্বারা প্রাণশক্তির কিঞ্চিৎ বিকাশ হবে। কিন্তু জপের দ্বারা আপনারা অর্হৎ রূপে যে পরিণতি আনতে চেয়েছিলেন, যে পরিণাম চেয়েছিলেন, তা সম্ভব হবে না। এই বড় লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে আপনি সামান্য লাভ প্রাপ্ত হবেন। অনেক বার এ রকম হয়—আমরা মহৎ ধ্যেয়কে উদ্দেশ্য করে চলতে থাকি, মহৎ বস্তু সামনে রেখে চলতে থাকি, কিন্তু এর মধ্যে ছোটখাটো লাভ প্রাপ্ত হলে আমরা মনে করি আমাদের উদ্দিষ্ট লাভ মিলেছে। এটা মস্ত আশঙ্কার কথা। বিকাশের পথে এই বিপদের আশঙ্কা। আমরা মহৎ উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে চলতে থাকি। আত্মোপলব্ধি সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য, সেই আদর্শ নিয়ে আমরা চলি। মাঝখানে সামান্য কিছু পেয়ে যাই। তাকেই সব কিছু মনে করে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছেড়ে দিই। এই সামান্যতেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে থাকি। এই সন্তোষ সমূহ আশঙ্কার কারণ। আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া

উচিত নয়। পথ চলতে চলতে মিলে যাওয়া সাথীর মত এই সব ছোট-খাট পাওয়াগুলি আমাদের সাধনার পথে যাত্রাসহচর মাত্র। এক সাথী মিলল। তার সঙ্গে রাতভোর পান্থশালায় থাকলাম, আলাপ করলাম, মনোরঞ্জন করলাম। যদি আমরা তাকে আমাদের গন্তব্যস্থল মনে করে সেখানেই থেকে যাই তবে আমরা কোনদিনই আমাদের উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারব না। এই হল সাধনার পথে বিষম বিপদ। এ সমস্তই প্রাণবিদ্যার খেলা, এরা মধ্যপথে প্রাপ্ত সহযাত্রী মাত্র। মধ্যপথে এসে আমাদের সাথে এরা মিলিত হয় এবং মনোরঞ্জন করে। কিন্তু ওগুলি আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তি নয়।

আমাদের ধ্যেয় হবে অর্হতে পরিণত হওয়া। অর্হৎ বীতরাগ বা নিরাসক্ত। যার মধ্যে সমস্ত অর্হতা, ক্ষমতা, শক্তি ও যোগ্যতা বিকশিত হয় সে-ই অর্হৎ হতে পারে। তার মধ্যে অবিকশিত কোন কিছু থাকে না। এই আত্মোপলব্ধির নাম—অর্হৎ। আমাদেরও অর্হৎ হতে হবে। এই জন্যই আমরা 'ণমো অর্হন্তাণং' এই মন্ত্র জপ করে থাকি। এই মন্ত্র জপ করার আগে আমাদের মনে এই ভাবনা, এই সঙ্কল্প হওয়া প্রয়োজন যে 'আমি অর্হৎ, আমি অর্হৎ'। আর জপ করার সময় আমাদের মনে এই ধারণা হওয়া প্রয়োজন যে 'আমি অর্হতে পরিণত হচ্ছি, আমি অর্হতে পরিণত হচ্ছি।' এই ধারণা, এই ভাবনা করে নিতে হবে। তার পরে আমরা 'ণমো অর্হন্তাণং' এই মন্ত্র জপ করতে পারব। আমি অর্হৎকে নমস্কার করছি না, আমি নিজেই অর্হতে পরিণত হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছি। অর্হতের সম্পূর্ণ মূর্তিচিত্র এমনভাবে আমাদের মস্তিষ্কে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, আর তার আশেপাশে আমাদের ধ্বনি চলতে থাকবে এবং সেই শব্দ-তরঙ্গ বাস্তবে অর্হতের রূপে আমাদের পর্যায়ের পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করবে। আমি অর্হতের রূপে বদলে যেতে থাকব আর কিছু দিনের মধ্যেই জানতে পারব যে রাগ, দ্বেষ ও বাসনা কমে যাচ্ছে, অর্হতা জেগে উঠছে, শক্তিসমূহ বিকশিত হচ্ছে। তখন বুঝতে হবে জপ সম্যক ভাবে হচ্ছে। সব

কিছু সামগ্রী পাওয়া গেছে। নৌকো আছে, নাবিক ও দাঁড়ি পাওয়া গেছে। সমস্ত উপকরণ পাওয়া গেছে। নৌকো ঠিক খেয়া পার করছে। যদি উপকরণের কোন ঘাটতি বা বিফলতা থাকে, এবং আপনি জপের দোষ দিতে থাকেন, তবে জপ আপনাকে পেছনে ফেলে চলে যাবে।

২৫

একাগ্রতা

যাঁরা সাধনা করেন তাঁরা ধ্যেয়কে কল্পনা করে নিয়ে মনকে তার সঙ্গে সংলগ্ন করেন। মনকে এমন দৃঢ়ভাবে তার সঙ্গে সংযুক্ত করেন, যাতে ঐ সংযোগ কোনক্রমে শিথিল না হয়। যদি কখনও কখনও মন ধ্যেয় থেকে বিচ্যুত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তার সামনে কোন বিকল্প এসে যায়, তবে জাগরূক সাধক মনকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাঁর সমগ্র শক্তির দ্বারা ধ্যেয়ের দিকে চালিত করেন। তখন মন ধ্যেয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এই ধারাবাহিক জ্ঞান একই দিকে একই ধ্যেয়ের উদ্দেশ্যে চালিত হবে। সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে। মধ্যপথে যদি কোনও ছেদ ঘটে তবে তখনই সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এই হল মনের সমাধি, এর নাম মনের একাগ্রতা। যখন এই একাগ্রতায় আমরা সিদ্ধ হই তখন ঐ অবস্থায় স্থিতিকালে আমরা বিভিন্ন সূক্ষ্ম দৃশ্যের আভাস পাই। অনেক রকম সূক্ষ্ম বস্তু দেখতে পাই। জ্যোতির দর্শন হয়। সূক্ষ্ম লোকে বিচরণকারী আত্মার দর্শন মেলে। স্থূল জগতের অতীত অনেক প্রকার শব্দ শোনা যায়। স্থূল জগতের অতীত রূপ দেখা যায় এবং অনুভূতি লাভ হয়। আমাদের অনুভূতির জগৎ বদলে যায়। এই রকম স্থিতিতে আনন্দের অনুভূতি হয়।

কিন্তু তা কোন উৎকৃষ্ট সফলতা নয়, কিংবা চরম সমাধি নয়। তবে তা আত্মবিকাশের দিকে আমাদের এক পদক্ষেপ। সেখানে পৌঁছলে মন আর ফিরে আসতে চাইবে না। মন আর নিচে নেমে আসতে চাইবে না। এটা নিশ্চিত সত্য।

ঐ স্থিতি প্রাপ্ত হলে উৎক্রমণ হতে থাকে। আমাদের জীবনে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ভক্ত রুইদাস মস্ত বড় সাধু ছিলেন। জাতিতে তিনি ছিলেন চামার। তিনি পরম আত্মজ্ঞানী সাধক ছিলেন। তিনি কাশীতে বাস করতেন এবং নিজে নিজেই সাধনা করতেন। তিনি ছোট এক ঝুপড়িতে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিল এবং ছোট একটি পরিবার ছিল। তিনি জুতো সেলাই করতেন এবং তা থেকে যা পেতেন তাই দিয়ে তাঁর সংসার চলত। ঐ কাজ থেকে যখনই নিবৃত্ত হতেন তখনই সাধনায় নিমগ্ন হয়ে যেতেন। একদিন এক সাধু রুইদাসের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি রুইদাসের তত্ত্বজ্ঞান ও প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন। এসে তিনি দেখে ভাবলেন—'আরে। ইনি এমন দরিদ্র অবস্থায় থাকেন। এত বড় সাধু, অথচ এত দরিদ্র। এ রকম ফুটোফাটা ঝুপড়িতে থাকেন আর জুতো সেলাই করেন। এঁর কাছে কিছুই নেই।' তিনি রুইদাসের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন—'মহারাজ। আমি আপনাকে কিছু ভেট দিতে এসেছি। আপনার অবস্থা দেখে আমার প্রাণ কাঁদছে। আমি আপনাকে এই পরশ পাথর দিচ্ছি। আপনি এটি গ্রহণ করুন। আপনি এরকম হীন অবস্থায় আর থাকবেন না, সচ্ছল অবস্থায় জীবনযাপন করুন।' রুইদাস বললেন—'ভাই। আমার পরশ পাথরের কোন প্রয়োজন নেই। আমি বেশ ভাল অবস্থায় আছি। আমার কোন অভাব নেই। জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন সে সবই আমার আছে। আমার মনে পূর্ণ সন্তোষ আছে। যার মনে অসন্তোষ আছে তাকে ঐ পরশ পাথর দাও। আমি পূর্ণ সন্তুষ্ট। আমার পরশ পাথরের কোন প্রয়োজন নেই।'

সাধু পরশ পাথর তাঁকে দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। রুইদাসও 'না, না' করতে লাগলেন। তিনি নেবেন না, আর সাধুও পরশ পাথর তাঁকে না দিয়ে সেখান থেকে যাবেন না। দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে জেদাজেদি হতে থাকল। শেষমেষ রুইদাস বললেন—'বেশ, তোমার যখন এতই আগ্রহ তখন ঐ পরশ পাথর এই ঝুপড়ির চালায় কোথাও গুঁজে রেখে যাও।' সাধু চালায় পরশ পাথর গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন।

রুইদাসের জীবনের ধারা ঠিকই চলতে থাকে। তাঁর লালসাও ছিল না, আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। জীবনযাত্রার জন্য যা প্রয়োজন তা তাঁর ছিল। তাঁর কোনও অসন্তোষ ছিল না। তাঁর সামনে এমন কোন সমস্যা ছিল না যার সমাধানের জন্য পরশ পাথর দরকার হবে। সত্যিই কোন সমস্যা ছিল না। তিনি তো সেই জিনিস পেয়ে গিয়েছিলেন যা পেলে পরশ পাথরের আর কোনও মূল্য থাকে না।

কয়েক মাস চলে গেল। সেই সাধু আবার রুইদাসের কুটিরে ঘুরে এলেন। তিনি ভেবেছিলেন—এখন সন্ত রুইদাসের বাড়িতে কত আড়ম্বর দেখব। কত ঐশ্বর্য, কত সুন্দর প্রাসাদ, কত রাজকীয় আড়ম্বর দেখতে পাব। উনি তো সাধু হয়েছেন, সন্ন্যাসী হয়েছেন, কিন্তু রাজকীয় হালচালের মোহ যায় নি। তিনি এসে দেখলেন সেই ঘুটো-ফাটা ঝুপড়িই আছে, আর ভক্ত রুইদাস আগের মত বসে জুতো সেলাই করছেন। 'আরে। এ কি ? উনি কি পরশ পাথর ব্যবহারই করেন নি। ব্যবহার করলে আজ এই দশা থাকত না। জুতো সেলাই করার অবস্থা থাকত না আজ। ইনি যেমন অবস্থায় ছিলেন ঠিক তেমন অবস্থায় এখনও আছেন।'

বিতর্কের বিষয়। যাঁর কাছে পরশ পাথর আছে তিনি কি এমন দারিদ্র্যের জীবন যাপন করতে পারেন ? যাঁর কাছে পরশ পাথর আছে তিনি কি জুতো সেলাইয়ের কাজ করতে পারেন ? যাঁর কাছে পরশ পাথর আছে তিনি কি সামান্য শুকনো রুটি খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন ?

কখনই তা সম্ভব নয। লোকে তো পবশ পাথবেব নামে লালাযিত হয। কিন্তু যাঁব কাছে সেই পবশ পাথব আছে যা এক মুহূর্তে লোহাকে সোনা কবতে পাবে, যাঁব হাতে লোহাকে সোনা কবাব শক্তি এসেছে, তিনি কি থেকে কি হযে যান। তাঁব মাটিতে পা পড়ে না, তিনি চলেন না, আকাশে ওড়েন। কেউ আবাব এই বকম হয।

কোন লোক এমনও হয যে তাব পবশ পাথব মিলেছে, পবশ পাথব তাব সামনে পড়ে বযেছে, কিন্তু তাব মনে চিন্তা আসে নি যে 'আমি লোহাকে সোনা বানিযে নেব। পবশ পাথবেব সাহায্যে আমি অনেক সম্পদ সংগ্রহ কবব, উত্তম বাসগৃহ তৈবি কবে নেব, সূক্ষ্ম বস্ত্র পবব'—এসব কিছুই সে স্বপ্নেও ভাবে নি। রুইদাস কখনও ভাবেন নি, 'পবশ পাথব পড়ে আছে, এখন আব আমাব জুতো সেলাই কবাব দবকাব কি আছে? যখন চাইব, এবং যত চাইব সব কিছুই হতে পাববে।' ববং ভেবেছেন, 'জুতো সেলাই থেকে আমি পবম সন্তোষ অনুভব কবছি। ভাঙ্গাচোবা ঝুপড়িতে আমি পবম সন্তোষ অনুভব কবছি। শুকনো রুটিতে পবম আনন্দ আব আত্মতৃপ্তি অনুভব কবছি। ফুটোফাটা ঝুপড়িতেই আমি সন্তুষ্ট আছি।' এসবেব মূল কাবণ কি। এই পবম সন্তোষ কোথা এসেছে? তাব হেতু কি? এই পবিবর্তন কেন আসে? যখন আমবা তাব কাবণেব খোঁজ কবি তখন জানতে পাবি যে ঐ পবিবর্তন মানসিক সমাধিব স্তবে হয। ভক্ত রুইদাস নিজেব মনকে সেই স্তবে, সেই আনন্দেব ভূমিতে পৌঁছে দিযেছিলেন যেখানে পৌঁছলে সোনাব আনন্দ, উত্তম বাসগৃহ, উত্তম ভোজ ইত্যাদি সব কিছুব আনন্দ শেষ হযে যায। সমস্ত আকর্ষণ শেব হয়ে যায। তাব আব মনে হয না সেগুলি বড জিনিস, বিশিষ্ট উপলব্ধি বা মূল্যবান বস্তু। তাব কাছে সমস্ত জাগতিক সম্পদেব মূল্য শেষ হযে যায। এ কথা নিশ্চিত সত্য, জাগতিক বস্তুব মূল্য নিজেব কাছে শেষ হযে না গেলে কোন মানুষ ঐ বকম আচবণ কবতে পাবে না। যতদিন তাব মনে পবশ পাথবেব লোহাকে সোনা কববাব ক্ষমতা সম্বন্ধে মূল্যজ্ঞান

থাকবে, আর সোনা দিয়ে ভাল ভাল জিনিস সংগ্রহ করে অবস্থাপন্ন লোক হওয়ার মূল্যবোধ থাকবে, ততদিন সে এ রকম আচরণ করতে পারবে না যে, সামনে পরশ পাথর পড়ে থাকলেও সে জুতো সেলাই করবে, একটা শুকনো রুটি খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করবে। ঐ পরিস্থিতিতে এ রকম হওয়া সম্ভব নয়। ঐ রকম তখনই হতে পারে যখন তার চেয়েও বড় কোন আনন্দ লাভ তার হয়। এই রকম এক ঘটনা ঘটেছিল।

এক ব্যক্তি এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বলল—'বাবা! আমার খিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খেতে দিন।' সন্ন্যাসী বললেন—'তোমাকে দেব এমন আমার কি আছে। আমি তো সব কিছু ত্যাগ করেছি। তোমাকে কি দেব?' লোকটি বলল—'না, না, তা হবে না। বড়ই আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। নিরাশ হয়ে ফিরে যাব না। কিছু না কিছু দিতেই হবে।' সে বড়ই জেদ করতে লাগল। সন্ন্যাসী ভাবলেন—'বড়ই মুশকিল তো। আমার কাছে এক দানাও খাদ্য নেই। এই বেচারিকে কি দেব? ও তো নিজের জেদ ছাড়বে না দেখছি। কি করব?' শেষমেশ সন্ন্যাসী বললেন—'ভাই! আমার কাছে তো কিছু নেই। এই দিকে নদী আছে, তার পাশে চলে যাও। আমি কালই ওখানে একটা পাথর ফেলে দিয়েছি। ওটা পরশ পাথর। ওর ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়। ঐ পাথর লোহাতে ছোঁয়াও, লোহা সোনা হয়ে যাবে। যাও, ঐ পাথর নিয়ে চলে যাও।'

পরশ পাথরের কথা শুনে লোকটা লালায়িত হল। মন ভবিষ্যতের কল্পনায় ভরে উঠল। সে দৌড়তে দৌড়তে নদীর তীরে গেল। পরশ পাথর দেখতে পেল। রোদে চকচক করছে। সে সেটা তুলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল। হঠাৎ অন্য এক চিন্তা মাথায় আসতে তার হাত মাঝপথে থেমে গেল। সে ভাবল, সন্ন্যাসী পরশ পাথর ফেলে দিল কেন? কেন ফেলে দিল? কোন লোক কি কখনও পরশ পাথর হাতে পেয়ে তা ফেলে দিতে পারে? না, কখনও তা পারে না। তবে কি এটা

নকল পবশ পাথব ? না, নকলও নয। কিন্তু যদি আসলই হয তবে সন্ন্যাসী এটাকে ফেলে দিযেছেন কেন ? নিশ্চযই সন্ন্যাসীব কাছে এব চেযেও বেশি দামী কোন বস্তু আছে, তাই তো তিনি এই কম মূল্যবান পাথব ফেলে দিযেছেন। তাঁব কাছে যদি এব চেযে বেশি ভাল বস্তু থাকে তবে তিনি এই পবশ পাথব কখনও ছুঁডে ফেলে দিতে পাবতেন না। সন্ন্যাসী তো আব সে বকম মূর্খ নন। সে ফিবে এসে সন্ন্যাসীকে বলল—'মহাবাজ। আমি পবশ পাথব চাই না।' যে জিনিস পেযে আপনি পবশ পাথব ফেলে দিয়েছেন আমাকে সেই জিনিস দিন।' লোকটিব যুক্তি অতি সুন্দব।

এ কথা অত্যন্ত সত্যি যে পবশ পাথবেব চেযে বেশি মূল্যবান বস্তু না পেলে, হস্তগত না কবলে, কেউ পবশ পাথব ছুঁডে ফেলে দিতে পাবে না। তাব চেবে কোন মূল্যবান বস্তু পেলে তবে পবশ পাথবেব মূল্য শেষ হযে যায। আব তখন লোকে তা ফেলে দিতে পাবে। রুইদাস পবশ পাথবেব চেযে অনেক বেশি মূল্যবান বস্তু আগেই পেযে গিযেছিলেন বলে তাঁব পবশ পাথরেব ওপবে কোন আকর্ষণ ছিল না। কাজেই তাঁব মনেব আকর্ষণ তুচ্ছ বস্তুকে সবিযে দিযে মহৎ বস্তুব ওপবে কেন্দ্রিত হযেছিল।

তেবাপন্থ ধর্মসঙ্ঘেব চতুর্থ আচার্য ছিলেন শ্রীমজ্জযাচার্য। তিনি মুনির অবস্থা প্রাপ্ত হযেছিলেন। এক বাব তিনি পালীতে এসেছিলেন। বাজাবেব এক দোকানে তিনি অবস্থান কবলেন। তাঁব বযস তখন খুব কম। সেখানে এক নটমণ্ডলী এসে উপস্থিত হল। তাবা দোকানটিব সামনেব মযদানে তাদেব কাজ শুরু কবে দিল। বহু দর্শক সমবেত হল। 'নাটক আবম্ভ হল। এক ঘণ্টা ধবে অভিনয় চলল, তাব পবে শেষ হযে গেল। দর্শকদেব মধ্যে একজন তাব সাথীকে বলল—'তেবাপন্থ ধর্মসঙ্ঘেব ভিত্তি আবও একশ' বছবেব জন্য দারুণ দৃঢ হযে গেল।' ঐ লোকটি জিজ্ঞাসা কবল—'তুমি কি কবে সে কথা জানতে পাবলে ? কেমন কবে এ জ্ঞান লাভ হল ? কোন গল্প

ফাঁদানোর তাল করছ নাকি ?' তখন প্রথম লোকটি বলল, 'নাটক এক ঘণ্টা ধরে চলল। নট বড় সুন্দর অভিনয় করছিল। কিন্তু আমি নাটক একেবারেই দেখি নি। আমি তো সামনের দোকানে সমাসীন নবীন মুনিকে এক ঘণ্টা ধরে দেখেছি। ঐ মুনি চোখ তুলেও এদিকে চেয়ে দেখেন নি। আমি এক দৃষ্টিতে ঐ মুনিকে দেখেছি। আমিও নাটক দেখি নি, আর ঐ মুনিও দেখেন নি। আমি ঐ মুনির মানসিক একাগ্রতা দেখছিলাম। যে সঙ্ঘে এ রকম মুনি হয় সে সঙ্ঘের ভিত্তি দৃঢ় না হয়ে পারে না।'

মুনির এই রকম ভাবনা কি করে হল ? এই পরিবর্তন কি করে এল ? এ রকম হওয়া কি স্বাভাবিক ? না, একেবারেই না। প্রত্যেক লোকই এ রকম পরিস্থিতিতে রস গ্রহণ করে। বুড়ো বা জোয়ান, বালক ব কিশোর, স্ত্রী বা পুরুষ, যাই হোক না কেন, সব মানুষই আমোদ প্রমোদে রস পায়। সকলের চোখই অভিনয় দেখার জন্য উৎসুক হয়। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী এক মুহূর্তের জন্যও নাটকের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। কেন করেন নি ? তার একটাই কারণ, যে ভূমিতে নাটক দেখা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় তিনি তা থেকে অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিলেন। বাহ্য আনন্দের স্রোত তাঁর মনকে আকর্ষণ করত না। তিনি তো অনেক বড় নাটক দেখছিলেন। কাজেই নটের অভিনীত নাটক তাঁর কাছে অকেজো এবং অনাবশ্যক বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

এটা সনাতন সত্য, কোন লোক শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রাপ্ত হলে সামান্য বস্তুসমূহের ওপরে তার আকর্ষণ কমে যায়। কোন লোক রুটি খাচ্ছে। এমন সময় তার সামনে মিষ্টি এসে গেল। সে রুটি ছেড়ে মিষ্টি খেতে শুরু করে। তার কারণ মিষ্টির সঙ্গে তুলনায় রুটির মূল্য কম। মিষ্টির চেয়ে রুটির মূল্য কম হওয়াতে তার কাছে রুটির আকর্ষণ কমে যায়, মিষ্টির আকর্ষণ বেড়ে যায়। যে শ্রেষ্ঠ বস্তুর প্রতি আপনার আকর্ষণ হয় তা অপকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আকর্ষণ শেষ করে দেয়।

আমাদের সঙ্ঘের এক সাধু ছিলেন সতীদাসজী। আচার্য ভিক্ষু

যখন তাঁকে স্মরণ করতেন তখন যদি কেউ তাঁর কাছে গিয়ে বলত, 'স্বামীজি আপনাকে স্মরণ করেছেন, আপনাকে ডাকছেন,' তখুনি তাঁর দুই হাত জুড়ে যেত এবং ঐ অবস্থায় হাতে যা কিছু থাকত, তা মাটিতে পড়ে যেত এবং ভেঙ্গে যেত। হাতের জিনিস মাটিতে রেখে তার পরে কৃতাঞ্জলি হবেন এ কথা তাঁর মনে থাকত না। তিনি স্বামীজির আদেশ পাওয়া মাত্র কৃতাঞ্জলি হতেন। এই রকম করা তাঁর স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। আচার্যের আজ্ঞার প্রতি তাঁর এত আকর্ষণ ছিল যে তার সামনে বা তাঁর হাতে জল, আহার্যে পূর্ণ পাত্র বা কোন পুস্তক আছে, সে বোধ তাঁর থাকত না। তাঁর হাতে যা কিছু থাকত তা মাটিতে পড়ে যেত। তাঁর মন সেই ভূমিতে পৌঁছেছিল যেখানে আর সব আকর্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে।

সাধনা মানুষের মনকে এমন এক স্তরে নিয়ে যায় যেখানে পৌঁছলে মানুষ এক পরম ভূমিকা প্রাপ্ত হয়, তার মনে এক বিশেষ আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে আর সমস্ত আকর্ষণ মিশে যায়, শেষ হয়ে যায়। ঐ স্তর একাগ্রতার ভূমিকা। তা মানসিক সমাধি, চিত্তের- সমাধি। সে সাধক এই স্তরে পৌঁছেছে, সে অগণিত সমস্যা অতিক্রম করেছে। বস্তুজগতে যত অসন্তোষ, লালসা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা বা সংঘর্ষ উৎপন্ন হয় সব কিছু থেকে ঐ সাধক ছুটি পেয়ে যায়। সমস্ত সমস্যা লোপ পেয়ে যায়, সাধক তাদের অতিক্রম করেন।

আমাদের ধ্যেয় উচ্চ হবে, আত্মাভিমুখ হবে। ধ্যেয় নিম্ন স্তরের হওয়া উচিত নয়। উচ্চ ধ্যেয় এবং নিচ ধ্যেয় উভয় ক্ষেত্রেই একাগ্রতার কার্যকারিতা আছে। তার কার্যক্ষমতায় কোন বাধা হয় না। একাগ্রতা শক্তিস্বরূপ। এক ধারায় প্রবহমান মনে তার উৎপত্তি। মন এক ধারায় ওপরের দিকেও বয়ে যেতে পারে, আবার নিচের দিকেও প্রবাহিত হতে পারে। ঐ রকম এক ধারায় প্রবাহিত হওয়া থেকেই একাগ্রতা উৎপন্ন হয়। তা থেকে উর্জা বা ওজঃশক্তি আসে। ঐ শক্তি নিজের কেরামতি দেখাবে। কিন্তু যদি নিচ ধ্যেয়ের ওপরে মনকে একাগ্র করা

যায় তবে নিম্ন স্তরে শক্তির বিস্ফোরণ হবে। তা থেকে কোনই উপকার হবে না। নিম্নগামী শক্তি চেতনার প্রবাহকে নিচের দিকে নিয়ে যাবে। যদি উচ্চ ধ্যেয়ের ওপরে মনকে একাগ্রভাবে নিয়োজিত করা হয় তবে শক্তির বিস্ফোরণ হবে উচ্চ স্তরে। তা মনকে বিকশিত করবে এবং অনেক উপলব্ধির বাহক হবে।

একটা কথা ভেবে দেখবেন। একাগ্রতা খুব ভাল জিনিস। কিন্তু তারও একটা সময়ের সীমা আছে। এ কথা আপনাদের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। আজ বীজ বপন করলেন, আর আজই বৃক্ষ তৈরি হবে, এ অসম্ভব কথা। তার জন্য একটা সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। ঠিক এই ভাবে একাগ্রতার ফললাভ করার জন্য একটা সময়ের পরিমাণ ধার্য আছে। আজ একাগ্রতার অভ্যাস আরম্ভ করলেন। পাঁচ, দশ বা বিশ মিনিট অভ্যাস করতে লাগলেন। বেশ ভাল অনুভূতি হতে থাকে, কিন্তু পূর্ণ ফল লাভ হয় না। এখন বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার অবস্থা। তা থেকে গাছের চারা গজাতে সময় লাগবে। কাল পূর্ণ হলে তবে বীজ থেকে বৃক্ষের উৎপত্তি সম্ভব হবে। প্রথমেই তা সম্ভব হবে না। সেই রকম, আপনি যদি আপনার মনকে তিন ঘণ্টা ধরে প্রবাহিত করতে পারেন তবে আপনার বোধ হবে একাগ্রতায় আপনার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। তখন তাতে ফল ফলতে আরম্ভ করবে। আমাদের সময়ের সীমাও বুঝতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, একাগ্রতা কি করে হবে? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। মন চঞ্চল। সে এক ধারায় বইতে চায় না, একদিক লক্ষ্য করে চলতে চায় না। মনের চঞ্চল অবস্থায় একাগ্রতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মনকে এক ধারায় প্রবাহিত করা যেতে পারে কি উপায়ে? এটা অনুভূত সত্য যে, মন যতক্ষণ সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ তা এক দিকে প্রবাহিত হবে না। মনকে সূক্ষ্ম না করতে পারলে আমরা তাকে ধ্যেয়ের ওপরে এক ভাবে নিবদ্ধ করে রাখতে পারব না। এখন প্রশ্ন, মনকে কি ভাবে সূক্ষ্ম করা যায়? এর উত্তর : মনকে সূক্ষ্ম করার যে উত্তম উপায়টি

আছে তা হল, শ্বাসের অভ্যাস। শ্বাসের ওপরে ধ্যানকে কেন্দ্রিত করা, মনকে নিযোগ করা মনকে সূক্ষ্ম করার নির্ভুল উপায়। ঠোঁটের ওপরে এবং নাকের নিচে যেখানে শ্বাসের স্পর্শ অনুভূত হয় এবং ঘর্ষণ হয় সেখানে মনকে কেন্দ্রিত করা, ঐ স্পর্শবিন্দুতে মনকে স্থির ভাবে সংলগ্ন করা, নিশ্বাস এবং প্রশ্বাসকে অনুভব করা প্রযোজন। তা থেকে শ্বাস দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হবে। এই প্রযোগ যত পারেন অভ্যাস করুন। যদি চান দশ-বিশ-ত্রিশ বা ষাট মিনিট কাল অভ্যাস করুন। তাতে কোন আপত্তি নেই।

ঐ রকম অভ্যাস-কালে আপনার অনুভূতি হবে, অতীতের সমস্ত স্মৃতি, বর্তমানের সমুদয় চিন্তা ও ভবিষ্যতের কল্পনার ভার হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে, একে একে ঐ সমস্ত ভার নিচে নেমে যাচ্ছে এবং লঘুতা প্রাপ্ত হচ্ছে। যখন মন এভাবে হাল্কা হয়ে যাবে তখন তাকে যে দিকে চালিত করা যাবে সে দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরবে না। সেই দিকেই চলতে থাকবে। সুতরাং শ্বাসের দ্বারা, শ্বাসের প্রক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা আমরা যেন মনকে হালকা করি। মনকে হালকা করে একদিকে দীর্ঘকালের জন্য চালিত করলে একাগ্রতায় সিদ্ধিলাভ হতে পারে এবং তা থেকে যে যে ফল পাওয়া সম্ভব তা সবই পাওয়া যেতে পারে।

২৬

সাধনার তিন পক্ষ

কিছু লোক অন্যকে অনেক প্রযোগ শেখায এবং নিজেবাও সেগুলি আচবণ কবে। তাবা বিশেষ শক্তিশালী সাধক। কিন্তু সাধাবণ লোকেব পক্ষে এ বকম করা সম্ভব নয। তাব কাবণ, কতকগুলি প্রযোগ সব লোক আচবণ কবতে সমর্থ হবে না। তাবা যদি ঐ সমস্ত প্রযোগ অভ্যাস কবতে যায তবে বিশেষ ক্লেশকব অবস্থায পডবে। ঐ সমস্ত প্রযোগ শক্তি এবং বিশেষ যোগ্যতাব ওপবে নির্ভর কবে। কিন্তু অনেক প্রযোগ আছে যা সর্বসাধাবণ অভ্যাস কবতে পাবে। প্রত্যেক লোকই সেগুলি আচবণ কবতে পাবে। সবাব পক্ষেই ঐ প্রযোগগুলি আচবণ কবা সম্ভব। আমি আগে থেকে এই বকম চিন্তা কবেছি যে আমবা এই শিবিবে একটি প্রযোগ শিক্ষা কবব এবং পববর্তী শিবিব পর্যন্ত সেটি অভ্যাস কবব। তাবপবে আমবা অন্য একটি প্রযোগ নেব এবং সেটি তাব পবেব শিবিব পর্যন্ত আচবণ কবব। প্রত্যেক প্রযোগ অন্তত ছয মাস কাল অভ্যাস কবা উচিত। যদি অনুভূতি হয তবে আবও দীর্ঘকাল আচবণ কবা যেতে পাবে।

সাধনাব তিনটি অঙ্গ—অধ্যাত্ম, প্রাণ এবং ব্যবহাব। আমাদেব কেবল প্রাণবিদ্যাব ওপবে নির্ভব কবলে চলবে না। আমাদেব মুখ্য ধ্যেয অধ্যাত্ম বা আত্মিক বিকাশ। তা চৈতন্য বিকাশেব পথে সবচেযে

উঁচু ভূমি।

সাধনার দ্বিতীয় পক্ষ—প্রাণের প্রয়োগ। এরও আবশ্যকতা আছে। আমাদের প্রাণবল, মনোবল এবং শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে যাতে অধ্যাত্ম পর্যন্ত পৌঁছনোর সুবিধে হয়।

সাধনার তৃতীয় অঙ্গ—ব্যবহার সম্বন্ধীয়। যদি অধ্যাত্মের সাধনা তথা প্রাণের সাধনা চলতে থাকে অথচ ব্যবহারের কোন পরিবর্তন না হয়, তবে তা মানুষের ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। সাধনার সাথে সাথে আমাদের ব্যবহারেরও পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধ্যাত্মের বিকাশ হতে থাকলে ব্যবহার আপনা থেকে বদলাতে থাকে, না বদলে পারে না। অধিকন্তু সাধনার বিকাশের সঙ্গে সমান তালে ব্যবহারেরও পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। ব্যবহারের সাধনা অধ্যাত্ম সাধনার পরিপূরক এবং সহযোগী প্রমাণিত হবে। আজ আমি এক প্রয়োগের চর্চা করব।

অধ্যাত্মের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি ছয় মাস কাল অহং বিসর্জন করুন। অহংকার এবং মমকার—এই দুই অধ্যাত্ম সাধনার তথা চৈতন্য-বিকাশের পথে অন্তরায়। আপনি অহং বিসর্জনের প্রয়োগ অভ্যাস করুন।

প্রাণসাধনার ব্যাপারে দুটি কথা আছে—এক দীর্ঘশ্বাস, আর এক সমতাল শ্বাস। আপনি এই দুয়েরই অভ্যাস করুন। দীর্ঘ শ্বাস নিন। শ্বাস যত দীর্ঘ হবে, মনের বিকার তত কমে যাবে। ক্রোধ কমে যাবে। আবেগ কমে যাবে। শ্বাস যত ছোট হবে, মনের বিকার ততই বেশি হবে। যখন শ্বাস দীর্ঘ এবং পুরো হয় তখন তা আমাদের ভেতরকার সব উত্তেজনাকর বস্তুকে নিষ্কাশিত করে। এ রকম ঘটার পেছনে এক বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। ফুসফুসে রক্তের শোধন হয়, হার্ট বা হৃৎপিণ্ড সেই রক্ত শরীরের মধ্যে সঞ্চালিত করে।

হার্ট থেকে সঞ্চালিত হবে রক্ত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সেই রক্তের সঙ্গে সংস্কার শরীরে প্রবাহিত হয়। রক্ত যত শুদ্ধ হবে, মন তত

শান্ত হবে। আবেগ কমে যাবে। বক্ত যত দূষিত হবে, স্বভাব তত উত্তেজনাপূর্ণ হবে, ক্রোধ তত বেশি হতে থাকবে। যখন আমবা দীর্ঘ শ্বাস নিই তখন ঐ শ্বাসেব সঙ্গে সব কার্বন, সব দূষিত বস্তু আমাদেব শবীব থেকে বাইবে চলে যায। ছোট শ্বাস নিলে সম্পূর্ণ অক্সিজেনও আমাদেব শবীবেব ভেতবে প্রবেশ কবে না, আব শবীবেব ভেতবে যে সমস্ত ময়লা জমেছে সেগুলিও সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত হয না। এই জন্য মানুষেব স্বভাবেব পবিবর্তন হয না। তাই দীর্ঘ শ্বাস অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ব্যাপাব হল, আমাদেব সমতাল শ্বাস নিতে হবে। সঙ্গীতে যতক্ষণ তালেব সমতা না হয ততক্ষণ সঙ্গীতেব আনন্দ পাওযা যায না। তালেব সমতা চাই। শ্বাসের ক্ষেত্রেও তালেব মূল্য আছে। শ্বাস সমতাল হওযা প্রয়োজন। প্রথম শ্বাস নিতে এবং ছাড়তে যতটা সময লেগেছে, দ্বিতীয, তৃতীয এবং তাব পরবর্তী নিশ্বাসসমূহে ততটাই সময লাগা বাঞ্ছনীয। সমযেব কোন তফাৎ যেন না হয। আমবা যখন চলি তখন যদি প্রথম পদক্ষেপ এক দিকে, দ্বিতীয পদক্ষেপ আব এক দিকে, তৃতীয পদক্ষেপ অন্য আব এক দিকে হয তাহলে আমবা অগ্রসব হতে পাবি না। যখন আমাদেব পদক্ষেপ একই দিকে একই ভাবে হয তখন আমাদেব অগ্রগতি হয। শ্বাস সমতাল হওয়া প্রয়োজন। মনে করুন, প্রথম শ্বাস নিতে ও ছাড়তে আপনাব বিশ সেকেণ্ড লেগেছে। দ্বিতীয এবং তৃতীয শ্বাসেও বিশ সেকেণ্ড কবে লাগা উচিত। এই হল সমতাল শ্বাস। এতে এমন এক লযবদ্ধতাব সৃষ্টি হয যে মানুষ সহজে ধ্যানেব স্থিতিতে পৌঁছে যায। শান্তি আসে। আসনে বসে প্রয়োগ কবাই শুধু ধ্যান নয। যখন আমাদেব মন শান্ত থাকে, যখন আমাদেব মনে কোন উদ্বেগ থাকে না তখনই আমাদেব ধ্যানেব স্থিতি হয। সমতাল শ্বাস থেকে এই অবস্থা আসে। প্রাণেব দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি দিক আছে—দীর্ঘশ্বাস এব সমতাল শ্বাস।

এব পবে তৃতীয কথা—ব্যবহাব সম্বন্ধে। ব্যবহাবেব দৃষ্টিকোণ থেকে

সাধকেব করুণা অভ্যাস কবা উচিত এবং তা আগামী অধিবেশন পর্যন্ত চলা প্রযোজন। প্রতি মুহূর্তে আমাদেব এ বিষযে জাগরূকতা অভ্যাস কবা দবকাব। নিজেব ছেলেমেযে, নিজেব পবিবাব, নিজেব দাস-দাসী, সবাব প্রতি করুণা প্রদর্শন কবা আবশ্যক। কাবও সঙ্গে নির্দয ব্যবহাব কববেন না, নির্দয ভাব পোষণ কববেন না। যখনই মনে নিষ্ঠুব ভাব আসে আমবা তখনই যেন তা সামলে নিযে সদয ভাব নিযে আসি। যদি আমাদেব মনে করুণা আসে তবে জীবনেব অনেক বিপত্তি মিটে যাবে। ক্রুবতাব ফলে অনেক অন্যায সংঘটিত হয। লোকে ক্রুবতাব বশবর্তী হযে অন্যায কাজ কবে। যদি করুণা বিকশিত এবং অভ্যস্ত হয তবে অনেক অস্বস্তিকব অবস্থাব সমাপ্তি ঘটে। জৈন-পবম্পবায এ কথা স্বীকৃত যে, মানুষেব মনে করুণা না থাকলে তাব সম্যক দৃষ্টি হওযা সম্ভব নয। সম্যক দৃষ্টিব এক লক্ষণ—অনুকম্পা। যদি লোকেব অনুকম্পা বা করুণা থাকে তবে বুঝবেন, তাব সম্যক দৃষ্টি আছে। যদি করুণা না থাকে তবে সে মিথ্যাদৃষ্টি। কোন লোক সম্যক দৃষ্টি বা মিথ্যা দৃষ্টি কিনা তা জানাব এই হল কষ্টিপাথব। এই হল আমাদেব ব্যবহাবেব সূত্র।

অধ্যাত্ম সাধনায অহং বিসর্জন, প্রাণেব সাধনায দীর্ঘশ্বাস ও সমতাল শ্বাসেব অভ্যাস, আব ব্যবহাবেব সাধনায করুণাব অভ্যাস—এই তিন বকম সাধনাব প্রযোগেব রূপ। এই তিন প্রযোগ থেকে ফলপ্রাপ্তি হবে, সাফল্য লাভ হবে। প্রথম প্রযোগ থেকে অহং বোধ ত্যাগ হবে, দ্বিতীয থেকে লাভ হবে বাসনা-বিজয, তৃতীয থেকে লাভ হবে করুণাব অভ্যাস।

তবে এব সঙ্গে আব একটি বিষয আছে। সেই বিষযটি হল জপ। তিন তত্ত্বকে সবল কবতে জপ অত্যন্ত প্রযোজন। কাবণ তাতে আমাদেব সমস্ত শক্তিব পবিবর্তন ঘটে। শক্তিব বিকাশ হয। তা প্রাণ-শক্তি এবং আত্মশক্তি উভযকেই প্রভাবিত কবে। এর জন্য আপনি নবকাব মন্ত্র জপ কবেন, মালা ঘোবান। পর্যাযক্রমে এই বকম চলতে

থাকে। এই নিয়মের সামান্য একটু পরিবর্তন আপনাদের বুঝিয়ে দিই। কেউ হয়ত নবকার মন্ত্রের মালা একবার ঘুরিয়ে জপ করে। হয়ত আপনিও তাই করেন। একটা পরিবর্তন করুন। আমি যে নিয়ম বলছি তদনুসারে মালা ঘোরান। আপনি নমস্কার মন্ত্রে এক চরণ নিন 'ণমো অর্হন্তাণং'। আপনাকে এই চরণ জপ করতে হবে। শ্বাস নেওয়ার সময় মন্ত্রের জপ করবেন না, উচ্চারণ করবেন না। শ্বাস ত্যাগ করার সময়েও মন্ত্র জপ করবেন না। পূরকের সময়েও এ মন্ত্র জপ করবেন না, রেচকের সময়েও এ মন্ত্র জপ করবেন না। কুম্ভকের অবস্থাতে এই জপ করবেন। আপনি পূরক করুন, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করুন, নিশ্বাস দেহের মধ্যে আবদ্ধ রাখুন। এই হল কুম্ভকের অবস্থা। এই অবস্থায় স্থিতিকালে জপ করুন। 'ণমো অর্হন্তাণং' এই মন্ত্র উচ্চারণ করুন। এবার নিশ্বাস ত্যাগ করুন, আবার নিশ্বাস নিন। নিশ্বাস ত্যাগ করার সময়েও মন্ত্র জপ করবেন না। আবার শ্বাসকে দেহমধ্যে আবদ্ধ করে কুম্ভক করুন। তখন 'ণমো সিদ্ধাণং' এই মন্ত্র জপ করুন। যতক্ষণ কুম্ভক করবেন ততক্ষণ জপ করবেন। পুরো মালা ফিরানোর কোন প্রয়োজন নেই। নমস্কার মহামন্ত্র বিধিসম্মতভাবে যদি দশবারও জপ করা যায় তবে তা প্রভূত ফলদায়ক এবং মূল্যবান হয়। যতটুকু আপনার সুবিধে ততটুকু সময়ই আপনি বিধিসম্মতভাবে জপ করবেন। তবে একটা পরামর্শ দিই। অন্তত একুশবার জপ করবেন। এক মালা সম্পূর্ণ হলে তো খুব ভাল কথা। না হলেও অন্তত এই সংখ্যক জপ অবশ্য করবেন। আপনার স্থিরতা বৃদ্ধি পাবে, একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে। জপ করার এই এক বিধি। কুম্ভকের স্থিতিকালে জপ করতে হবে, অর্থাৎ পূরক এবং রেচকের মাঝখানে স্থিতিকালে জপ করতে হবে। এই এক জপের বিধি। তার সাথে সাথে রঙের ধ্যান আবশ্যক, স্থানের ধ্যানও অত্যন্ত প্রয়োজন। জপের সঙ্গে চার বস্তু সংযুক্ত হয়েছে—পদ, রঙ, স্থান ও শ্বাসের স্থিতি।

আমরা 'ণমো অর্হন্তাণং' মন্ত্রটি নিয়ে আলোচনা করি। এই মন্ত্রের

বর্ণ শ্বেত, তার স্থান মস্তিষ্কে, সহস্রার চক্রে। এই মন্ত্রের উচ্চারণকালে মন সহস্রার চক্রে স্থিত হয়, তার সম্বন্ধে চিন্তা বা আভাসের বর্ণ শ্বেত হয়। সহস্রার চক্র বা ব্রহ্মরন্ধ্র হল তালুর ওপরের দিক। কুম্ভকের স্থিতিকালে মন্ত্র জপের সময়ে আমাদের মন সহস্রারে নিবদ্ধ হবে। চারটি বিষয়ের আলোচনা করা গেল—

পদ—ণমো অর্হন্তাণং।

রঙ—শ্বেত।

স্থান—সহস্রার চক্র (ব্রহ্মরন্ধ্র, অর্থাৎ তালুর ওপরকার স্থান)।

শ্বাসের স্থিতি—কুম্ভক। অন্তর কুম্ভক।

'ণমো সিদ্ধাণং' এই হল দ্বিতীয় পদ। এর বর্ণ লাল। এর স্থান ললাটের মধ্যভাগে স্থিত আজ্ঞাচক্র। শ্বাসের স্থিতি হল কুম্ভক।

'ণমো আয়রিয়াণং'—এই হল তৃতীয় পদ। এর বর্ণ পীত। এর স্থান বিশুদ্ধি চক্র বা গলদেশ। ঐ চক্র পবিত্রতার স্থান। তা আমাদের সমস্ত ভাবনা এবং আবেগের নিয়ন্ত্রণ স্থান। শ্বাসের স্থিতি হবে—অন্তর কুম্ভক।

'ণমো উবজ্‌ঝায়াণং'—এটি চতুর্থ পদ। এর বর্ণ নীল। এর স্থান হৃদয়কমল। শ্বাসের স্থিতি—কুম্ভক।

'ণমো লোএ সব্বসাহূণং'—এই হল পঞ্চম পদ। এর বর্ণ কৃষ্ণ। এর স্থান পায়ের বুড়ো আঙুল। শ্বাসের স্থিতি—কুম্ভক।

পাঁচটি পদের বর্ণ ভিন্ন, স্থিতি ভিন্ন, শ্বাসের স্থিতি পাঁচটি পদেরই সমান। প্রত্যেকটির সাথে পদ, বর্ণ, স্থান এবং শ্বাসের স্থিতি—এই চার বস্তু সংযুক্ত হয়েছে। এখন এই সবের সঙ্গে আমাদের মনের পূর্ণ সংযোগ হওয়া প্রয়োজন। এই পাঁচ বস্তুর বিধিবৎ সংযোগ হলে জপ শক্তিশালী হয়। একটিরও ন্যূনতা হলে পরিণামের ন্যূনতা ঘটে।

আপনি অহং বিসর্জন করতে চান, করুণার বিকাশ করতে চান, শ্বাসের স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চান। এই তিনই আমরা জপের দ্বারা সাধনা করছি। এর দ্বারা মন্ত্র শক্তিশালী হয়। আপনারা ভাবতে

পাবেন এত নবকাব মন্ত্র জপ ববলাম, এত মালা ফেবালাম, বছবেব পব বছব জপ কবে চলেছি, কিন্তু দৃশ্যত কিছুই লাভ হল না। এ বকম অনুভূতি দু-এক জনেব নয, অনেকেবই হতে পাবে। ওপবে যে প্রক্রিযা বর্ণনা কবলাম সেভাবে ছয মাস কাল জপ করুন, তাব পবে আমাকে জানাবেন কিছু পবিবর্তন হযেছে কিনা। অবশ্যই পবিবর্তন হবে। আমি এই এক প্রযোগেব আলোচনা কবলাম। যাঁবা নানা প্রকাব প্রযোগেব মধ্যে যেতে চান না, যাঁদেব অনেক বকম প্রযোগ অভ্যাস কবাব ক্ষমতাও নেই, তাঁবা এই এক প্রযোগ আঁকড়ে ধরুন। একে হৃদযঙ্গম করুন। একেই চাব বিষযেব ফল লাভ হবে।

প্রথম তত্ত্ব হল অহংকে বিসর্জন কবা। তাব অর্থ—বিনম্রতা। এও এক সমাধি। ভগবান মহাবীব চাব বকম সমাধিব কথা বলেছেন: বিনয সমাধি, শ্রুত সমাধি, তপ সমাধি এবং আচাব সমাধি। প্রথম হল বিনয সমাধি, তাব অর্থ অহং বিসর্জন। অহং স্বযং-উদ্দণ্ডতা বা চণ্ডতা বা প্রকৃতিব ঔদ্ধত্যেব দ্বাবা পবিচিত। লোকে নিজেকে অনেক বড মনে কবে। সেই হল অহং। বিনযেব অর্থ কি? বিনযন—অর্থাৎ দূব কবা, হটানো। বিনযেব উদ্দেশ্য দূব কবা বা অপসাবিত কবা। আমাদেব ভেতবে যে কষাযের ভাব আছে, যে অহং ভাব আছে, তাকে দূব কবাব নাম হল বিনয বা বিনম্রতা। বিনম্রতা অন্যেব প্রতি ব্যবহাবেব রূপ নয। এ হল নিজেব ভেতবকাব গুণ। অহঙ্কাব নিজেব ভেতবেব দোষ। বিনযেব অভ্যাস কবা, বিনয সমাধিতে, আত্ম-সমাধিতে অবস্থান কবা বাঞ্ছনীয। ঐ সমাধি অহঙ্কাবেব বিসর্জন থেকে প্রাপ্তব্য ফল। এতে স্বযং-অনুভূতিব সমাপ্তি ঘটে, একাগ্রতাব সিদ্ধি লাভ হয।

দ্বিতীয বিষয—করুণা অভ্যাস কবা।

তৃতীয বিষয—প্রাণেব সাধনা।

চতুর্থ বিষয—বিধিবৎ মন্ত্র জপ কবা।

এই সব বিষয় একত্র হলে প্রযোগ সম্পুর্ণ হয। এই বকম প্রযোগে

সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। এতে আমাদের চতুর্মুখী বিকাশ হয়। কোন এক অংশের নয়, সমস্ত অংশের বিকাশ হয়। যদি কেবল আমাদের প্রাণ-কোষের বিকাশ হয় কিন্তু স্বভাব না বদলায় তবে ঐ শক্তি আমাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক হয়, আমাদের পক্ষে দুঃখদায়ক হয়। আমরা আত্মার বিকাশ করতে চাই। কিন্তু যদি প্রাণের বিকাশ না হয় তবে দুর্বল প্রাণ আত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। উপনিষদে একটি সুন্দর উক্তি আছে, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—বলহীন বা বীর্যহীন ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করতে পারে না, আত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। বলহীন লোক কিছু করতে পারে না, কিছু পাওয়ার অধিকারী নয়। করুণার অভ্যাস, অহঙ্কারের বিসর্জন নিজের সঙ্কল্পের ওপরে নির্ভর করে, সঙ্কল্পের সাথে সাথে চলে। করুণার প্রয়োগ ব্যবহারে, কিন্তু এখনও এই ভূমি প্রয়োগ করার উপযোগী নয়। আপনি কি এখন কারও প্রতি ক্রূর আচরণ করছেন? কারও প্রতি করুণা প্রদর্শন করছেন? এ ব্যাপার আপনার ওপরে নির্ভর করে। আপনাকে নিজেকেই ভেবেচিন্তে প্রয়োগ করতে হবে। দীর্ঘশ্বাস, সমতাল শ্বাস আর নমস্কার মন্ত্র জপ—এর প্রয়োগ করতে পারেন, শিখতে পারেন।

২৭

নির্বিচার ধ্যান

চীনের সম্রাট এক ধ্যান-সাধককে আমন্ত্রণ করে বললেন, 'আমি উপদেশ শুনতে চাই, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' সাধক স্থির হয়ে বসলেন, সম্রাটও তাঁর সামনে বসলেন। পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, সম্রাট সাধকের মুখের কথা শোনার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সমস্ত পরিবেশ নিস্তব্ধ হয়ে রইল। আধ ঘণ্টা কেটে গেল—সম্রাট প্রতীক্ষারত, সাধুও মৌনতায় অটল। শেষে যখন এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল, সম্রাট অধীর হয়ে বললেন, 'ভন্তে। উপদেশ দেওয়ার জন্য আপনাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছি। আপনার উপদেশ শোনার জন্য আমি খুব উৎসুক। এবার দয়া করে কিছু বলুন।' সম্রাটের মন্ত্রী ধ্যানের মর্ম বুঝতেন। তিনি বললেন, 'রাজন্। উপদেশ তো সমাপ্ত হয়ে গেল। এবার উনি যাওয়ার জন্য তৈরি।' সাধু সত্যিই উঠে চলে গেলেন।

খুবই ভাল হতো যদি আমি ঐ রকম করতে পারতাম—মৌন থেকে যেতাম, আর মৌনতাই হতো উপদেশ। কথা না বলে, মৌন থেকে যতটা বোঝানো যেত, কথা বলে হয়ত ততটা বোঝাতে পারব না। এ-ও আমার পক্ষে এক সমস্যা। কথা না বলার দ্বারা যে বিষয় বোঝানো সম্ভব,

কথা বলার দ্বারা সে বিষয় বোঝানো সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে কখনও কখনও মৌনীর পক্ষেও কথা বলার দরকার হয়। যে ভাষাতে সংযত, সে যদি সারা দিন ধরে কথা বলে তাহলেও যেন কিছু বলে না। নিযুক্তিকারের এক গুরুত্বপূর্ণ রহস্য-সূত্র আছে—যে বিকল্পের জালে ফেঁসে যায় নি, সে কথা বললেও তা না বলার সামিল, আর যে বিকল্পের দ্বারা প্রভাবিত, সে কথা না বললেও যেন অনেক কথা বলে।

মনের ক্রিয়া সমাপ্ত করতে পারলে তবেই আমরা নির্বিচারের স্তরে পৌঁছতে পারি। নির্বিচারের স্তরে পৌঁছতে হলে মনের বিচরণ বন্ধ করতে হবে। যতক্ষণ মন সক্রিয় থাকবে, বিচরণশীল থাকবে, চারদিকে ঘুরবে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবে, পরিব্রজন করবে, ততক্ষণ নির্বিচার ধ্যান হবে না। ঐ রকম ধ্যানের জন্য মনের সংক্রমণশীলতা একেবারে বন্ধ করা প্রয়োজন। এক শব্দ থেকে আর এক শব্দে, এক অর্থ থেকে আর এক অর্থে, এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তায়, মন সর্বদা বিচরণ করছে। আমি মনকে একাগ্র করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু শব্দের চক্র চলছে, আর মন তাতে বিচরণ করছে। মনের চঞ্চলতার আর শেষ হয় না। চঞ্চলতা একাগ্রতার মধ্যেও থাকে, কিন্তু সেই চঞ্চলতা এত সীমিত হয়ে যায় যে আমরা সেই অবস্থার মন স্থির আছে বলেই মনে করি। এর তাৎপর্য এই যে, সেই অবস্থায় মনের চঞ্চলতা একই বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ মন অন্য কোন বিষয়ে সংক্রমণ করে না। সেজন্য তখন মনকে স্থির বলেই মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক তা স্থিরতা নয়—তা পূর্ণ স্থিরতা নয়, আংশিক স্থিরতা মাত্র বা চঞ্চলতার বর্জন। চঞ্চলতার বর্জন আছে বলেই আমরা ঐ মনকে স্থির আর শান্ত বলে মেনে নিই। কিন্তু যেখানে বিচার আছে, মনের ক্রিয়াশীলতা আছে, চিন্তা আছে, সেখানে স্থিরতা কি করে থাকতে পারে ? মনের স্থিরতা হলে নির্বিচারতার স্থিতি এসে যায়। কেবলজ্ঞানের তাৎপর্য—শুদ্ধ জ্ঞান, অবিমিশ্র জ্ঞান, একক জ্ঞান—জ্ঞানের অতিরিক্ত আর কিছুই নয়।

'কেবল' শব্দের তিনটি অর্থ হতে পারে—একক, শুদ্ধ, পরিপূর্ণ।

'কেবল'-এব এক অর্থ, একক। যখন আমবা জ্ঞানই কবি, তাব সঙ্গে কোন সংবেদন কবি না, তখন আমাদেব জ্ঞান একক জ্ঞান—কেবল-জ্ঞান।

'কেবল'-এব দ্বিতীয অর্থ, শুদ্ধ। যখন আমবা জ্ঞানই কবি, সংবেদন কবি না, জ্ঞানেব সঙ্গে সংবেদন জুড়ে দিই না, তখন আমাদেব জ্ঞান শুদ্ধ হয, উপযোগ শুদ্ধ হয। এবং সেই অর্থে আমবা কেবল-জ্ঞানী হযে যাই।

'কেবল'-এব তৃতীয অর্থ, পবিপূর্ণ। পবিপূর্ণতা আপনা আপনি এসে যায। যখন অবিমিশ্র জ্ঞান হয, কেবলজ্ঞান হয, তখন পবিপূর্ণতা আপনা আপনি আসবে। আমবা তাকে আনতে যাব না, আমন্ত্রণ কবব না—পবিপূর্ণতা স্বতই আসতে বাধ্য হবে। যখন আমাদেব জ্ঞান একক, আমাদেব জ্ঞান শুদ্ধ, তখন পবিপূর্ণতা আমাদেব কাছ থেকে সবে থাকতে পাববে না—তাকে আসতেই হবে।

যখন আমবা শুদ্ধ উপযোগেব স্থিতিতে পৌছতে পাবব তখন আমবা নির্বিচাবতাব স্থিতিও লাভ কবব। উপযোগেব অর্থ—চেতনাব প্রবৃত্তি, চৈতন্যেব ব্যাপাব। যেখানে চৈতন্যেব ব্যাপাব শুদ্ধ—অবিমিশ্র, নির্ভেজাল—সেখানে উপযোগ শুদ্ধ। সেখানেই নির্বিচাবেব স্থিতি। সেখানে সমস্ত সংবেদন সমাপ্ত হযে যায।

এক পৌবাণিক কাহিনী আছে। এক প্রসিদ্ধ সাধু ছিলেন। তাঁব কাছে হাজাব হাজাব লোক আসত। তাদেব মধ্যে কিছু ভাল লোক ছিল, কিছু খাবাপ লোকও ছিল। কাবও তাঁব কাছে যাওযা-আসাব, বা তাঁব কাজে থাকাব, বাধা ছিলনা। একদিন এক দুর্জন লোক সাধুব কাছে এসে বসে গেল। তাব মনে সত্যিই কোন জিজ্ঞাসা ছিল না। সে সাধুকে বিবক্ত কবাব জন্য নানা অবাস্তব প্রশ্ন কবতে লাগল। তাব মন ছিল দূষিত—কেবল দুবাগ্রহ ও কু-তর্কে ভবা। বোঝাব কোন ইচ্ছাই তাব ছিল না। সে সাধুকে প্রশ্ন কবল। সাধু শান্তভাবে তাব উত্তব দিলেন, তাকে বোঝানোব জন্য নানা বকম চেষ্টা কবলেন। কিন্তু

তাঁব সমস্ত প্রয়াসই জলকে মন্থন কবাব মত বিফল হল। দধিকে মন্থন কবলে মাখন পাওয়া যায়, কিন্তু জলকে মন্থন কবলে কি পাওয়া যাবে? তবুও সে লোক তাব দুবাগ্রহ ছাড়ল না। সাধু হয়বাণ হয়ে গেলেন। ক্রোধকে আসতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু হয়বাণিব ফলে সাধুব ক্রোধ প্রকট হয়ে গেল। তিনি সাধক ছিলেন, একেবাবে সিদ্ধ ছিলেন না। তিনি বললেন, 'তুমি বড়ই দুষ্ট, এখান থেকে দূব হও।' তাকে ধাক্কা দিয়ে বেব কবে দিলেন। এবপবে কাহিনীতে বলা হয়েছে, বাত্রে ঐ সাধকেব কাছে ভগবান প্রকট হয়ে বললেন, 'তুমি বড়ই অন্যায কবেছ, ঐ ব্যক্তিকে ঘব থেকে বেব কবে দিলে?' সাধু বললেন, 'ভগবন্, আব কি কবব? ঐ লোক বড়ই দুষ্ট, ক্রোধী ও কু-তার্কিক ছিল, তাব বোঝাব কোন ইচ্ছাই ছিল না। সুতবাং আমি আব কি কবতে পাবি?' ভগবান বললেন, 'সাধু! তুমি ভুলে যাচ্ছে যখন আমাব সৃষ্টিতে, আমাব জগতে, তাব জন্যও স্থান আছে, তখন তোমাব ওখানেও তাব জন্য স্থান থাকা উচিত ছিল।' সাধু বললেন, 'ভগবন্, আপনি পবম শুদ্ধ। আমি তো শুদ্ধ নই। আমি কি কবে তাকে স্থান দেব?'

শুদ্ধতা লাভ কবলে আব কোন বিকাব থাকে না। যখন চেতনা শুদ্ধ হয তখন সকলেব জন্যই স্থান দেওযা সম্ভব হয; কিন্তু অশুদ্ধ চেতনা নিয়ে সকলকে স্থান দেওযা যায না। ভগবান পবম শুদ্ধ। শুদ্ধেব জগতে সব কিছুকেই সমান বোধ হয। ভাল হোক, মন্দ হোক, নোংবা হোক, পবিষ্কাব হোক, স্বরূপ হোক, কুৎসিত হোক—সবই সমান। কিন্তু অশুদ্ধতাব ক্ষেত্রে সব সমান হয না। সেখানে সীমাব কথা ওঠে। এই পর্যন্ত দেখ, এই পর্যন্ত অনুভব কব—এসবই সীমাব কথা। শুদ্ধতাতে কোন সীমাবন্ধন থাকে না। সবই নিঃসীম হয়ে যায। আমাদেব চেতনা যখন শুদ্ধ হয, তখন সেই স্থিতিতে সুজন হোক, দুর্জন হোক, ভাল হোক, মন্দ হোক—যা কিছু হোক, কেউই আব কোন সঙ্কটেব সৃষ্টি করতে পাবে না।

শুদ্ধ চেতনা বা নির্বিকাব ধ্যানেব কষ্টিপাথব—তাব প্রকৃত তত্ত্ব

এই যে, সেই অবস্থায় সুখ-দুঃখ সমান হয়ে যায়। আচার্য- কুন্দকুন্দ বলেছেন, শুধু চেতনায় উপনীত হলে, সাধক সুখ-দুঃখের প্রতি সমান হয়ে যান। তাঁর তখন সুখ বা দুঃখের মধ্যে পার্থক্যবোধ থাকে না, তাঁর তখন দুই-ই সমান বলে মনে হয়। কি করে তা সম্ভব হয়? তিনি কি রকম মানুষ—যাঁর কাছে সুখের অনুভূতি প্রিয় নয়, আর দুঃখের অনুভূতিও অপ্রিয় নয়? এই দুয়ের প্রতি সমান ভাব পোষণ করার অবস্থা কি করে ঘটতে পারে? করে তা ঘটে, কেনই বা ঘটে? এই অবস্থা অশুদ্ধ চেতনায় কখনই ঘটে না। যখন আমাদের চেতনা শুদ্ধ হয়ে অবিমিশ্র জ্ঞানের স্থিতি প্রাপ্ত হয়, তখন কোন সুখও থাকে না, দুঃখও থাকে না। সুখ ও দুঃখ—এই দুই সংজ্ঞাই তখন লুপ্ত হয়ে যায়। সেই সময়ে শত্রুও থাকে না, মিত্রও থাকে না। শত্রু ও মিত্র—এই দুই সংজ্ঞারই তখন অবসান ঘটে। তখন বেঁচে থাকার জন্য আকাঙ্ক্ষাও থাকে না, মরে যাওয়ার সম্ভাবনায় ভয়ও থাকে না। আকাঙ্ক্ষা আর ভয়—দুই-ই শেষ হয়ে যায়। 'গীতায়' ভগবান কৃষ্ণ এই স্থিতি এ ভাবে বর্ণনা করেছেন—

'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা, সমত্বং যোগ উচ্যতে।'

সিদ্ধির অর্থ—উপলব্ধি, সফলতা। অ-সিদ্ধির অর্থ—অনুপলব্ধি, অসফলতা। যে সাধক সিদ্ধি আর অ-সিদ্ধিতে, উপলব্ধি আর অনুপ-লব্ধিতে, সমান থাকেন, তাঁর সেই সমত্বকে যোগ বলে। সমত্বই নির্বিচারতার স্থিতি।

নির্বিচার ধ্যানকে সামায়িক বলা যায়। ভগবান মহাবীর সামায়িকের ওপর যতটা জোর দিয়েছেন, আর কিছুর ওপর ততটা দেন নি, কারণ, সামায়িক ধ্যান থেকে আলাদা নয়। সামায়িকের নামই ধ্যান। ধ্যান সামায়িক থেকে পৃথক বস্তু নয়। গৌতম মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ভন্তে! সামায়িক কাকে বলে? সামায়িকের অর্থ (বিষয়) কি?' ভগবান মাত্র দু কথায় ছোট একটা উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, 'আযা সমাইএ, সামাইয়স্স

অট্‌ঠে'—আত্মা সামায়িক, আর আত্মাই সামায়িকের অর্থ। যখন আমরা মূল চেতনায় থাকি, আত্মায় স্থিতিলাভ করি, তখন সেই স্থিতির নাম সামায়িক। আপন আত্মায় থাকাই সামায়িক। সামায়িকের বেশে থাকা বাস্তবিক সামায়িক নয়, নিজের আত্মাতে থাকাই বাস্তবিক সামায়িক। আত্মাতে অবস্থানই সামায়িকের অর্থ, সামায়িকের বিষয়। আত্মা আর সামায়িক দুটি পৃথক বস্তু নয়, শব্দ দুটি হলেও বস্তু একই।

আত্মা আর ধ্যানও পৃথক পৃথক বস্তু নয়। নির্বিচার ধ্যানের উদ্দেশ্য হল, আত্মাতে থাকা। সামায়িকেরও ঐ একই উদ্দেশ্য। তিনটি শব্দ আছে—ধ্যান, নির্বিচারতা আর সামায়িক। আসলে কিন্তু ঐ তিন একই। সামায়িকে থাকার অর্থই নির্বিচার ধ্যানের অবস্থায় থাকা, আর নির্বিচার ধ্যানের অবস্থায় থাকার অর্থই সামায়িকে থাকা। কথা দুটি একই। যখনই আমরা আত্মায় স্থিত হই—আমাদের কেবল আত্মদর্শন হয়, মনে কোন সংকল্প-বিকল্প হয় না, মনের কোন গতি বা বিচরণ থাকে না, তখনই সেই অবস্থায় আমাদের আত্ম-রমণ হয়, আর সেই অবস্থায় স্থিতিই সমত্বে স্থিতি, সামায়িকের স্থিতি। সব দিক থেকেই আমরা তখন সমান হয়ে যাই, কোন দিকেই আর বিষমতা থাকে না। তখন কেবল সমতা আর সমতা। এই হল, পূর্ণ জাগরূকতার স্থিতি, চৈতন্যের স্থিতি। প্রথম যে নেশা, তা সত্যি মদের নেশা নয়—বিচারের নেশা। আচ্ছা, মদের নেশা কি বিচারের নেশা থেকে কম হতে পারে? মদের নেশায় তো মানুষ পাগল হয়ে যায়, টলমল করে চলে, কখনও বা পড়েও যায়। আবার, কখনও কখনও দু-চার ঘণ্টা মূর্চ্ছার ঘোরেই থাকে। ঠিকই বটে, তবে সে তো জ্ঞান ফিরে পায়, সাবধানও হয়ে যায়। কিন্তু বিচারের নেশা বড়ই শক্তিশালী। বিচারের নেশায় লোকে ঘোরতর লড়াই করে যায়, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। কত সংঘর্ষ, কত উন্মাদনা, কত ঝঞ্ঝাট, কত পাগলামি যে বিচারের নেশায় উৎপন্ন হয়, তা বলে শেষ করা যায় না।

একদিন বাত্রি বেলায একটি লোক তাব বাড়ি থেকে বেবিযে এক প্রসিদ্ধ দার্শনিকেব বাড়িতে উপস্থিত হযে তাঁব বদ্ধ দবজায আঘাত কবল। দার্শনিক নিচে এসে দবজা খুললেন। তিনি দেখলেন—সামনে একটি লোক দাঁড়িযে, তাব মাথা কাঁপছে। তিনি ভাবলেন, 'এ তো দেখছি নেশাব ঘোবে আছে। যদি সজ্ঞানে থাকত, জাগরূক বা হুঁশিযাব থাকত, তবে এমন মাথা ঝাঁকাবে কেন?' দার্শনিক জিজ্ঞাসা কবলেন, 'এত বাতে কেন এসেছ?'

'আমার এক জিজ্ঞাসা ছিল। আপনাকে একটা প্রশ্ন কবতে এসেছি।' 'আবে! এই হল জিজ্ঞাসাব সময? প্রশ্ন কবাব সময এই? এত বাত হযেছে—বাবটা বেজে গিযেছে, আব এখন তোমাব প্রশ্ন কবতে আসাব সময হল?'

'এখনই জিজ্ঞাসাটা মনে উঠল, তাই এখনই আপনাব কাছে চলে এলাম। এই শহবে আপনাব চেযে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি তো আব পাব না। আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমাব জিজ্ঞাসাব উত্তব দিন। আমাব প্রশ্ন, ঈশ্বব আছেন, কি নেই?'

'বড অদ্ভুত লোক দেখছি। এই কি প্রশ্ন কবাব উপযুক্ত সময? ঈশ্বব আছেন কিনা—এই প্রশ্নেব এত জলদি উত্তব দবকাবই বা কেন? এজন্য তোমাব কোন কাজ তো এখন ঠেকে নেই। তোমাব ঘবে তো আব আগুন লাগে নি যে এখনই উত্তব পেতে হবে। এত জলদি কেন? মনে হয, নেশায চুব হযে আছ, পাগল হযে আছ, তাই এখনই প্রশ্নেব উত্তব চাইছ।'

'মহাশয! নেশাতেই তো এই প্রশ্ন উঠেছে। যখন জাগরূক থাকি, সতর্ক থাকি, তখন ঈশ্বব আছেন কিনা, এই প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্নটা তো নেশাব মধ্যেই উঠেছে, আব এই সমযেই তো এব উত্তব পাওযা চাই।'

'যখন তোমাব হুঁশ ফিববে তখন এসো।'

'যখন আমাব হুঁশ হবে তখন কে আব আপনাকে প্রশ্ন কবতে আসবে? আমি তো আব প্রশ্ন করব না।'

দেখুন, এখানে হুঁশে থাকার কথা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে কে হুঁশে আছে? এটাই সম্ভব যে, যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি হুঁশে নেই, আর যিনি উত্তর দিচ্ছেন তিনিও হুঁশে নেই। বিচারের, তুবাগ্রহের, মান্যতার নেশা এতই ভয়ঙ্কর যে, মন যখন চঞ্চল হয়ে ঐ দিকে দৌড়য় তখন মনের মাদকতা, মনের চঞ্চলতা মানুষকে পাগল করে দেয়। কেবল পাগলামির মাত্রার তারতম্য থাকে। কেউ চার আনা, কেউ আট আনা, কেউ বার আনা, কেউ একেবারে ষোল আনা পাগল হয়—সে তো কেবল মাত্রার পার্থক্য। অর্থাৎ কেউ কম পাগল, কেউ বেশি পাগল। প্রত্যেক লোকই পাগল, কিন্তু যখন কারও পাগলামি সীমা লঙ্ঘন করে তখন কেবল আমরা তাকে 'পাগল' বলে অভিহিত করি। সব লোকই তার থেকে বেশি কম বা অল্প কম পাগল। যে পাগলের দৌরাত্ম্য সীমা ছাড়িয়ে যায় তার পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়া পরানো হয়—আর বলা হয়, লোকটা পাগল। যখন সে অনর্গল বক-বক করে, অসংবদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করে, তখন সবাই বলে—লোকটা পাগল হয়ে গেছে। নতুবা আমরা তাকে পাগল বলি না। কিন্তু বাস্তবে আমরা সবাই পাগল, আমি-আপনি, ইনি-উনি—সবাই পাগল। বাস্তবে মনের চঞ্চলতার জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মনের চঞ্চলতাই পাগলামি। পূর্ণ হুঁশের স্থিতিতে কেউ নেই। নির্বিচারতার দশাতেই সেই স্থিতি আসে। যেখানে বিচার শেষ হয়, সেখানে সকল পাগলামির অন্ত হয়। তখন কেউ আর পাগল থাকে না, নিরন্তর পূর্ণ হুঁশেই থাকে। যেখানে বিচার নেই সেখানে হুঁশ আছে, পরিপূর্ণ প্রকাশ আছে। সেখানে কোন অন্ধকার নেই। যেখানে হুঁশ নেই, সেখানে অন্ধকার ও আলো জড়িত হয়ে আছে।

আপনি মনে করছেন, এখন এখানে কোন অন্ধকার নেই। তাই যদি মনে করেন, বাইরে রোদে গিয়ে দেখুন। আপনি বুঝতে পারবেন, রোদে যেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখানে প্রকাশ অর্থাৎ আলো বেশি, আর এখানে কম। কম প্রকাশের অর্থই হল—অন্ধকার। এটাই হল

আপেক্ষিক স্থিতি। অধিক প্রকাশের তুলনায় কম প্রকাশকে অন্ধকার বলা যায়। কামরার ভেতরের দিকে তাকান—আপনার মনে হবে এখানে প্রকাশ বেশি, ওখানে প্রকাশ অপেক্ষাকৃত কম। সামনে যে রৌদ্রে-ঝলমল দেয়াল আছে, সেখানকার চেয়ে এই বারান্দায় প্রকাশ কম, আর এই বারান্দার চেয়ে ভেতরের কামরায় প্রকাশ আরও কম। তুলনামূলক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে, আমরা যেখানে কেবল প্রকাশ বলে মনে করেছি, সেখানে অন্ধকারও আছে। তবে, এমন এক বিন্দু আছে যেখানে পৌঁছলে অন্ধকার শেষ হয়ে যাবে। তা না হলে, জ্ঞানই বলুন, দর্শনই বলুন, অনুভবই বলুন, বিকাশই বলুন—সর্বত্রই অন্ধকার লুকিয়ে আছে। এই অন্ধকারের পূর্ণ বিলোপ ততক্ষণ ঘটবে না, যতক্ষণ না আমাদের চেতনা শুদ্ধ উপযোগের স্তরে উন্নীত হবে। অবিমিশ্র জ্ঞান আর অবিমিশ্র চেতনার উপযোগ না হওয়া পর্যন্ত অন্ধকার আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে। প্রকাশের মাত্রা কম হলেই আমরা তা অন্ধকার বলে মনে করি না। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে তা অন্ধকার বলেই বোধ হবে।

এক ঘটনার স্মৃতি আমার মনে আসছে। আমি তখন মাদ্রাজে। আমি একদিন এক জায়গায় বসে ছিলাম, সেখানে আলো ছিল। কিন্তু যখন লেখার প্রশ্ন এল, তখন মনে হল এখানে তো অন্ধকার, এখানে লেখা যাবে না, কারণ লেখার উপযুক্ত আলো এখানে নেই। আমি উঠে আর এক জায়গায় গিয়ে বসলাম, সেখানে আলো বেশি ছিল। লিখতে আরম্ভ করলাম এবং কিছু লিখলামও। কিছুক্ষণ পরে সূক্ষ্ম লিপিতে লেখা একটা পাতা পড়ার প্রয়োজন হল। অক্ষর খুবই সূক্ষ্ম ছিল, তা পড়ার পক্ষে সেখানকার আলো যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং সে জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় যেতে হল। যেখানে আমি আলো মনে করেছিলাম, সেখানেই অন্ধকার হয়ে গেল। লেখার প্রশ্ন আসায় যেখানে আলো ছিল সেখানেই অন্ধকার হল। আমি ঐ আলোয় তো লোককে চিনতে পারছিলাম, কিন্তু লিখতে পারছিলাম না। আবার যখন সূক্ষ্ম

অক্ষব পড়াব প্রযোজন হল, তখন লেখাব উপযুক্ত যে আলো ছিল তাও অন্ধকাব গেল। আমাকে আব একটা তৃতীয জায়গা বেছে নিতে হল।

এই বকম স্থিতিতে কি কবে মানা যায যে, যেখানে আলো থাকে, সেখানে অন্ধকাব থাকে না? আলো আব অন্ধকাব—দুই-ই এক সঙ্গে চলে। তবে এমন এক বিন্দু আছে যেখানে আলো কেবল প্রকাশই—যেখানে অন্ধকাবেব লেশমাত্র থাকে না। সেই বিন্দু হল—নির্বিচাবতাব স্থিতি। সেই বিন্দুতে পৌছলেই সমস্ত অন্ধকাব শেষ হযে যায। সেখানে পূর্ণ প্রকাশ বিবাজ কবে, অবিমিশ্র প্রকাশই বিদ্যমান থাকে। কেবল উজ্জ্বলতা—অন্ধকাব কিছুমাত্র নেই। যে দেখবে, কেবল সত্যই দেখবে। সেখানে বাস্তবিক সত্যেব দর্শন মেলে। ঐ আলোয যথার্থ সত্যকেই দেখা যায। ঐ আলোয় অসত্যেব বেখামাত্র থাকে না। পূর্ণ প্রকাশ প্রকট হয, নির্বিচাবতাব স্থিতি লাভ হয।

আমবা ধ্যান কবছি। এটাই আমাদেব প্রাথমিক অভ্যাস। প্রথম প্রক্রিয়াই হল, মনকে একাগ্র কবা, একই বিচাবেব ওপব মনকে মগ্ন কবা, একই দিকে মনকে প্রবাহিত কবা। এ বকম কবা খুবই ভাল এবং প্রয়োজনও বটে। বস্তুত এ বকম না কবে আমাদেব গতি নেই। প্রথম দফায আমবা আব কি কবব, আব কি-ই বা হবে? তবে এ বকম কবাকেই যেন অন্তিম লক্ষ্য বলে মনে না কবি। এব ফলে কিছু অবশ্য হয—আমি মানছি, কিছু হয-ই। ধ্যান কালে হযত আমবা কিছু দেখতে পাই। সেই দেখাই বাস্তবিক বলে আমবা মনে কবতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বাস্তবিক নয, মনেব পবিণতি মাত্র। এমন সব জিনিষ দেখা যায়, এমন সব শব্দ শোনা যায, যা বাস্তবিক নয—ধ্যানেব সঙ্গে যাব কোন সম্বন্ধই নেই। অথচ এই গুলিকেই বাস্তবিক বলে ধবে নিলাম। এ যেন একটা চক্র। এই চক্রে পড়লে ভ্রান্তি বা বিপর্যয দূব হয না, পূর্ণ সত্যেব দর্শন হয না, আত্মাব সাক্ষাৎকাব হয না।

আত্মা নির্বিচাব, বিচাবেব দ্বাবা সেখানে পৌছনো যায় না। আত্মা অ-শব্দ, শব্দেব মাধ্যমে সেখানে পৌছনো যায না। আত্মা নির্বিকল্প,

বিকল্পের সাহায্যে সেখানে পৌঁছনো যায় না। আত্মা অচিন্ত্য, চিন্তার দ্বারা সেখানে পৌঁছনো যায় না। কেবল নির্বিচার, নিঃশব্দ, নির্বিকল্প, নিশ্চিন্ত আর নির্মনস্ক স্থিতির দ্বারাই আত্মাতে পৌঁছনো যায়। ঐ স্থিতির যে অনুভব হয়, সেই অনুভবই আমাদের সকল শাস্ত্রের সার নির্যাস।

ধর্মশাস্ত্র বলে, আত্মায় প্রকৃত অনন্ত সুখ আছে, বিষযাতীত সুখ আছে, অবাধ সুখ আছে। অনন্ত সুখ তাকেই বলে যার কখনও অন্ত হয় না। অবাধ সুখ তাকেই বলে যাতে কখনও বাধা বা বিঘ্ন হয় না। এমন হয় না যে, এখন যদি সুখ হল তো পরক্ষণেই দুঃখ এসে হাজির হবে। এই সুখ অক্ষয়, কখন তা ক্ষীণ হয় না। এই সুখ বিষয়াতীত, বিষয় থেকে তা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এখন আমরা বিষযাতীত সুখ কি বস্তু তা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না। সামনে বিষয় নেই, বিষয়ের উপভোগ নেই, তবে সুখ কি করে হয়? শব্দ নেই যে শুনতে পাব, তবে সুখ কি করে হবে? রূপ নেই যে দেখতে পাব, তবে সুখ কি করে হবে, চোখের তৃপ্তি কি করে হবে? সুগন্ধ নেই যে গ্রহণ করতে পারব, তবে ঘ্রাণের সুখ কি করে হবে? উৎকৃষ্ট রস নেই যে আস্বাদন করতে পারব, তবে জিহ্বার সুখ কি করে হবে, রসনার তৃপ্তি কি করে হবে? সুকোমল স্পর্শের অভাবে সুখের কল্পনা কি করে করা যেতে পারে? আমাদের কল্পনা এইসব ইন্দ্রিয়জনিত বিষয়সুখ ছেড়ে অন্যত্র যেতেও চায় না। আমরা স্বীকার করতে চাই না যে বিষযাতীত সুখও আছে। কিন্তু এটা সত্য যে, বিষযাতীত সুখ আছে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে সেই সুখের কোন সম্বন্ধ নেই। ঐ সুখ বিষয় থেকে উৎপন্ন হয় না, বিষয় তাকে উৎপন্ন করে না। আমরা ঐ সুখের বিষয়ে চিন্তা পর্যন্ত করতে পারি না। আমরা মনে করি, যারা বিষযাতীত সুখের কথা বলে, তারা অতিরঞ্জন করে, অতিশয়োক্তিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করে, অযথা বলে। এই হল আমাদের অসুবিধে। আমাদের এই রকম চিন্তায় যে দোষ আছে তাও বলতে পারি না, কারণ আমরা

ইন্দ্রিয়ের স্তরেই জীবন যাপন করি। ঐ স্তর থেকেই চিন্তা করি। আমরা মনের স্তর থেকে চিন্তা করি, আর মনের স্তর থেকে চিন্তা করলে এর বেশি কিছু ভাবা সম্ভব হয় না। আমাদের দোষ নেই— ভাবার বা চিন্তা করার যে স্তরে আমরা আছি, সেই স্তর থেকে যা ভাবা সম্ভব তাই আমরা ভেবেছি, আর সেই ভাবনাকেই বাস্তবিক বলে বোধ করেছি। কিন্তু যখন আমাদের চেতনা সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষণে এসে পৌঁছয়, নির্বিচারতার শুদ্ধ অনুভূতিতে প্রবেশ করে, তখন সেই ক্ষণে যে সহজ আনন্দ স্ফূর্ত হয়, যে সুখের অনুভব হয়, তাই হল সহজ সুখ— অবাধ সুখ। সেই সুখের ক্ষণিক দর্শন মিললেই অনুভব হয়, বিষয়জনিত সুখ আর সহজস্ফূর্ত বিশুদ্ধ সুখের মধ্যে কতই না পার্থক্য। সেই সহজ বিশুদ্ধ সুখ কত মহান। এই হল নির্বিচারতার স্থিতি, আত্মার স্থিতি—আত্মানুভবের স্থিতি, আত্ম-রমণের স্থিতি। বাইরে থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে গুটিয়ে আনার স্থিতি। যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তাকে অল্পের মধ্যে জড়ো করে রাখার স্থিতি।

আমাদের মস্তিষ্কে অগণিত প্রকোষ্ঠ আছে। একটা লোকের মস্তিষ্কে যত প্রকোষ্ঠ থাকে তা যদি মাটির ওপর পর পর বিছিয়ে দেওয়া যায় তো কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভূভাগ ঢেকে যাবে, উপরন্তু কিছু প্রকোষ্ঠ অবশিষ্ট থাকবে। আমাদের মস্তিষ্কে যখন থাকে তখন ঐ প্রকোষ্ঠগুলি অত্যন্ত সঙ্কুচিত থাকে, কিন্তু তাদের বাইরে ফেললে এতটা ভূভাগ ঢেকে যাবে। আমাদের মস্তিষ্কে প্রকোষ্ঠ এত অসংখ্য।

যখন আমাদের চেতনার ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করে, চেতনাকে গুটিয়ে এনে, নিজের সমস্ত অনুভূতিকে একত্র করে এক কেন্দ্রে সংহত করা যায় তখন তার কত তীব্র যে অনুভব হবে তা কল্পনাও করা যায় না। তার শক্তি হবে অত্যন্ত প্রবল।

যখন আপনারা ঘর ছেড়ে কোথাও যান—দেশের আর এক স্থানে, কি বিদেশে যান—তখন মনে হবে যাত্রা করছেন। যাত্রার অনুভব

ভিন্ন বকমেব। আবাব যখন যাত্রা থেকে ঘবে ফেবেন তখন মনে হবে আপনাদেব মূল স্থানে এসে গেছেন। মনেব যে ছডিযে পডা, বৃত্তিব যে ছডিযে পড়া, বিচাবেব যে ছডিযে পডা—তাও এই বকম। যখন তাদেব ছডিযে পডা বন্ধ কবে তাদেব গুটিযে এক কেন্দ্রে আনা যায়, তখন তাবা যেন আপন ঘবে ফিবে আসে। এই অনুভূতি অলৌকিক বোধ হয।

আত্মা মনেব মাধ্যমে, ইন্দ্রিযেব মাধ্যমে, বিচাবেব মাধ্যমে, স্মৃতিব মাধ্যমে, কল্পনাব মাধ্যমে চাব দিকে দৌডচ্ছে। তাব শক্তি ছডিযে পডছে, কেন্দ্রিত হচ্ছে না। যখন আমবা ইন্দ্রিযেব দবজা বন্ধ কবে, বিচাব বন্ধ কবে, স্মৃতি আব কল্পনা বন্ধ কবে—সব কিছু সংযত কবে, নিজেব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চেতনাকে সংহত কবে তাব মূল স্থানে তাকে স্থাপিত কবি, তখন তাব ছডিযে পড়া শক্তি কেন্দ্রিত হযে যাবে। সেই শক্তি হবে প্রবল। সেই সমযে বিলক্ষণ এক অনুভব হয। এমন নয যে, সেই অনুভব এখন আব আমাদেব হতে পাবে না। আমি আগেই বলেছি, আজও কেবলজ্ঞান অনুভব কবা যায, অতীন্দ্রিয জ্ঞান অনুভব কবা যায, আত্মাব সহজ আনন্দ অনুভব কবা যায। আমাদেব কেবল এটুকু কবতে হবে যে, বিচাবেব ভূমি ছেডে নির্বিচাবেব ভূমিতে পৌছতে হবে , স্মৃতি, কল্পনা ইত্যাদি পবিহাব কবে অবিমিশ্র জ্ঞানেব, শুদ্ধ চেতনাব আব শুদ্ধ উপযোগেব স্থিতিতে পৌছতে হবে, আব সেই স্থিতিব অনুভব কবতে হবে।

জাগৰূকতাব সঙ্গে দেখতে হবে, মনেব কোন ব্যাপাব যেন না ঘটে, আব মন যেন শুদ্ধ চেতনাব স্থিতিতে কোন বাধাব সৃষ্টি না কবে। আমবা যদি এতটা জাগৰূকতাব সঙ্গে দেখতে পাবি, আব অবিমিশ্র জ্ঞানেব স্থিতি অনুভব কবতে পাবি, তবে আজও আমাদেব পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না। অনেক কিছু অসম্ভব বলে ধাবণা কবে বসে আছি, আব সেই ধাবণা এই ভাষায প্রকাশ কবছি—এখন কলিকাল, ঘোব কলিযুগ, ঐ সব এখন পাওয়া যায় না, মোক্ষ মেলে না, কেবলজ্ঞান

হয় না, ইত্যাদি। এই বকম ধাবণাব ফলে মন নিবাশা ও কুণ্ঠায ভবে যায, আগে এগোবাব জন্য যে পা তুলেছি তা পিছিযে পড়ে। আমাদেব এগিযে যাওযাব আকুলতা নষ্ট হযে যায, কাবণ যদি আমবা মেনে নিই অমুক স্থিতি এখন প্রাপ্য নয, তবে তার জন্য প্রচেষ্টা কে কববে, আব কেনই বা কববে? আমরা কোন বিশেষ স্থিতি এখন প্রাপ্ত হতে পাবি না—এই ধাবণা আমাদেব দূব কবতে হবে। কি পাওয়া সম্ভব, কি পাওযা সম্ভব নয, সে চিন্তা আমাব অধিকাব-ক্ষেত্রেব মধ্যে নয। আমাদেব অধিকাব কেবল চলাব, কেবল চলতে থাকাব, কেবল পা আগে বাড়িযে দেওযাব। চবৈবেতি, চবৈবেতি—এই আমাদেব কর্তব্য। আমাদেব গতিশীল হওযাব অধিকাব আছে, কোন এক নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে যাওয়াব অধিকাব আছে।

আমরা নির্বিচাব চেতনাব স্থিতিব দিকে এগিযে যাওযাব জন্য পা বাড়াব। যা ঘটাব, তা অবশ্যই ঘটবে। যে উপলব্ধি প্রাপ্তব্য হয, তা আমরা পেযে যাব। যা ঘটাব নয, তা ঘটবে না। যা প্রাপ্তব্য নয, তা পাওয়া যাবে না। প্রথমেই কেন চিন্তাব বোঝা মাথায তুলে নেব? কেন চিন্তাব ভারে নুযে পড়ব?

যে ব্যক্তি শুদ্ধ চেতনাব স্থিতিব—শুদ্ধ উপযোগেব স্থিতিব—যথেষ্ট দৃঢ অভ্যাস কবেছে, সে নিশ্চিত সেই স্থিতিতে পৌছে যাবে, যে স্থিতিতে পৌছলে মোক্ষ আছে কি নেই, পবমাত্মা আছেন কি নেই, পবমাত্মাব স্থিতিতে সুখ আছে কি নেই—এ সব প্রশ্নই শেষ হয়ে যাবে, মীমাংসিত হযে যাবে।

২৮

চেতনার দিক পরিবর্তন

অনেক দিন আগেকার কথা। এক পথিক পথ চলছিল। পথের মাঝখানে এক জঙ্গল পড়ল। সে জঙ্গলে প্রবেশ করল। জঙ্গলের পথ খানিকটা পার হল। তার পরণে সাদা কাপড় ছিল। হঠাৎ তার সামনে চারটি মানুষ এসে দাঁড়াল। তারা ডাকাত। পথিক একলা, তারা চারজন। তারা হেঁকে বলল—'থাম'। পথিক থেমে গেল। তারা তাকে চেপে ধরতে চেষ্টা করল। পথিকেরও গায়ে বেশ জোর ছিল। হাতাহাতি শুরু হল। পথিক কিছুক্ষণ লড়াই করল। কিন্তু সে একা, লুটেরারা চারজন। কতক্ষণ আর তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? ডাকাতরা তাকে জাপটে ফেলল। তার শরীর তল্লাসী করল। কিন্তু তারা শুধুই হয়রাণ হল। তার কাছে একটি পয়সা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ডাকাতরা আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল—'ওহে! এক পয়সার জন্য এত লড়াই করলে? প্রথমেই যদি এ কথা বলতে, তাহলে আমরা তোমার ওপরে হামলা করতাম না।' পথিক বলল—'প্রশ্ন তো এক পয়সার নয়, প্রশ্ন আকর্ষণের। এক পয়সাই হোক আর হাজার টাকাই হোক, আমার ধনের ওপরে আকর্ষণ। হাজার টাকা থাকলে আমার যতটা আকর্ষণ থাকত ঐ এক পয়সার

ওপরও আমার সেই আকর্ষণ। প্রশ্ন সংখ্যার নয়, প্রশ্ন আকর্ষণের।'

মূল কথা হল আমাদের আকর্ষণ কোন্ দিকে যাচ্ছে। আমাদের আকর্ষণ এক বিশেষ দিক-অভিমুখী হলে আমাদের প্রবৃত্তি, চিন্তা এবং ক্রিয়া এক রকম হবে, আর যদি আমাদের আকর্ষণ অন্য আর এক দিক-অভিমুখী হয় তো আমাদের প্রবৃত্তি, চিন্তা ও ক্রিয়া অন্য রকম হবে। আকর্ষণই প্রধান কথা। তা সব কিছুর মধ্যেই পরিবর্তন এনে দেয়।

প্রশ্ন হচ্ছে—অ-ব্রত কি? ব্রত কি? এক দিক অভিমুখী আকর্ষণ অ-ব্রত, আর অন্য আর এক দিক অভিমুখী আকর্ষণ ব্রত। দুটি দু রকম জিনিস নয়। দুটি একই জিনিস। কেবল দিকের পরিবর্তন। ব্রত ও অ-ব্রত দুই বিপরীত দিক-অভিমুখী পথিক।

যে আকর্ষণ আত্মা থেকে নির্গত হয়ে বাইরের দিকে যায় সেই আকর্ষণের নাম অ-ব্রত। আর যে আকর্ষণ বাইরে থেকে ফিরে আত্মার অভিমুখে প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় ব্রত। ব্রত কোন নতুন জিনিস নয়। আকর্ষণের দিক পরিবর্তনের নাম ব্রত। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের আকর্ষণ বহির্মুখী। এক আছে আমাদের মূল চেতনা। এই চেতনাকে ঘিরে এক কষায়-বলয় দিকে আছে। কষায়-বলয়ের পরে আছে প্রবৃত্তির বলয়। কষায়-আত্মা ও যোগ আত্মা এই দুটি দ্রব্য আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মূল-চেতনা, কষায়-বলয়, যোগ-বলয় আর প্রবৃত্তি-বলয়। আমাদের জ্ঞান থেকে নিঃসৃত রশ্মি কষায়ের সঙ্গে মিশ্রিত হলে স্বকীয় জ্ঞানরূপ হারিয়ে ফেলে এবং সংবেদনের রূপ নেয়। জ্ঞান সংবেদনে পরিণত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানধারার সঙ্গে কষায়ের মিশ্রণ না হয় ততক্ষণ জ্ঞান জ্ঞানই থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞান রূপে থাকে। যখন কষায় জ্ঞানধারার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখন জ্ঞান সংবেদনে পরিণত হয়। তার আর বিশুদ্ধ জ্ঞান রূপ থাকে না। সংবেদন থেকে আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। রাগের আকর্ষণের উদ্ভব হয়, দ্বেষের আকর্ষণর জন্ম হয়। সমস্ত আকর্ষণের উদ্ভব হয় সংবেদন থেকে। বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ হয়, তার তার মূল কারণ সংবেদন। খাদ্য সুস্বাদু মনে হয়, কারণ জিহ্বার নিজস্ব

সংবেদন আছে। সুগন্ধ বস্তু শুঁকতে ভাল লাগে, তাব কাবণ নাকেব নিজস্ব একটা সংবেদন আছে। মন ঐ সবেব দিকে আকৃষ্ট হয়। কাউকে গালাগালি কবলে গালাগালিব প্রতি আকর্ষণ হয, তাব কাবণ তখন আমবা জ্ঞানেব জগতে বাস কবি না, সংবেদনেব জগতে বাস কবি। সংবেদনেব জীবন প্রতিক্রিযাব জীবন। জ্ঞানেব প্রভাবে মানুষ ক্রিয়া কবে। সংবেদনে প্রতিক্রিযাব সৃষ্টি হয। জ্ঞান স্বতন্ত্র, সংবেদন পবতন্ত্র। জ্ঞানেব প্রভাবে মানুষ নিজস্ব ভঙ্গিতে ক্রিয়া সম্পাদন কবে। সংবেদনে নিজস্ব কোনও ক্রিযা হয না, প্রতিক্রিয়া হয। সামনেব লোক যে বকম ক্রিযা কবে, সেই বকম ক্রিযা কবায। কেউ পাথব ছুঁডছে দেখলে সে-ও পাথব ছোঁডে। কেউ প্রশংসা কবলে সে-ও প্রশংসা কবে। অর্থাৎ ক্রিযাব প্রতিক্রিযা হয। প্রতিবিম্ব হয। স্বতন্ত্র কোন ক্রিয়া হয না। সে লোকেব নিজস্ব কোন ক্রিযা সম্পাদন কবাব ক্ষমতা থাকে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, চিন্তন, মনন এবং ক্রিযাব স্বাতন্ত্র্য—এ সবই জ্ঞানেব অবস্থায় সম্ভবপব, সংবেদনেব অবস্থাতে নয। থালাতে কবে খাবাব এসেছে। যদি রুচিকব এবং মনোবম খাদ্য হয তবে প্রশংসা কবা হয, অপ্রিয় এবং অরুচিকব হলে অখাদ্য বলে গালি দেওযা হয়। এ সবই প্রতিক্রিযাব জীবন। 'যে যেমন তাব সঙ্গে তেমন ব্যবহাব', 'শঠেব সঙ্গে শাঠ্য আচবণ কব'—এ সবই সংবেদনেব ক্ষেত্রে প্রচলিত সিদ্ধান্ত, প্রতিক্রিয়াব ক্ষেত্রে প্রচলিত মতবাদ। 'শঠে শাঠ্যেব' অর্থ—প্রতিক্রিযা, ক্রিযা নয।

সংবেদনেব জগতে যে জীবন যাপন কবে সে ক্রিয়াব জগতে বাস কবতে পাবে না। সে নিজস্ব ক্রিযা সম্পাদন কবতে অসমর্থ। সে যা কিছু কবে সবই প্রতিক্রিযা। আপনি নিজেব কার্যকলাপ লক্ষ্য করে দেখুন। একশটা কাজেব মধ্যে একশটাই প্রতিক্রিযা-প্রেবিত মনে হবে। ঐ লোক আমাব উপকাব কবেছে, আমিও তাব উপকাব কবব। ঐ লোকটি আমাব নিন্দা কবে অনিষ্ট কবেছে, আমিও তাব অনিষ্টকব নিন্দা কবব। ঐ লোকটি আমাকে অপমানিত কবেছে, আমিও তাকে

অপমান কবব। ঐ সবই প্রতিক্রিয়া। আমাদেব মনে অনেক বিজার্ভেশন বা ভাবগুপ্তি, অনেক অববোধের প্রক্রিয়া হয। তা মানুষকে প্রতিক্রিয়াব জীবন যাপন কবতে বাধ্য করে। কাবণ তার ভেতবে জ্ঞান নেই, সংবেদন আছে। সংবেদন মানুষকে অ-ব্রতের দিকে নিযে যায। হিংসা, অসত্য, চুরি, অ-ব্রহ্মাচর্য এবং মমত্ব—এ সবই সংবেদনেব প্রতিফলন, প্রতিক্রিযাব পবিণাম।

লোকে অনেক কিছু সংগ্রহ কবে। প্রশ্ন হচ্ছে—কেন? ঐ বকম সংগ্রহ কবাব কি কোন প্রযোজন আছে? তা কি এতই উপযোগী? প্রযোজন নেই, উপকাবও নেই, তবুও লোকে সংগ্রহ কবে। এব মূল কাবণ প্রতিক্রিযা। সে ভাবে—'অমুক লোক ধন অর্জন করেছে, বিত্ত সংগ্রহ কবেছে এবং আজ সে সমাজে সমাদৃত। লোকে তাকে সম্মান দেয, পূজা কবে। তাকে সামনেব পংক্তিতে বসানো হয়। এই বকম পবিস্থিতিতে আমিও কেন ধনোপার্জন কবব না? ধন সংগ্রহ করাতে কি আপত্তি থাকতে পাবে?' এই প্রতিক্রিযা দ্বাবা প্রভাবিত হযে সে ধন সংগ্রহ কবে। তাব পক্ষে অত ধনের কোন প্রযোজন নেই, তবু সে ধন সংগ্রহ কবে। সে এই বকম চিন্তা কবে: 'এই বকম কবলে যদি এই বকম ফল হয তবে আমাবও ঐ বকম কবা উচিত।' এ সবই হল সংবেদনেব জীবন, সংবেদনেব চিন্তাধাবা। যতদিন পর্যন্ত জ্ঞানেব ধাবাব সঙ্গে কবাযেব ধাবাব সংমিশ্রণ হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমবা এই বকম জীবন থেকে নিজেদেব বাঁচাতে পাবব না।

অজ্ঞানে হিংসা হয না। কোন অজ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য জীব, বা জড পদার্থ কখনও হিংসা কবতে পাবে না। প্রাণী বা জীবই শুধু হিংসা কবে। যে জীবেব জ্ঞান আছে সে-ই শুধু হিংসা কবতে পাবে। হিংসা সজ্ঞানে সম্পাদিত হয়। অসত্যাচবণ সজ্ঞানে সাধিত হয। চোর চুবি কবে সজ্ঞানে। বাসনা এবং কামনা জ্ঞানের সীমার মধ্যে ঘটে। মমত্বের সংগ্রহও জ্ঞানের সীমার মধ্যে হযে থাকে। অচেতন পদার্থ দ্বাবা হিংসা বা কোন কিছু হতে পাবে না। প্রশ্ন হচ্ছে—এ রকম কেন

হয় ? চেতনা কি এই রকম জিনিস চায় ? তা কি আত্মার ধর্ম ? তা কি আত্মস্বভাব ? ঐ সমস্ত ক্রিয়া আত্মার স্বভাব নয়। কষায় বিহ্বল জ্ঞানের দিক থেকে এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যখন জ্ঞান কষায়ের দ্বারা প্লাবিত হয়, বিহ্বল হয়, তখন এই সব কাজ হয়। যখন কষায়ের রসায়ন জ্ঞানের ধারার সঙ্গে মিশে যায় তখন অসদাচরণকে সদাচরণ বলে, প্রিয় বলে মনে হতে থাকে। এই সব বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়।

এক জনকে গালি দিয়েছে। যতক্ষণ গালির প্রতিশোধ গালি দ্বারা না হয় ততক্ষণ সে ভাবে—'ওহো। এ আমি কি করলাম ? গালির উত্তরে গালি দিলাম না। লোকে কি ভাববে ? তারা বলবে—'ও তো মাটি দিয়ে তৈরি। ওর মধ্যে কোন কর্তৃত্ব নেই। এত বড় অপমান। তাও ও সয়ে গেল। ও তো কেবল মাটির পুতুল।' মনের ওপরে প্রতিক্রিয়া হয়। যখন সে ঐ রকম পালটা আচরণ করতে পারে, গালির বদলে গালি দিতে পারে, তিরস্কারের জবাব তিরস্কারে দিতে পারে, তখন তার সন্তোষ হয়। এ হল আকর্ষণের ব্যাপার, সন্তোষের ব্যাপার। ও সবই কষায়—রসায়নের প্রতিক্রিয়া। তার মিশ্রণ হলে মানুষের চিন্তার ধারা বদলে যায়। সে ভাবে—'এর চেয়ে বড় কোন সন্তোষ নেই, কোন আনন্দ নেই। কোন তৃপ্তি নেই।' সাপে কামড়েছে, নিম খাওয়ানো হচ্ছে। নিম তেতো, কিন্তু মিষ্টি লাগছে। নিম তো মিষ্টি নয়, তেতো। কিন্তু তা মিষ্টি মনে হচ্ছে। কেন ? তার কারণ রক্তে এমন একটা রসায়ন অর্থাৎ সাপের বিষ প্রবেশ করেছে যে নিমের কারবাইড তাতে লীন হয়ে যায়, নিম মিষ্টি লাগে। সেই রকম মনে যতটা কষায়ের পরিণাম বা রস প্রবেশ করবে আমাদের অনুভূতি, চিন্তা অথবা তৃপ্তিকে ততটা বদলে দেবে, সন্তোষ এবং অসন্তোষকে নতুন রূপ দেবে।

একটি পৌরাণিক কাহিনী বলি। একবার ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণী দুজনে মনুষ্যলোকে এলেন। তাঁরা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক গ্রামে এসে

পৌঁছলেন। সেখানকার সব লোকই খুব গরীব। তারা সকলেই দুঃস্থ। ইন্দ্রাণীর মন করুণায় ভরে উঠল। তিনি ইন্দ্রকে বললেন—'দেব। আপনি যখন এ গ্রামে এসেছেন তখন একে সম্পদশালী করে দিন। ঐ লোকগুলি কেন গরীব থাকবে? ওদের মনে সন্তোষ নেই। আপনি কৃপা করে এদের সমৃদ্ধ করে দিন যাতে এরা সন্তোষের সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারে।' ইন্দ্র বললেন—'তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এদের সমৃদ্ধ করে দেব, কিন্তু তাদের সন্তুষ্ট করব এ দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। তুমি কি সে দায়িত্ব নিতে পারবে?' ইন্দ্রাণী বললেন—'আপনি এদের সমৃদ্ধ করে দিন। এদের দারিদ্র্য দূর হোক। দারিদ্র্য দূর হলে অসন্তোষ আপনা থেকেই মিটে যাবে, তারা নিজে নিজেই তুষ্ট হবে। আমার কোনও দায়িত্ব নিতে হবে না।' ইন্দ্র বললেন—'দেবি। তুমি জান না, এ রকম কখনও হয় না। আমি জানি, ও রকম হবে না। সম্পদ লাভ হলেই যে সন্তোষ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।' ইন্দ্রাণী জেদ করলেন। ইন্দ্র গাঁয়ের বাইরে একটা সোনার খনি করে দিলেন। গাঁয়ের লোক তার খোঁজ পেল। তারা জানতে পারল যে গাঁয়ের বাইরে ভাল ভাল সোনা পড়ে আছে। যে যত চায়, নিয়ে আসতে পারে। তাদের সোনার মূল্য জানা ছিল। তারা জানত, সোনা কত মূল্যবান। গাঁয়ের সব লোক এসে সেই সোনা নেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়ল। সকলের আকর্ষণ একই দিকে চালিত হল। সবাই এল। যে যত পারল সোনা নিয়ে গেল। গ্রামে এমন একজনও অবশিষ্ট রইল না যে সোনা নেয় নি। সারা গাঁ এক দিনে ধনবান হয়ে গেল। সবাই সম্পদশালী হল। এক দিন আগে সবাই দরিদ্র ছিল। আজ সবাই ধনবান হয়ে গেল। খুব চমৎকার ব্যাপার হল।

রাত কাটল, সকাল হল। ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণী সেখানে ছিলেন। গ্রামে আলোচনা হতে থাকে। কেউ বলল, 'এ কি ব্যাপার? কেমন করে হল? কোন দেবতা এই অদ্ভুত কাজ করেছেন। আবার এ-ও মনে হচ্ছে, যে এ রকম করেছে সে নিতান্ত মূর্খ।' সবাই বলে উঠল,

'সে কি? মূর্খ হল কি করে?' যে আমাদের এত ধন দিয়েছে তাকে মূর্খ বলছ কেন?' সে বলল, 'সে যদি বুদ্ধিমান লোক হতো তবে কখনই সবাইকে সে সোনা দিত না। কয়েক জনকে সোনা দিলে তার একটা অর্থ হতো। সবাকে সোনা দেওয়াতে সোনার আর কোন অর্থ বা মূল্য রইল না। এখন সবাই ধনবান হয়ে গেল। কেউ আর সেবক রইল না। এখন আর ভৃত্য বা সেবক থাকবে না। এখন কাজ চলবে কি করে? আমাদের কাছে ধন আছে, অথচ আমাদের ভৃত্য-পরিজন নেই, তবে ধন লাভের অর্থ কি? ছোট-বড় সব সমান হয়ে গেল।' ইন্দ্র শুনলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে বললেন—'শুনলে তো? এদের সন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে, না অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে? ধন দেওয়া আমার হাতের মধ্যে ছিল, কিন্তু সন্তোষ দেওয়া আমার হাতের মধ্যে ছিল না।'

এটা কাহিনী মাত্র। কিন্তু আমরা এর ভিত্তিতে একটু চিন্তা করলে দেখি অসন্তোষ কোন বস্তুর আধারে ঘটে না। কষায়জড়িত চেতনার আধারে অসন্তোষ উৎপন্ন হয়। কষায়গ্রস্ত চেতনার ধারার একটি লক্ষণ যে, মানুষ অন্যের চেয়ে বড় হতে চায়। যত তার লোভের প্রবণ হয় তত তার আত্মাভিমান বাড়ে, তত সে সবার চেয়ে বড় হতে চায়। যখন আশেপাশে সবাই ছোট এবং শ্রমজীবী হয় তখন সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে। একবার চোখ তুলে ভ্রূকুটি করলে দশ-বিশ জন লোক সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে, তবে তো বড় হওয়ার মজা, শ্রেষ্ঠত্বের আনন্দ পাওয়া যাবে। ধনবান হওয়ার, ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার আনন্দ তখনই পাওয়া যাবে। তা না হলে সবই ব্যর্থ। ধনবান হওয়ার ব্যাপার যেমন, অন্য অন্য জিনিসের ক্ষেত্রেও ব্যাপার তেমনি। এতে কি লাভ? লোকের সন্তোষ হয় না। যখন লোকে অগ্রণী হয় তখন তার সন্তোষ হয়। তার পেছনে এক লম্বা সেবকের সারি চলতে হবে। কষায়-চেতনার ফলে এ সব প্রতিক্রিয়া হয়। যখন চেতনার কষায়-আবরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে চেতনার বিশুদ্ধ ধারা

প্রবাহিত থাকে তখন সমস্ত আকর্ষণেব সমাপ্তি ঘটে এবং মানুষেব মধ্যে অহিংসা প্রভৃতি সদাচাব বিকশিত হয।

ভগবান মহাবীব একদা কাযোৎসর্গ মুদ্রায এক শূন্য গৃহে ধ্যানস্থ অবস্থায দণ্ডাযমান ছিলেন। কতকগুলি লোক সেখানে এল। তাবা তাঁকে গালি দিল, তাব পবে তাঁকে প্রহাব কবল। কিন্তু কোন পবিবর্তন হল না। শুরুতে যে ধ্যানেব প্রবাহ চলছিল তা গালি দেওযাব সমযেও চলতে থাকে, প্রহাবকালেও চলতে থাকে। কোন পবিবর্তন ঘটল না। ধ্যানেব ধাবা খণ্ডিত হল না। তা অখণ্ডিত ভাবে লক্ষ্যে নিবদ্ধ বইল। আমবা ভাবি—এ বকম ক্ষেত্রে মানুষেব তো পবিবর্তন আসা উচিত। ভগবান মহাবীব কি শূন্যবৎ হযে গিযেছিলেন, কিংবা তাঁব মধ্যে পবিবর্তন হযেছিল কিন্তু লক্ষিত হয নি? এব কাবণ কি? এব মূল কাবণ—দিক পবিবর্তন। তাঁব চেতনাব পবিবর্তন ঘটেছিল। তাঁব প্রবাহেব দিক পবিবর্তন হযেছিল। তাঁব চেতনা নিজেব দিকে প্রবাহিত হযেছিল। গালাগালি তাকে ভেদ কবতে পাবে নি। কাবণ তাঁব চেতনা অ-শব্দ বা শব্দেব অতীত দশায উপনীত হযেছিল। সেখানে সমস্ত শব্দেব সমাপ্তি ঘটেছিল। তা শব্দার্থেব অতীত অবস্থা।

একদা ভগবান ধ্যানে স্থিত ছিলেন। কতকগুলি রূপসী যুবতী এসে তাঁকে প্রার্থনাব সুবে বলল—'প্রভু, এ আপনি কবেছেন? আপনি অসমযে যোগ আচবণ কবছেন কেন? আপনি আমাদেব কেন ত্যাগ কবছেন? আপনি একবাব ঘবে চলুন, আমাদেব সঙ্গে বাস করুন। আমাদেব অনুবোধ বক্ষা করুন। আমাদেব কৃতার্থ করুন।' মহাবীবেব ধ্যানেব ধাবা অবিচলিত বইল। কোন পবিবর্তন ঘটল না। তাঁব মধ্যে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ কোন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাঁব কাবণ, ভগবান মহাবীবেব আকর্ষণেব দিক পবিবর্তন হযে গিযেছিল। যিনি ক্ষণমাত্র আগে বাজচক্রবর্তীব মত বৈভবশালী ছিলেন, পব মুহূর্তে সব কিছু ছেড়ে অকিঞ্চন হযে গৃহত্যাগ কবেছিলেন—এ কেমন কবে সম্ভব হযেছিল? আকর্ষণেব দিক পবিবর্তন হওযাতেই তা সম্ভব হযেছিল।

দিক পবিবর্তনেব নামঃ ব্রত, প্রব্রজ্যা, সন্ন্যাস।

অহিংসা ক্রিযা, হিংসা প্রতিক্রিযা। সত্য ক্রিযা, অসত্য প্রতিক্রিয়া। অকিঞ্চনতা ক্রিযা, সংগ্রহ প্রতিক্রিযা। যাব মধ্যে আকর্ষণেব দিক পবিবর্তন ঘটেছে তাব পক্ষে অহিংসা, সত্য, অসংগ্রহ প্রভৃতি সহজ হযে যায, স্বভাবে পবিণত হয। তাব পবে তাব পক্ষে হিংসা কবা সম্ভব হয না, অসত্য ভাষণ বা চুবি কবা সম্ভব হয না, সংগ্রহ কবা বা আসক্ত হওযা সম্ভব হয না। এসব হল আকর্ষণেব দিক পবিবর্তনেব প্রতিফলন। তখন তাব গতি আত্মাভিমুখী হয। চেতনা আত্মাব দিকে প্রবাহিত হতে আবম্ভ কবে। তা ব্রত, সুমহৎ সমাধি।

গৌতম ভগবান মহাবীবকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন—'ভন্তে। কোন লোক ঘুমায, কেউ কেউ জেগে থাকে, কেউ কেউ নিদ্রিত অবস্থায জেগে থাকে। এ কথা কি ঠিক ?'

মহাবীব বললেন—'গৌতম। ও কথা ঠিক। যাব আকর্ষণ বিষযেব প্রতি, যাব আকর্ষণ বাইবেব দিকে ধাবিত হয, সে লোক ঘুমিযে থাকে। যাব চেতনা নিবন্তব আত্মাব দিকে প্রবাহিত হয, যাব আকর্ষণ শেষ হযেছে, সে জেগে আছে, সে সর্বদা জাগ্রত থাকে। যাব চেতনা কখনও বাইবেব দিকে ধাবিত হয, আবাব কখনও কখনও থেমে গিযে ভেতবেব দিকে প্রবাহিত হয সে ঘুমিযে জাগে। ঘুমিযেও থাকে, আবাব জেগেও থাকে।

ব্রত জাগবণ। চেতনাব জাগ্রত অবস্থাকে ব্রত বলে। তাবই নাম সমাধি। এই অবস্থায পৌছলে মানুষেব সব সমস্যাব সমাধান হযে যায বলে এই অবস্থাকে সমাধি বলে।

কষাযকে ঘিবে চাব দুযাব আছে—অনন্তানুবন্ধী, অপ্রত্যাখ্যানী, প্রত্যাখ্যানী এবং সংজ্বলন। প্রথম দুযাব অনন্তানুবন্ধী। যে এব ওপবে আঘাত কবে, প্রহাব কবে তাব দৃষ্টিকোণ সম্যক হযে যায। তাব দৃষ্টি সমীচীন হয। সে সত্যেব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবে। যে লোক দ্বিতীয দবজায, অপ্রত্যাখ্যানী কষাযেব ওপবে আঘাত করে, ঐ দুযাব ভেঙ্গে

ফেলে, সে ব্রতী হতে পাবে, সে ব্রতেব ভূমিতে প্রবেশ কবতে সমর্থ হয। যে তৃতীয় দুষাব প্রত্যাখ্যানী কষাযেব ওপবে আঘাত কবে, সে মহাব্রতী হয়, দীক্ষিত হয, প্রব্রজ্যা লাভ কবে। যে চতুর্থ দুষাব সংজ্বলন কষাযে আঘাত করে সে বীতবাগ, বাগ, দ্বেষ প্রভৃতি সব কিছুব অতীত হয়ে যায।

কবায় চেতনাব ওপবে আঘাত কবলে তবে ব্রত এবং মহাব্রত প্রাপ্তি হয। যতদিন পর্যন্ত কষাযের বলযে আঘাত কবে তাকে ভেঙ্গে ফেলা না যায় ততদিন পর্যন্ত মানুষ ব্রতীতে পবিণত হতে পাবে না। ব্রত অতি উচ্চ স্তবেব সমাধি বা সমাধান। তাতে চেতনাব পবিবর্তনেব ক্ষমতা এসে যায। তাব সমাধান হযে যায, তাব সমাধি মিলে যায। তাকে আব কেউ সন্তাপ দিতে পাবে না। ক্রোধ, অভিমান, মাযা বা লোভ—কিছুই তাকে সন্তপ্ত বা বিচলিত কবতে পাবে না। বাগ বা দ্বেষ তাকে ক্লেশ দিতে পাবে না। তাব সব কিছু সমাহিত হযে যায। সব সমস্যাব সমাধান হযে যায। আব কোন বন্ধন হয না।

লোকে ব্রতী হতে চায। কিন্তু আবদ্ধ হওয়াব ফলে ব্রতীতে পবিণত হতে পাবে না। বন্ধন কি? এক বন্ধন, মানুষেব কষাযেব চেতনাব প্রবলতা। সে এখন পর্যন্ত কষায চেতনাব ওপবে আঘাত কবতে পাবে নি। সে এখনও অব্যবস্থিত, সংশয়ে দোদুল্যমান। সাধনাব পথ তাব ভাল লাগে, কিন্তু সে পথে সে পৌঁছতে পাবে না। সে চিন্তা কবে—'আমি একলাই চলব। দুনিযা তো আমাব সাথে চলবে না।' সঙ্কল্প দুর্বল হয়ে যায, বিশ্বাস তৈবি হয না, পথ মেলে না। কষাযেব ওপবে আঘাত না কবলে সে কাজ পুবো হবে না। কষায চেতনাব ওপবে আঘাত পড়লে বিবতি উৎপন্ন হয। 'বতি' শব্দেব অর্থ বমণ কবা। তাব অর্থ, আনন্দ কবা। আনন্দ গ্রহণে বত হওযা। 'বিবতি' কথাটিব অর্থ সাংসাবিক আনন্দ থেকে দিক পবিবর্তন কবে বিপবীত দিকে মনকে নিযে যাওযা। বিরতি বতিব সম্পূর্ণ বিপবীত মার্গ।

দুই ভাই ছিল। তাবা বত্নেব ব্যবসা কবত। বড ভাই তাব স্ত্রী

এবং পুত্রকে ত্যাগ করে সংসার ছেড়ে চলে গেল। ছেলে বড় হল। একদিন তার মা তাকে বলল—'বাছা। তোর বাবা আমার কাছে এক পুঁটলি রেখে গিয়েছেন। তাতে রত্ন আছে। কাকার কাছে নিয়ে গিয়ে ওগুলি বাজারে বেচে আয়। এখন দর উঁচু। অনেক টাকা পাওয়া যাবে।' সে কাকার কাছে এল। কাকা পুঁটলি খুলল না, সেটা আবার বেঁধে দিয়ে বলল—'এটি তোমার মাকে দিয়ে দিও। বাজার এখন মন্দা চলছে। এগুলি চড়া দরে বিক্রি হবে না। দর কমতি হবে।' ছেলে মার কাছে এসে সব কথা বলল।

কয়েক মাস গেল। বছর গেল। ছেলেটি কাকার কাছে রত্ন পরীক্ষা শিখতে লাগল। অনুভব বাড়তে লাগল। একদিন কাকা বলল—'বাছা। বাজার এখন তেজী চলছে। যাও, সেই পুঁটলিটি নিয়ে এস, রত্নগুলি বেচে দেব।' ছেলেটি দৌড়তে দৌড়তে মার কাছে গেল। পুঁটলিটি দোকানে নিয়ে এল। কাকা গদিতে বসে ছিলেন। তাঁর কাছে দু-এক জন লোকও ছিল। ছেলেটি পুঁটলিটি খুলল। তার চোখ ঝলসে গেল। সে স্তব্ধ হয়ে গেল। বলে উঠল—'আরে। এ কি। রত্ন কোথায়? হীরা কোথায়? এ সব তো কাচের টুকরো। সবগুলিই কাচ। এ কেমন করে হল? হীরা কি পালটে কাচ হয়ে গেল, না আসলেই এগুলো কাচের টুকরো?' সে পুঁটলিটি গলিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কাকা বলল—'ওহে। এ তুমি কি করলে? আমি কি বলব?' ছেলেটি বলল—কাকা। আমি বুঝতে পেরেছি, এ সবই কাচের টুকরো ছিল। হীরা ছিল না, রত্ন ছিল না।'

ধারণার পরিবর্তন হয়েছিল। আসলের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। ঠিক পরিস্থিতি সামনে এসে গিয়েছিল।

পরিবর্তন কেন আসে?

যাঁরা ত্যাগীতে বা মহাব্রতীতে পরিণত হন তাঁদের নতুন জন্ম হয় না। তাঁদের মধ্যে কেবল চেতনার প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয়, আকর্ষণের পরিবর্তন হয়। যে জিনিস আগে ভাল লাগত, যে জিনিস

কষায় চেতনার প্রভাবে মনোজ্ঞ মনে হতো, আজ দিক পরিবর্তন হওয়ার ফলে তা একেবারে বিপরীত লাগে, অর্থাৎ মোটেই চিত্তাকর্ষক মনে হয় না।

সম্রাট অশোকের মনে এক ভাবনা জেগেছিল, 'আমি সংসারের সবার ওপরে আমার শাসন প্রতিষ্ঠা করব।' ঐ ভাবনা একদিন তীব্র ছিল। ভাবনার পরিবর্তন হল, তাঁর আকর্ষণের গতি বদলে গেল—'আরে! যুদ্ধ করা তো পাগলামো। নরহত্যা নিচ কাজ।' তাঁর আকর্ষণ বদলে গেল। তিনি শিলালিপি উৎকীর্ণ করালেন—'কারোর সঙ্গে লড়াই কোরো না। কলহ কোরো না। যুদ্ধ কোরো না।' কলিঙ্গ-যুদ্ধে যে সম্রাট লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিলেন, তিনি সকলকে ভালবাসার কথা বললেন। এটা কেমন করে সম্ভব হল? চেতনার দিক পরিবর্তনের ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল। যে লোক নিজের চেতনার সঙ্গে কষায়-চেতনার সংযোগ হতে দেয় না, সে নিজের চেতনা-প্রবাহের মোড় ফেরাতে সমর্থ হয়, তার পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। তার আকর্ষণ মিটে যায়। পুরনো মূল্যবোধের দৃষ্টি বদলে যায়। নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা হয়। যে সমস্ত জিনিস অর্থপূর্ণ বলে মনে হতো সেগুলি এখন অর্থহীন, অসার মনে হতে আরম্ভ করে। এই মনোভূমির, এই চেতনার দিকের নাম ব্রত। ব্রত এক। উপযোগের দৃষ্টিতে তা পাঁচ, বার, বা অসংখ্য হতে পারে। ব্রতই বলুন, বা বিরতিই বলুন, তা চেতনার দিক পরিবর্তন—সবই এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম।